হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২২

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সূচিপত্র

অসম্ভবের দেশে : ৫
সত্যিকার শার্লক হোমস : ৬৩
প্রথম বাঙালি সম্রাট : ৮৩
চলো গল্প নিকেতনে : ৯৩
নিশাচরী বিভীষিকা : ১৩১

অসম্ভবের দেশে

উৎসর্গ

মস্ত-বড়ো বাবু-সাহেব
শ্রীমান দীপক সেন
করকমলেষু

দাদাভাই,

তুমি বাঘ দেখতে চাও, জয়পুর আর আলিপুরের চিড়িয়াখানায় অনেক বাঘ দেখেছও। কিন্তু বাঘের মতো বড়ো বিড়াল যদি দেখতে চাও, তবে ইস্কুলের বই ছুড়ে ফেলে দিয়ে এই বইখানি তাড়াতাড়ি পড়ে দেখ।

দাদু

'অসম্ভবের দেশে' উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বের হয় 'রঙমশাল' পত্রিকায়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

অদ্ভুত জন্তু

সকালবেলায় উঠানের ধারে বসে কুমার তার বন্দুকটা সাফ করছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে, হাসিমুখে বিমল আসছে।

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, 'এ কী, বিমল যে! তুমি কবে ফিরলে হে?'

—'আজকেই।'

—'তোমার তো এত তাড়াতাড়ি ফেরবার কথা ছিল না!'

—'ছিল না। কিন্তু ফিরতে হল। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।'

কুমার অধিকতর বিস্ময়ে বললে, 'আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে! ব্যাপার কী?'

—'গুরুতর। আবার এক ভীষণ নাটকের সূচনা!'

কুমার উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাহলে এ নাটকে তুমি কি আমাকেও অভিনয় করবার জন্যে ডাকতে এসেছ?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'সাধু, সাধু! আমি প্রস্তত। যাত্রা শুরু হবে কবে!'

—'কালই।'

—'কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে কি?'

—'তা বলব বই কি! শোনো। ...তুমি জানো, সুন্দরবনে আমি শিকার করতে গিয়েছিলুম। যে জায়গাটায় ছিলুম তার নাম হচ্ছে মোহনপুর। কিন্তু সেখানে গিয়ে শিকারের বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারিনি। একটিমাত্র বাঘ পেয়েছিলুম কিন্তু সে-ও আমার বুলেট হজম করে হয়তো খোশমেজাজে বহাল তবিয়তেই তার বাসায় চলে গিয়েছে।

'স্থলচরেরা আমাকে বয়কট করছে দেখে শেষটা জলচরের দিকে নজর দিলুম। আমার সুনজরে পড়ে একটা কুমির আর একটা ঘড়িয়াল তাদের পশু-জীবন থেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মুক্তি লাভ করলে। তারপর তারাও আর আমার সঙ্গে দেখা করিতে রাজি হল না। মনটা রীতিমতো তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলুম, কাজ নেই বনেজঙ্গলে ঘুরে, ঘরের ছেলে আবার ঘরেই ফেরা যাক।

'ঠিক এমনি সময়ে এক অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল। মোহনপুর থেকে মাইল পনেরো তফাতে আছে রাইপুর গ্রাম। রাইপুরের একজন লোক এসে হঠাৎ একদিন খবর দিলে, সেখানে জঙ্গলে নাকি কী একটা আশ্চর্য জীব এসে হাজির হয়েছে। সে জীবটাকে কেউ বলে বাঘ, কেউ বলে গন্ডার, কেউ বা বলে অন্য কিছু। যদিও তাকে ভালো করে দেখবার অবসর কেউ পায়নি, তবু এক বিষয়ে সকলেই একমত। আকারে সে নাকি প্রকাণ্ড—যে-কোনও মোষের চেয়েও বড়ো। তার ভয়ে রাইপুরের লোকেরা রাত্রে ঘুম ভুলে গিয়েছে।'

কুমার শুধাল, 'কেন? সে জীবটা মানুষ-টানুষ বধ করেছে নাকি?'

—'না। সে এখনও মানুষ-টানুষ বধ করতে পারেনি বটে, তবে রাইপুর থেকে প্রতিরাত্রেই অনেক হাঁস, মুরগি, ছাগল আর কুকুর অদৃশ্য হয়েছে। এর মধ্যে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে সেই অজানা জীবটার কবলে পড়ে রাইপুরের অনেক বেড়াল ভবলীলা সাঙ্গ করেছে বটে, কিন্তু বেড়ালগুলোর দেহ সে ভক্ষণ করেনি।'

কুমার বললে, 'কেন, এর মধ্যে তুমি উল্লেখযোগ্য কী দেখলে?'

বিমল বললে, 'উল্লেখযোগ্য নয়? হাঁস, মুরগি, ছাগল আর কুকুরগুলোর দেহ পাওয়া যায়নি কিন্তু প্রত্যেক বেড়ালেরই মৃতদেহ পাওয়া যায় কেন? সেই অজানা জীবটা আর সব পশুর মাংস খায় কিন্তু বেড়ালের মাংস খায় না কেন? আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার শোনো। দু-তিন জন মানুষও তার সামনে পড়েছিল। তারা তার গর্জন শুনেই পালিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের আক্রমণ করবার জন্যে সে পিছনে পিছনে তেড়ে আসেনি।'

কুমার কৌতূহলভরে বললে, 'তারপর?'

বিমল বললে, 'তারপর আর কী, এমন একটা কথা শুনে আর কি স্থির হয়ে বসে থাকা যায়! আমিও মোটঘাট বেঁধে নিয়ে রাইপুরে যাত্রা করলুম।'

কুমার বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সে জীবটাকে দেখে এসেছ?'

'হ্যাঁ। বনেজঙ্গলে দুই রাত্রি বাস করবার পর তৃতীয় রাত্রে তার সাক্ষাৎ পেলুম। আমি একটা গাছের উপরে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে বসে ঢুলছিলুম। রাত তখন বারোটা হবে। আকাশে খুব অল্প চাঁদের আলো ছিল, অন্ধকারে ভালো নজর চলে না। চারিদিকের নীরবতার মাঝখানে একটা গাছের তলায় হঠাৎ শুকনো পাতার মড়-মড় শব্দ কানে এল। শব্দটা হয়েই থেমে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারের ভিতরে ভাঁটার মতন বড়ো বড়ো দুটো আগুন-চোখ জেগে উঠেছে। সে-চোখদুটো আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখদুটো কোন জানোয়ারের আমি বোঝবার চেষ্টা করলুম না, তারপরেই বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বিষম এক আর্তনাদ ও ছটফটানির শব্দ। সে-আর্তনাদ বাঘ-ভাল্লুকের ডাকের মতন নয়, আমার মনে হল যেন এক দানব-বেড়াল আহত হয়ে ভীষণ চিৎকার করছে।

'খানিক পরে আর্তনাদ ও ছটফটানির শব্দ ধীরে ধীরে থেমে এল! কিন্তু আমি সেই রাতের অন্ধকারে গাছের উপর থেকে আর নামলুম না। গাছের ডালেই হেলান দিয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলুম। সকালবেলায় চারিদিকে লোকজনের সাড়া পেয়ে বুঝলুম, রাত্রে আমার বন্দুকের শব্দ আর এই অজানা জন্তুটার চিৎকার শুনেই এত ভোরে সবাই এখানে ছুটে এসেছে। আস্তে আস্তে নীচে নেমে পাশের ঝোপের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলুম, একটা আশ্চর্য ও প্রকাণ্ড জীব সেখানে মরে পড়ে রয়েছে। জন্তুটা যে-কোনও বাঘের চেয়ে বড়ো। তাকে দেখতে বাঘের মতন হলেও সে মোটেই বাঘ নয়। তার গায়ের রং ধবধবে সাদা, কিন্তু মুখটা কালো। আসলে তাকে একটা অসম্ভব রকম প্রকাণ্ড বেড়াল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।'

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'তুমি বলো কী হে বিমল, বাঘের চেয়েও বড়ো বেড়াল? এও কি সম্ভব!'

বিমল বললে, 'কী যে সম্ভব আর কী অসম্ভব তা আমি জানি না। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তাই বলছি। কিন্তু এখনও সব কথা শেষ হয়নি।'

কুমার বললে, 'এর উপরেও তোমার কিছু বলবার আছে নাকি? আচ্ছা শুনি!'

বিমল বললে, 'বেড়ালটার দেহ পরীক্ষা করতে করতে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। তার গলায় ছিল একটা ইস্পাতের বগলস আর একটা ছেঁড়া শিকল। দেখেই বোঝা গেল, এ বেড়ালটাকে কেউ বেঁধে রেখে দিয়েছিল। কোনওগতিকে শিকল ছিঁড়ে এ পালিয়ে এসেছে। ...কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন একটা বিচিত্র বেড়াল এ অঞ্চলে যদি কারুর বাড়িতে বাঁধা থাকত তাহলে সকলে তার কথা নিশ্চয়ই জানতে পারত। কিন্তু কেউ এই বেড়াল ও তার মালিক সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে পারলে না। এই বেড়ালের কথা লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে তাকে দেখতে লাগল। এমন একটা অসম্ভব জীব দেখে সকলে হতভম্ব হয়ে গেল!'

কুমার বললে, 'এইখানেই তাহলে তোমার কথা ফুরুল?'

বিমল বললে, 'মোটেই নয়। এইখানেই যদি আমার কথা ফুরিয়ে যেত, তাহলে তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে আমি আবার কলকাতায় ফিরে আসতুম না।'

কুমার উৎসাহিত ভাবে বললে, 'বটে, বটে, তাই নাকি?'

বিমল বললে, 'বিকেলবেলায় দূর গ্রাম থেকে রাইপুরে একটা লোক এল, ওই বেড়ালটাকে দেখবার জন্যে। এমন ভাবে সে বেড়ালটাকে দেখতে লাগল যাতে করে আমার মনে সন্দেহ হল যে এই লোকটার এ সম্বন্ধে কিছু জানা আছে। তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বললে, সে হচ্ছে মাঝি, নৌকো চালানোই তার জীবিকা। আমি জানতে চাইলুম, এই বেড়ালটাকে সে আগে কখনও দেখেছে কি না? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও কিছু ইতস্তত করে সে বললে, 'বাবু, এই রাক্ষুসে বেড়ালটাকে আমি আগে কখনও দেখিনি বটে, কিন্তু বোধহয় এর ডাক আমি শুনেছি!' তার কথা শুনে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা জানতে চাইলুম। সে যা বললে তা হচ্ছে এই—

'দিন-পনেরো আগে একটি বুড়ো ভদ্রলোক আমার নৌকো ভাড়া করতে আসেন। সে-বাবুকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তাঁর মুখেই শুনলাম, তিনি অন্য একখানা নৌকো করে এখানে এসেছেন, সেই নৌকোর মাঝির সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে সে তাঁকে আমাদের গ্রামে নামিয়ে দিয়েছিল।

'তিনি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি কোনও একটা জায়গায় যেতে চান। যে তাঁকে নিয়ে যাবে তাকে তিনি রীতিমতো বকশিশ দিয়ে খুশি করবেন, এমন কথাও আমাকে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোটও আগাম ভাড়া বলে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আগাম এতগুলো টাকা পেয়ে আমি তখনই তাঁকে নিয়ে যেতে রাজি হলুম। তাঁর সঙ্গে ছিল মস্ত বড়ো একটা সিন্দুক, এত বড়ো সিন্দুক আমি আর কখনও দেখিনি। আমরা সকলে মিলে ধরাধরি করে সেই সিন্দুকটাকে নৌকোর উপরে নিয়ে গিয়ে তুললুম। তোলবার সময় শুনতে পেলুম, সিন্দুকের ভিতর থেকে কী একটা জানোয়ার বিকট গর্জন করছে।

'আমরা ভয় পাচ্ছি দেখে বাবুটি বললেন, 'তোমাদের কোনও ভয় নেই, ওর ভিতরে

একটা খুব বড়ো জাতের বনবেড়াল আছে।' সে যে কোন জাতের বনবেড়াল তা বলতে পারি না, বনবেড়াল যতই বড়ো হোক তার চিৎকার এমন ভয়ানক হয়, আমি তা জানতুম না। আমি বললুম, 'বাবু, এ যদি সিন্দুক থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কোনও বিপদ হবে না তো?' তিনি হেসে বললেন, 'না, সিন্দুকের ভিতরেও বেড়ালটা শিকলে বাঁধা আছে।'

'কিন্তু নৌকো নিয়ে আমাদের বেশিদূর যেতে হল না। সমুদ্রের কাছে গিয়ে আমরা হঠাৎ এক ঝড়ের মুখে পড়লুম। ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে নৌকো বাঁচানোই দায়। দাঁড়িরা সব বেঁকে বসল, বললে—'ওই ভারী সিন্দুকটা নৌকো থেকে নামিয়ে না দিলে কারুকেই আজ প্রাণে বাঁচতে হবে না।'

'কিন্তু তাদের কথায় সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি প্রথমটায় কিছুতেই সায় দিতে চাইলেন না। শেষটা দাঁড়িরা যখন নিতান্তই রুখে উঠল, তখন তিনি নাচার হয়ে বললেন, 'তোমাদের যা-খুশি করো আমি আর কিছু জানি না।'

'সকলে মিলে সেই বিষম ভারী সিন্দুকটা তখনই জলে ফেলে দেবার জোগাড় করলে। কেবল আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ওর ভিতরে যে বনবেড়ালটা আছে, তার কী হবে?' দাঁড়িরা বললে, 'বনবেড়ালটাকে বাইরে বার করলে আমাদের কামড়ে দেবে, তার চেয়ে ওর জলে ডুবে মরাই ভালো!'

'ভদ্রলোকও ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'না, না, ওকে বাইরে বার করতে হবে না, সিন্দুক সুদ্ধই ওকে জলে ফেলে দাও!'

'সিন্দুকটাকে আমরা তখন জলের ভিতর ফেলে দিলুম। তার একটু পরেই জলের ভিতর থেকে কী একটা মস্ত জানোয়ার ভেসে উঠল। সেটা যে কী জানোয়ার, দূর থেকে আমরা ভালো করে বুঝতে পারলুম না—বোঝবার সময়ও ছিল না, কারণ আমরা সবাই তখন নৌকো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছি।

'ঝড়ের মুখ থেকে অনেক কষ্টে নৌকোকে বাঁচিয়ে, সন্ধ্যার সময় আমরা সমুদ্রের মুখে মাতলা নদীর মোহানায় গিয়ে পড়লুম। দূরে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল, আঙুল দিয়ে সেইটে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে তোমরা ওইখানে নামিয়ে দাও।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'এই অসময়ে ওই দ্বীপে নেমে আপনি কোথায় যাবেন?'

'ভদ্রলোক একটু বিরক্ত ভাবেই বললেন, 'সে কথায় তোমাদের দরকার নেই, যা বলছি শোনো।' আমরা আর কিছু না বলে নৌকো বেয়ে দ্বীপের কাছে গিয়ে পড়লুম। তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে—দ্বীপের বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে আর নজর চলে না।

'এ দ্বীপে আমরা কখনও আসিনি, এখানে যে কোনও মানুষ থাকতে পারে তাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বুড়ো ভদ্রলোকটি অনায়াসেই নৌকো থেকে নেমে সেই অন্ধকারের ভিতরে কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

'তখন ভাটা আরম্ভ হয়েছে। নৌকো নিয়ে আর ফেরবার চেষ্টা না করে সে রাতটা আমরা সেইখানেই থাকব স্থির করলুম। নৌকো বাঁধবার চেষ্টা করছি, এমন সময় অন্ধকারের ভিতর থেকে সেই ভদ্রলোকের গলায় শুনলুম, 'তোমরা এখানে নৌকো বেঁধো না, শিগগির পালিয়ে যাও, নইলে বিপদে পড়বে!'

'আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'এখানে থাকলে বিপদ হবে কেন বাবু?'

'ভদ্রলোক খুব কড়া গলায় বললেন, 'আমার কথা যদি না শোনো, তাহলে তোমরা কেউ আর প্রাণে বাঁচবে না!'

'তবুও আমি বললুম, 'বাবু, সারাদিন খাটুনির পর এই ভাটা ঠেলে আমরা নৌকো বেয়ে যাই কী করে? এখানে কীসের ভয়, বলুন না আপনি! বুনো জন্তুর, না ডাকাতের?'

'ভদ্রলোক বললেন, 'জন্তুও নয়, ডাকাতও নয়; এ দ্বীপে যারা আছে তাদের দেখলেই ভয়ে তোমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে! শিগগির সরে পড়ো!'

'আমি আর একবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'তবে এমন ভয়ানক জায়গায় আপনি নামলেন কেন?'

'ভদ্রলোক 'হা হা হা হা' করে হেসেই চুপ করলেন, তারপর তাঁর আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আমাদেরও মনে কেমন একটা ভয় জেগে উঠল, সেখান থেকে তখুনি নৌকো চালিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম।

'বাবু, আমার বিশ্বাস, আপনি এই যে রাক্ষুসে বেড়ালটাকে মেরেছেন, সেই সিন্দুকের ভিতর এইটেই ছিল।'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নতুনত্ব কী

বিমলের গল্প শেষ হলে পর কুমার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'সেই বুড়ো লোকটি যে কে, সে কথা তুমি জানতে পেরেছ কি?'

—'তাই জানবার জন্যেই তো আমার এত আগ্রহ! তবে মাঝির মুখে শুনেছি, লোকটি নাকি বাঙালি, আর বুড়ো হলেও তিনি খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান, আর তাঁর মেজাজ বড়ো কড়া।'

—'কিন্তু বিমল, সে দ্বীপে এমন কী থাকতে পারে? বৃদ্ধ কি মিছিমিছি ভয় দেখিয়েছেন? দ্বীপে ভয়ের কিছু থাকলে তিনি একলা সেখানে নামবেন কেন!'

—'কুমার, তুমি আমায় যে প্রশ্নগুলি করলে, আমারও মনে ঠিক ওইসব প্রশ্নই জাগছে। ওইসব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্যেই আমরা সেই দ্বীপের দিকে যাত্রা করব।'

'কিন্তু আগে থাকতে তবু কিছু ভেবে দেখা দরকার তো। বৃদ্ধ বলেছেন, সে দ্বীপে যারা আছে তারা জন্তু নয়, ডাকাতও নয়। তবে তারা কে? মানুষ তাদের দেখলে ভয় পেতে পারে। তবে কি তারা ভূত? তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? ভূত-প্রেত তো কবির কল্পনা, খোকা-খুকিদের ভয় দেখিয়ে শান্ত করবার উপায়।'

—'না কুমার, ভূত-টুত আমিও মানি না, আর বৃদ্ধ যে ভূতের ভয় দেখিয়েছিলেন তাও আমার মনে হয় না।'

—'তবে?'

—'কিছুই বুঝতে পারছি না। অবশ্য সেই দ্বীপে যদি এইরকম দানব-বেড়ালের আত্মীয়রা থাকে তাহলে সেটা বিশেষ ভয়ের কথা হবে বটে। কিন্তু বৃদ্ধ জন্তুর ভয় দেখাননি।'

কুমার কিছুক্ষণ ভেবে বললে, 'দ্যাখো, আমার বোধহয় সেই বৃদ্ধ মিথ্যা কথাই বলেছেন। দ্বীপের ভিতরে হয়তো কোনও অজানা রহস্য আছে। অন্য কেউ সে কথা টের পায়, হয়তো বৃদ্ধ তা পছন্দ করেন না। হয়তো সেইজন্যেই তিনি দাঁড়ি-মাঝিদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন?'

বিমল বললে, 'কিন্তু সে রহস্যটা কী? যে-দ্বীপে এমন দানব-বেড়াল পাওয়া যায় সে-দ্বীপ যে রহস্যময় তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে এমন অসম্ভব বেড়ালের চেয়েও অসম্ভব আরও কোনও রহস্য আছে কি না সেইটেই আমি জানতে চাই।'

কুমার বললে, 'মঙ্গল গ্রহে, ময়নামতীর মায়াকাননে, অসম আর আফ্রিকার বনেজঙ্গলে, সুন্দরবনে, অমাবস্যার রাতে আর হিমালয়ের দানবপুরীতে অনেক অসম্ভব রহস্যই আমরা দেখলুম। তার চেয়েও বেশি অসম্ভব কোনও রহস্য যে আর ত্রিজগতে থাকতে পারে একথা আমার বিশ্বাস হয় না। প্রেতলোক যদি সম্ভবপর হত তাহলেও বরং নতুন কিছু দেখবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রেত যখন মানি না তখন নতুন কিছু দেখবার আশাও রাখি না।'

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'না কুমার, ত্রিজগতে নতুনত্বের অভাব কোনওদিনই হয়নি। ধরো ওই চন্দ্রলোক। ওর আগাগোড়াই তুষারে ঢাকা, ওকে তুষারের এক বিরাট মরুভূমি বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ পণ্ডিতেরা বলেন ওর ভিতরও নাকি জীবের অস্তিত্ব আছে। তাঁদের মতে সে-সব জীব মোটেই মানুষের মতো দেখতে নয়, তাদের দেখলে হয়তো আমরা নতুন কোনও জন্তু বলেই মনে করব, যদিও মস্তিষ্কের শক্তিতে হয়তো মানুষেরও চেয়ে তারা উন্নত। হয়তো তারা বাস করে তুষার মরুভূমির পাতালের তলায়, সেখানে গেলে আমাদেরও তারা নতুন কোনও জন্তু বলেই সন্দেহ করবে। তুমি কি বলতে চাও কুমার, সেখানে গেলে তুমি এক নতুন জগৎ দেখবার সুযোগ পাবে না?'

কুমার বললে, 'কিন্তু আপাতত চন্দ্রলোকের কথা তো হচ্ছে না, আমরা থাকব এই পায়ে চলা মাটির পৃথিবীতেই। সুন্দরবনের প্রান্তে, গঙ্গাসাগরের কাছে ছোট্ট এক দ্বীপ, কলকাতা থেকে সে আর কত দূরই বা হবে? সেখানে যে বিশেষ কোনও নতুনত্ব আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে আমি তা বিশ্বাস করি না।'

বিমল মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'দ্যাখো কুমার, একসার পিঁপড়ে খাবার মুখে করে কোথায় যাচ্ছে।'

কুমার বললে, 'ওই যে, চৌকাঠের তলায় ওই গর্তের ভিতরে গিয়ে ওরা ঢুকছে।'

—'হুঁ। এটা তোমার নিজের বাড়ি, এখানকার প্রতি ধূলিকণাটিকেও তুমি চেনো। কিন্তু তোমারই ঘরের দরজার তলায় পিঁপড়েদের যে উপনিবেশ আছে, তার কথা তুমি কিছু বলতে পারো?'

—'তুচ্ছ প্রাণী পিঁপড়ে, তার সন্ধান আবার রাখব কী?'

—'তুচ্ছ প্রাণী পিঁপড়ে, কিন্তু এবার থেকে তাদেরও সন্ধান রাখবার চেষ্টা করো।

মানুষের তুলনায় তাদের মস্তিষ্ক হয়তো ওজনে বেশি হবে না; কিন্তু সন্ধান রাখলে জানতে পারবে, মানুষের সমাজের চেয়ে পিঁপড়ের সমাজ অনেক বিষয়েই উন্নত। পৃথিবীতে কর্তব্যে অবহেলা করে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ের ভিতরে এমন একটি পিঁপড়েও তুমি পাবে না, নিজের কর্তব্যে যার মন নেই। যার যা করবার নিজের ইচ্ছাতেই সে অশ্রান্ত ভাবে করে যাচ্ছে। পিঁপড়েদের দেশে অবাধ্য ছেলেমেয়ে একটিও নেই। তাদের যে রানি সে-ও এক মুহূর্ত অলস হয়ে বসে থাকে না, অষ্টপ্রহরই ডিম প্রসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে। একদল পিঁপড়ে সর্বদাই করছে রানির সেবা-যত্ন, একদল করছে একমনে ডিম আর বাচ্চাদের পরিচর্যা, আর একটা বৃহৎ দলের কাজ খালি বাহির থেকে রসদ বহন করে আনা। এদের উপনিবেশের ভিতরটা পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে অতি বড়ো বুদ্ধিমান মানুষও অবাক হয়ে যাবে। তার ভিতরে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে, রসদখানা আছে, ডিম রাখবার আলাদা মহল আছে, এমনকি পিঁপড়েদের উপযোগী সবজি বাগান পর্যন্ত আছে। কুমার, তুমি বোধহয় জানো না যে, পিঁপড়েরাও গাভি পালন করে। অবশ্য সে গাভিকে দেখতে আমাদের গাভির মতো নয়, কিন্তু তারা 'দুগ্ধ'দান করবে বলেই তাদের পালন করা হয়।'

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'বলো কী বিমল, এসব কথা যে আমার কাছে একেবারে নতুন বলে মনে হচ্ছে!'

—'অথচ এই পিঁপড়েদের উপনিবেশ তোমার ঠিক পায়ের তলাতেই। পৃথিবীতে তুমি নতুনত্বের অভাব বোধ করছ, কিন্তু নিজের পায়ের তলায় কী আছে তার খবর তুমি রাখো না। কেবল তুমি নাও, অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব হচ্ছে এইরকম। যাদের জানবার আগ্রহ আছে, জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি আছে, দেখবার মতো চোখ আছে, জীবনে তাদের কোনওদিনই নতুনত্বের অভাব হয় না।'

কুমার অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'মাফ করো ভাই বিমল, আমারই ভ্রম হয়েছে। কিন্তু এখন আসল কথাই হোক। নতুনত্ব খুঁজে পাই আর না পাই, তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে আনন্দ আর কিছুই নেই। তাহলে কবে আমরা যাত্রা করব?'

বিমল বললে, 'যে মাঝির কাছ থেকে সেই দ্বীপ আর সেই দ্বীপবাসীর খবর পেয়েছি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেই-ই। আমার যে মোটরবোট আছে, তাতেই চড়ে আমরা কলকাতা থেকে যাত্রা করব। রাইপুর থেকে মাঝি তার নৌকো নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে। সে প্রথমটা কিছুতেই রাজি হয়নি, টাকার লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে শেষটা তাকে আমি রাজি করাতে পেরেছি। মাঝি তার নৌকো আর লোকজন নিয়ে রাইপুরেই প্রস্তুত হয়ে আছে, তোমার যদি অসুবিধে না হয় তাহলে কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।'

কুমার বললে, 'আমার আবার অসুবিধে কী? কালকেই আমি যেতে পারি।'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পুনরাবির্ভাব

মাঝির নাম ছিল কাসিম মিয়া। রাইপুরের ঘাটে মোটরবোট ভিড়িয়ে বিমল ও কুমার তার দেখা পেলে।

বিমলকে মোটরবোট ছেড়ে ডাঙায় নামতে দেখে সে-ও তাড়াতাড়ি জাল বোনা রেখে নিজের নৌকো থেকে নেমে এল।

বিমল তাকে দেখে শুধোলে, 'কী মিয়াসায়েব, তোমরা সব তৈরি আছ তো?'

কাসিম সেলাম ঠুকে বললে, 'হ্যাঁ হুজুর, আমরা সবাই তৈরি। আজকে বলেন, আজকে যেতে পারি।'

—'তোমার সঙ্গে ক-জন লোক নিয়েছ?'

—'চারজন দাঁড়ি নিয়েছি হুজুর।'

—'কিন্তু এ-যাত্রা দাঁড় বোধহয় তাদের কারুকেই টানতে হবে না। আমাদের বোটই তোমাদের পানসিকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমরা খাবে-দাবে আর মজা করে ঘুমোবে।'

কাসিম একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'ঘুমোতে কি আর পারব হুজুর? আমার লোকেরা ভারী ভয় পেয়েছে!'

বিমল আশ্চর্য স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'ভয় পেয়েছে? কেন?'

কাসিম কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বললে, 'তাদের বিশ্বাস যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না। অছিমুদ্দী মাঝির মুখে তারা শুনেছে, ও দ্বীপে নাকি ভূত প্রেত দৈত্য দানোরা বাস করে। সেই দ্বীপের কাছে গিয়ে তিন-চার খানা নৌকো নাকি আর ফিরে আসেনি। নৌকোয় যারা ছিল তারা কোথায় গেল, তাও কেউ জানে না। জল ঝড় নেই, অথচ মাঝে মাঝে ওখানে নাকি অনেকবার নৌকোডুবি হয়েছে। পেটের দায়ে নৌকো চালিয়ে খাই, আপনি ডবল ভাড়া আর তার উপরে বকশিশের লোভ দেখালেন বলেই আপনাকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছি। কিন্তু আগে অছিমুদ্দীর কথা শুনলে আমরা এ কাজে বোধহয় হাত দিতুম না।'

বিমল তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি এমন জোয়ান-মদ্দ কাসিম মিয়া, তুমিই শেষটা ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

কাসিম বললে, 'একেবারে ভয় পাইনি বললে মিথ্যে বলা হয় হুজুর! দ্বীপের সেই বুড়োবাবুটিও তো আমাদের ভয় দেখাতে কসুর করেননি। কেন তিনি আমাদের সেখানে রাত কাটাতে মানা করলেন? কেন তিনি বললেন, সেখানে জন্তুর ভয় নয়, ডাকাতের ভয় নয়, অন্য কিছুর ভয় আছে? অন্য কীসের ভয় থাকতে পারে? আমরা ভেবেচিন্তে কোনওই হদিস খুঁজে পাচ্ছি না!'

বিমল বললে, 'অত হদিস খোঁজবার দরকার কী মিয়াসাহেব? একটা কথাই খালি ভেবে দ্যাখো না। সেই বুড়োবাবুটি তো মানুষ, সেখানে যদি অন্য কিছুর ভয় থাকত, তাহলে কি

তিনি নিজে সেই দ্বীপে নামতে সাহস করতেন? অত বাজে ভাবনা ভেব না, সেই দ্বীপে হয়তো এমন কিছু আছে, বুড়োবাবুটি যা অন্য লোককে জানতে দিতে রাজি নন। তাই তিনি তোমাদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন!'

কাসিম বললে, 'সেখানে অন্য কিছু কী আর থাকতে পারে?'

—'ধরো হয়তো সেই দ্বীপে গুপ্তধন আছে, আর বুড়োবাবুটি কোনওরকমে তা জানতে পেরেছেন!'

গুপ্তধনের নামেই কাসিমের সারা মুখ সাগ্রহ কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তার পরেই সে আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে বললে, 'আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব নয় বটে কিন্তু রাক্ষুসে বেড়ালের মতো দেখতে সেই ভূতুড়ে জানোয়ারটার কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? সেই জানোয়ারটা কোত্থেকে এল? সেই দ্বীপ থেকেই তো?'

বিমল বললে, 'জানোয়ারটা যে দ্বীপ থেকেই এসেছে এমন কথা জোর করে কিছুতেই বলা যায় না। তোমার নৌকোর সিন্দুকের ভিতরে যে সেই জানোয়ারটাই ছিল এটা তো তুমি আর স্বচক্ষে দ্যাখোনি, আন্দাজ করছ মাত্র। তারপর ধরো, জানোয়ারটা না-হয় সেই সিন্দুকের ভিতরেই ছিল। কিন্তু বুড়োবাবুটি তাকে নিয়ে হয়তো সেই দ্বীপ থেকে আসছিলেন না, দ্বীপের দিকেই যাচ্ছিলেন! হয়তো তিনি অন্য কোনও জায়গা থেকে সেই জানোয়ারটাকে ধরে এনেছিলেন। এত বড়ো এই সুন্দরবন, এর ভিতরে কোথায় কত অজানা জানোয়ার আছে, তার খোঁজ কি তোমরা রাখো?'

কাসিম যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল। সে বললে, 'আর একটা নতুন খবর আছে হুজুর। সেই বুড়োবাবুটি আবার এখানে এসেছিলেন।'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'তাই নাকি? তারপর?'

—'আপনি যেদিন মোহনপুর থেকে চলে যান, ঠিক তার পরের দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বললেন, 'কাসিম, তোমাদের এ অঞ্চলের নাকি কী একটা আশ্চর্য জানোয়ার এসে উৎপাত করছে?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ হুজুর, একটা জানোয়ার এসে এখানে উৎপাত করছিল বটে, কিন্তু কলকাতার এক বাবু এসে বন্দুক ছুড়ে তার লীলাখেলা সাঙ্গ করে দিয়েছেন।' শুনেই রাগে তাঁর সারা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, আর কোনও কথা না বলে হনহন করে তিনি একদিকে চলে গেলেন।'

বিমল ব্যস্ত ভাবে বললে, 'কাসিম, আমরা যে সেই দ্বীপে যাব সে কথা তাঁকে তুমি বলোনি তো?'

কাসিম বললে, 'আজ্ঞে না হুজুর, বলবার সময়ই পাইনি।'

বিমল হাঁপ ছেড়ে বললে, 'সেই বাবুটি এখনও এখানে আছেন নাকি?'

কাসিম বললে, 'বোধহয় নেই। কোথায় যে তিনি গেলেন, তারপর থেকে আমরা কেউ আর তাঁকে দেখতে পাইনি।'

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবুটি কেমন দেখতে বলো দেখি!'

কাসিম বললে, 'বলেছি তো, খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান লোক। তাঁর বয়স ষাট বছরের

কম হবে না, কিন্তু তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় এখনও তাঁর গায়ে অসুরের মতো জোর আছে। তাঁর রং শ্যামলা, মাথায় লম্বা সাদা চুল আর মুখে লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি। নাকে ধোঁয়া রঙের চশমা, সেই চশমার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর চোখদুটো যেন দপ দপ করে জ্বলছে!'

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'কাসিম, আমাদের মোটগুলো বোট থেকে নামিয়ে তোমাদের পানসিতে তুলে নাও। আজ বিকালেই আমরা নৌকো ছাড়ব।'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

জ্যোৎস্নাময় জঙ্গলে

পূর্ণিমা রাত। নির্মেঘ নীল আকাশে তারাদের সভা বসেছে আর তারই ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে ভরা জোছনার জোয়ার।

পৃথিবীতেও দুই ধারে যেন পরির হাতে সাজানো নীল বনের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কানায় কানায় ভরা নদীর জোয়ারের জল। সে জলস্রোতকে মনে হচ্ছে রুপালি জোছনার স্রোত।

নির্জনতা যে কত সুন্দর, মায়াময় হতে পারে শহরে বসে কেউ তা অনুভব করতে পারে না।

বনে বনে গাছের ডালে ডালে সবুজ-পাতা-শিশুরা খেলা করছে আলোছায়ার ঝিলমিলি দুলিয়ে দুলিয়ে এবং নদীর বুকে বুকে ঢেউ-শিশুরা খেলা করছে হিরে-ধারার জাল বুনতে বুনতে।

এক-একবার ঠান্ডা বাতাসের উচ্ছ্বাস ভেসে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ-শিশু আর পাতা-শিশুরা খুশির হাতে চারিদিকের নীরবতা অস্ফুট, অপূর্ব শব্দময় করে তুলছে।

কিন্তু এই বনভূমির মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে অনেক ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। চাঁদের আলোর যে একটি নিজস্ব শান্ত সুর আছে, যা এই নির্জন বনভূমিকে মোহনীয় করে তুলেছে, ওইসব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তার অনেকখানি সৌন্দর্যই নষ্ট করে দিচ্ছে।

বিমলদের মোটরবোটের যন্ত্রের গর্জন এই নিরালায় কী কর্কশ শোনায়!

সেই গর্জন শুনে মাঝে মাঝে চরের উপর থেকে জীবন্ত ও ভয়াবহ গাছের গুঁড়ির মতো কী কতকগুলো জলের উপর সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে চারিদিক তোলপাড় করে তোলে।

কাসিম বলে ওঠে, 'হুজুর, কুমির!'

বিমল ও কুমার তা জানে। জলবাসী ওই করাল মৃত্যুর শব্দ তারা আরও অনেকবার শুনেছে।

এক জায়গায় চার-পাঁচটি হরিণ জলপান করছে। কাছেই অরণ্যের অন্তঃপুরে বাঘের ঘন ঘন হুঙ্কার জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ভীত মৃগদের জলপান করার শব্দ।

অরণ্যের মধ্যে দিনে যারা ঘুমোয়, সদলবলে জেগে উঠেছে তারা আজ রাত্রে। লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গ। জ্যোৎস্নার মুখে কালো অভিশাপের মতো দলে দলে বাদুড় ও কাল-পেচক। কোথাও গাছের ভিতর থেকে ভীরু পাখির দল আর্তনাদ করে উঠল, হয়তো তাদের বাসার ভিতরে এসেছে বিপজ্জনক কোনও অতিথি।

থেকে থেকে অদ্ভুত ভূতুড়ে স্বরে ডেকে উঠছে তক্ষকের দল। কোনও গাছের টং থেকে যেন একদল অশরীরী ও অমানুষ নরশিশু ককিয়ে কেঁদে উঠল, তারা হচ্ছে বকের ছানা। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক স্বরে ব্যাং চিৎকার করে উঠছে—এ আর কিছু নয়, সর্পের কবলগত হয়ে হতভাগ্যের প্রবল অথচ ব্যর্থ প্রতিবাদ।

এই চন্দ্রকিরণের রাজ্য দিয়ে, এই বনস্পতিদের তপোবন দিয়ে, এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির জগৎ দিয়ে, জলের বুকে ফেনার আলপনা কাটতে কাটতে তীব্র গতির বেগে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে বিমলদের মোটরবোট।

চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে, চারিদিকের শব্দ শুনতে শুনতে বিমল হঠাৎ বলে উঠল, 'শোনো কুমার, কান পেতে শোনো! মহাকাল এই নির্জন অরণ্যে একলা বসে জীবন-সংগ্রামের অনন্ত ইতিহাস নিজের মনেই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে যাচ্ছেন! কবিরা বনে এসে বিজনতা আর নীরবতার সন্ধান পান। কিন্তু এই মিষ্ট চাঁদের আলোয়, এই অরণ্যের অন্তঃপুরে এসে, তুমি কি মৃত্যুর নিষ্ঠুর রথচক্রের ধ্বনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছ না? এ বন নির্জন বটে, কিন্তু এখানকার অন্ধকারের অন্তরালে বসে কত কোটি কোটি কীটপতঙ্গ আর জীবজন্তু জীবনযুদ্ধের চিরন্তন নিষ্ঠুরতায় অশ্রান্ত আর্তনাদ করছে—কত দুর্বল কত সবলের কবলে পড়ে অত্যাচারিত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে কত সহস্র জীবের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে! আমরা মানুষ, আমরা হচ্ছি নগরবাসী সামাজিক জীব, প্রতিপদে আমাদেরও আত্মরক্ষা করতে হয় বটে,—কিন্তু সে হচ্ছে অন্য নানান কারণে। জীবনের ভয় যে সেখানে নেই এমন কথা বলি না, কিন্তু এখানকার তুলনায় সেখানকার নীতি হচ্ছে স্বর্গীয় নীতি! সেখানেও বিপদ আছে বটে, কিন্তু সে-বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে আমরা প্রায়ই সাবধান হতে পারি। আর এখানকার নীতি কী? এখানকার একমাত্র নীতি হচ্ছে—হয় মরো, নয় মারো! জীবন আর মৃত্যু নিয়ে এখানে চিরদিনের নির্দয় খেলা চলছে। যে অপরকে মারতে পারবে না, এখানে তাকে অপরের হাতে মরতেই হবে। এ অরণ্য হচ্ছে এক মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র—যে-যুদ্ধে কোনওদিন সন্ধি নেই, শান্তি নেই। চারিদিকে ওই যে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি জেগে রয়েছে, ওর ভিতর থেকে আমি খালি এক কঠিন বাণীই শুনতে পাচ্ছি—হয় মরো, নয় মারো! এখানকার আকাশের নীলিমার মধুরিমা, চাঁদের আলোর ঝরনা, সবুজ পাতার গান আর নদীর কলতান যার মনে স্বপ্ন আর কবিত্ব সঞ্চার করবে সে নিরাপদ থাকতে পারবে না এক মুহূর্তও! বুঝেছ কুমার, এখানে এসে আমাদেরও সজাগ হয়ে সর্বদা এই মন্ত্রই জপ করতে হবে—হয় মরো, নয় মারো। কবিরা বনের নিষ্ঠুর ধর্ম ভালো করে জানেন না, কবিতার অরণ্যে তাই আমরা কেবল মাধুর্যকেই দেখতে পাই।'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'আমার বন্দুক তৈরি আছে বন্ধু! বলো, কাকে মারতে হবে? ওই চন্দ্রকিরণকে, না কাসিম মিয়াকে?'

বিমল একটা হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিতে দিতে বললে, 'তুমি তৈরি আছ শুনে সুখী হলুম। থাক, আজকের মতো চাঁদের আলো আর কাসিম মিয়াকে অব্যাহতি দাও; এসো, এখন বিছানা পেতে ফেলে হাত-পা ছড়ানো যাক।'

পরদিন সকালে বোটের কামরায় বসে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে বিমল চা-পানের আয়োজন করছিল।

কুমার বাইরে বসে দুই ধারের দৃশ্য দেখছিল।

দৃশ্যের কিছুই পরিবর্তন হয়নি, কেবল চাঁদের আলোর বদলে সূর্য এসে এখন দিকে দিকে কাঁচা সোনার জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। নদীর দুই তীরে সবুজ বন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার ভিতর থেকে রাত্রের সেই ভয়ানক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না। বোট একদিকের তীর ঘেঁসে যাচ্ছিল, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই বনের ভিতরে গাছপালারা এমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই নজরে আসে না। মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানটা দেখাচ্ছে ঠিক জলাভূমির মতো। সেখান দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে গেলে এক কোমর কর্দমাক্ত জল ভেঙে অগ্রসর হতে হয়। সেই কর্দমাক্ত জলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে নলখাগড়ার দল। দূরে দূরে বনের শিয়রে শিয়রে দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মতো বাষ্পের মেঘ।

এক জায়গায় দেখা গেল, কুৎসিত দেহের আধখানা ডাঙার উপরে তুলে প্রকাণ্ড একটা কুমির স্থিরভাবে রোদ পোয়াচ্ছে। এত বড়ো কুমির কুমার আর কোনওদিন দেখেনি। তার বন্দুকটা পাশেই ছিল, সে আস্তে আস্তে সেটা তুলে নিয়ে কুমিরের দিকে নিজের লক্ষ্য স্থির করলে।

বিমল তখন দুটো চায়ের পেয়ালা হাতে করে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কুমারের অবস্থা দেখে সে-ও কুমিরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থামো কুমার, বন্দুক ছুড়ো না!'

কুমার একটু আশ্চর্য হয়ে বন্দুক নামিয়ে বললে, 'কেন?'

বিমল চললে, 'কুমিরের ঠিক উপরে গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এখন রাত নেই, কিন্তু জীবন-যুদ্ধের জের এখনও চলেছে।'

কুমার সেইদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল জড়িয়ে একটা মস্ত অজগর সাপ স্থির ভাবে কুমিরকে লক্ষ করছে। হঠাৎ তার মাথাটা ডাল থেকে একটুখানি নীচে নেমে পড়ল, তারপর দু-এক বার এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল—এবং তার পরেই ঠিক বিদ্যুতের ঝড়ের মতো তার দেহটা একেবারে কুমিরের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল। তারপর সমস্ত জল তোলপাড় করে যে দৃশ্য শুরু হল ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না! কুমির চায় তার বলিষ্ঠ লাঙ্গুলের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে অজগরকে কাবু করে জলে ডুব দিতে আর অজগর চায় পাকে পাকে কুমিরকে ক্রমেই বেশি করে জড়িয়ে ডাঙার উপরে টেনে তুলতে।

এই বন্য নাটকের শেষ দৃশ্য দেখবার আগেই বোটখানা নদীর একটা মোড় ফিরে আড়ালে গিয়ে পড়ল।

কুমার বললে, 'কুমিরটাকে আমি মারতে পারতুম, অজগরটাকেও পারতুম। কিন্তু বিমল, প্রকৃতির অভিশাপ যাদের উপরে এসে পড়েছে, তাদের কারুকে মারতে আমার হাত উঠল না। ওরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা পূরণ করুক।'

বিমল বললে, 'এখন বন্দুক রেখে চা খাও। তারপর এসো, কাসিম মিয়ার সঙ্গে একটু কথা কওয়া যাক। ওরা আজ সকাল থেকে মাছ ধরতে বসেছে দেখছি।'

পানসি থেকে বিমলের কথা শুনতে পেয়ে কাসিম বলে উঠল, 'হ্যাঁ হুজুর, হাতে কোনও কাজ নেই, কী আর করি বলুন!'

বিমল বললে, 'মাছ-টাছ কিছু ধরতে পেরেছ নাকি কাসিম?'

—'ধরেছি হুজুর। দুটো মাছ ধরেছি।'

—'বেশ, বেশ, আমাদের দু-একটা উপহার দিয়ো। ......কিন্তু বলতে পারো কাসিম, সে-দ্বীপে গিয়ে পৌঁছোতে আমাদের আরও কত দেরি লাগবে?'

কাসিম বললে, 'আমাদের পানসিতে দাঁড় টেনে গেলে সেখানে পৌঁছুতে হয়তো আরও দু-দিন লাগত। কিন্তু আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওই বিলিতি বোট, বোধহয় আজ রাতেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।'

দুপুর গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যার পর আবার রাত এল। আকাশ থেকে আবার প্রতিপদের চাঁদের সাজি চারিদিকে আলোর ফুল ছড়াতে লাগল, অরণ্যের মর্মরধ্বনি ও নদীর জলকল্লোল আবার স্পষ্টতর হয়ে উঠল, বনভূমির ভিতর থেকে আবার স্ফুট ও অস্ফুট বিচিত্র সব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যেতে লাগল—চারিদিকে আবার অন্ধকারের আবছায়ায় নানা বিভীষিকার সাড়া পাওয়া গেল।

নদী ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠেছে, দুই তীরের বন রেখা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

কাসিম বললে, 'হুজুর, আমরা সমুদ্দুরের কাছেই এসে পড়েছি।'

আরও ঘণ্টাখানেক পরে নদীর দুই তীর এত দূরে সরে গেল যে বনের ভিতরকার শব্দ আর বড়ো কানে আসে না। সেখানে শোনা যায় চারিদিক আচ্ছন্ন করা কেবল নদীর অশ্রান্ত কোলাহল। এ যেন নদী-কল্লোলের পৃথিবী!

সেই কোলাহলের ভিতরে দূর থেকে আর-একটা শব্দ বিমল ও কুমারের কানে ভেসে এল।

সে শব্দ কাসিমও শুনেছিল। সে উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, 'হুজুর, ও আবার কীসের আওয়াজ?'

বিমলও কান পেতে শুনতে লাগল। শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে,—তার মানে, শব্দটা ক্রমেই তাদের কাছে এগিয়ে আসছে।

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'কাসিম, আমাদের মতো আর একখানা মোটরবোট এই দিকে আসছে। ও তারই শব্দ।'

কুমার বললে, 'ওটা যে মোটরবোটের শব্দ তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন অসময়ে এখানে কার ও মোটরবোট? হ্যাঁ কাসিম, এখান দিয়ে প্রায়ই কি এইরকম নৌকো আর মোটরবোট আনাগোনা করে?'

কাসিম বললে, 'না হুজুর, এখান দিয়ে নৌকো আনাগোনা করে না। সেই বুড়োবাবুটি পথ দেখিয়ে নিয়ে না এলে আমরা কোনওদিনই এদিকে আসতুম না।'

বিমল বললে, 'কাসিম, তাহলে ওই মোটরবোট চড়ে আসছেন তোমাদের সেই বুড়োবাবুটি।'

কাসিম বললে, 'হতে পারে হুজুর, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম, সেই বুড়োবাবুটি আবার রাইপুরে গিয়েছেন। হয়তো তিনিই ফিরে আসছেন।'

বিমল বললে, 'তোমাদের সেই বুড়োবাবু রোজ এদিকে ফিরে আসুন, আমাদের তাতে কোনওই আপত্তি নেই। কিন্তু আজ তিনি আমাদের যাতে এইখানে দেখতে না পান, এখনই এমন কোনও ব্যবস্থা করতে হবে।'

কুমার বললে, 'কিন্তু এই খোলা নদীতে লুকোতে গেলে নৌকোসুদ্ধ পাতাল প্রবেশ ছাড়া আমাদের তো আর কোনও উপায় নেই।'

বিমল বললে, 'উপায় বোধহয় আছে কুমার! মাইল খানেক তফাতে ছোটো একটা চরের মতো কী যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?' —মোটরবোট যে চালাচ্ছিল তার দিকে ফিরে সে বললে, 'ওহে জোরে চালাও, খুব জোরে!'

বোটের গতি তখন দ্বিগুণ বেড়ে উঠল এবং মিনিটকয়েক পরেই তারা একটা চরের কাছে এসে পড়ল।

গঙ্গাসাগরের কাছে সুন্দরবনের অসংখ্য নদীর ভিতরে এইরকম সব ছোটো ছোটো চর দেখা যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে এই চরগুলো জলের উপরে জেগে থাকে, তার বুকে ঝোপঝাপ ও জঙ্গলের আবির্ভাব হয় এবং দূর থেকে তাদের দেখায় এক একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। কিন্তু বর্ষার সময়ে নদীর জল যখন বেড়ে ওঠে তখন এইসব চরের কোনও চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাদের বোট এইরকম একটা চরের কাছেই এসে পড়ছিল। এখানেও ঝোপঝাপ ও বনজঙ্গলের কোনওই অভাব ছিল না।

বিমল বললে, 'আরও এগিয়ে মোড় ফিরে বোটখানাকে চরের ওপাশে নিয়ে চলো। ঝোপের আড়ালে গিয়ে পড়লে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

বোটের চালক বিমলের কথামতোই কাজ করলে।

বিমলদের বোট দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে এসেছিল বলে পিছনের বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ তখন আর শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু খানিক পরেই সেই শব্দটা ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠল।

কুমার বললে, 'বিমল, আমরা যখন ও বোটের শব্দ শুনতে পেয়েছি, তখন ওরাও যে আমাদের শব্দ শুনতে পায়নি এমন কথা বলা যায় না।'

বিমল চিন্তিত ভাবে বললে, 'তা যদি পেয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কথা।'

কুমার বললে, 'ভাবনা কীসের?'

—'তুমি তো শুনেছ কুমার, দ্বীপের ওই ভদ্রলোক চান না যে আর কেউ তাঁর ওখানে গিয়ে ওঠে। আমরা এসেছি শুনলে তিনি খুশি হবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

পিছনের মোটরবোটের শব্দ তখন খুব কাছেই এসে পড়েছে। কিন্তু চরের কাছে এসেই শব্দটা থেমে গেল।

বিমল মৃদু স্বরে বললে, 'কুমার, তোমার সন্দেহই সত্য। ওরা আমাদের বোটের শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। তাই ওরা বোট থামিয়ে লক্ষ করছে আমরা কোথায় মিলিয়ে গেলুম।'

কুমার বললে, 'ওরা যদি এদিকে আমাদের খুঁজতে আসে?'

—'খুঁজতে যদি আসে তাহলে উপায় কী? তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করতেই হবে।'

—তুমি কি কোনওরকম বিপদের ভয় করছ বিমল?'

—বিপদ? বিপদের ভয় আছে কি না ঠিক বলতে পারি না, তবে এখানে আমাদের দেখতে পেলে ওই বোটের লোকেরা হয়তো নতুন জামাই বলে ভ্রম করবে না। কুমার, সকলের চোখের আড়ালে যারা লুকিয়ে এমন জায়গায় বাস করে, তারা খুব ভালোমানুষ বলে মনে হয় না।'

কুমার আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুকটা টেনে নিলে।

বিমল বললে, 'আমারও বন্দুকটা এগিয়ে দাও,—সাবধানের মার নেই।'

কাসিম ভীত স্বরে বললে, 'হুজুর, আমরা কী করব?'

বিমল বললে, 'তোমরা আপাতত চুপ করে নৌকোর ভিতরে বসে থাকো। দরকার হলে আমি তোমাদের ডাকব।'

সেই অজানা মোটরবোটের শব্দ আবার জেগে উঠল।

কুমার বন্দুকটা পরীক্ষা করতে করতে চুপি চুপি বললে, 'বিমল, বোধহয় ওরা এইদিকেই খুঁজতে আসছে।'

বিমল বললে, 'খুব সম্ভব তাই—'

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

অমানুষিক কণ্ঠস্বর

বিমল ও কুমার উৎকর্ণ হয়ে মোটরবোটের গর্জন শুনতে লাগল।

কিন্তু খানিক পরেই তারা বুঝতে পারলে, গর্জনটা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসছে।

ক্রমে শব্দ এতটা ক্ষীণ হয়ে এল যে, আর কোনওই সন্দেহ রইল না।

কুমার সানন্দে বলে উঠল, 'যাক, বাঁচা গেল! ও বোটখানা এদিকে আসছে না, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে!'

বিমল বললে, 'কিন্তু ওদের মনে সন্দেহ হয়েছিল বলেই যে বোটখানা হঠাৎ এখানে থেমেছিল, সেটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।—এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, ও বোটখানাকে আরও খানিক এগিয়ে যেতে দেওয়া। ততক্ষণে এইখানে বসে বসে রেঁধে বেড়ে খাওয়া-

দাওয়া সেরে নেওয়া যাক। ইকমিক কুকারে খিচুড়ি চড়িয়ে দাও কুমার। কাসিম মিয়া, আমাদের চুবড়ি থেকে একটা মুরগি বার করে স্বর্গে পাঠাব, না তোমরা দু-একটা মাছ উপহার দিতে পারবে?'

সন্ধ্যার মায়া-আলো মিলিয়ে গেল, আকাশ থেকে নেমে এল অন্ধকারের যবনিকা। বিমলদের মোটরবোট চলছে—চারিদিকে চলচল-ছলছল জলের কান্না।

প্রতিপদের চাঁদ উঠল। কিন্তু আজকে আর বন্য জীবনের কোনও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নেই—এমনকি কোনওদিকে বনজঙ্গলের কোনও চিহ্নই নেই,—উপরে আছে খালি আকাশের অনন্ত চন্দ্রাতপ এবং ডাইনে আর বাঁয়ে, সুমুখে আর পিছনে আছে শুধু সেই চলচল-ছলছল জলের কান্না।

চতুর্দিকে সেই অসীমতার অপূর্ব আভাস দেখে কুমার বললে: 'প্রলয়পয়োধিজলে নারায়ণ সেদিন বটপত্রে ভেসে গিয়েছিলেন, সেদিন তাঁরও অবস্থা হয়েছিল বোধ করি আমাদেরই মতো! এই অকূল জলের জগতে আমাদের বোটখানাকে বটপত্রের চেয়ে বড়ো বলে মনে হচ্ছে না।'

বিমল তখন কুমারের কথা মন দিয়ে শুনছিল না, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করছিল।

নৌকোর পিছনের হালের কাছে দাঁড়িয়ে কাসিমও সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওই সেই দ্বীপ, হুজুর!'

বিমল বললে, 'তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ তো কাসিম? কোনও ভুল হয়নি?'

'না হুজুর, ভুল হতে পারে না। এখানে আর কোনও দ্বীপ নেই।'

বোট এগিয়ে চলল—দ্বীপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

এখানটা সমুদ্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

কুমার বললে, 'এখানে যদি নৌকো ডোবে, বাঁচবার কোনও উপায়ই নেই!'

বিমল বললে, 'বাঁচবার একমাত্র উপায় ওই দ্বীপ। কিন্তু ওখানেও আছেন সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধ—যিনি অতিথি পছন্দ করেন না।'

কুমার বললে, 'কে জানে ওই দ্বীপের কী রহস্য!'

কাসিম বললে, 'হুজুর, আপনারা কি আজকেই ওখানে গিয়ে নামবেন?'

বিমল বললে, 'এই রাত্রে? নিশ্চয়ই নয়! আমরা ডাঙার কাছে একটা ঝুপসি জায়গা পেলেই নোঙর করব। ডাঙায় নামব কাল সকালে। ড্রাইভার, তুমি মোটরের ইঞ্জিন থামাও, নইলে ও-শব্দ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবে। —কাসিম, এখন বেশ জোয়ারের টান আছে, এইবারে তোমার নৌকো আমাদের বোটকে দ্বীপের কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারবে?'

কাসিম বললে, 'পারবে।'

তখন সেই ব্যবস্থাই হল।

বিমল বললে, 'সবাই আস্তে আস্তে দাঁড় ফ্যালো। সাবধানের মার নেই।'

দ্বীপ কাছে এসে পড়ল। তার বনজঙ্গলে জ্যোৎস্নার ঝালর ঝিকমিক করছে এবং তার সর্বত্র বিরাজ করছে নিস্তব্ধ এক থমথমে নির্জনতা।

কুমার বললে, 'বুড়ো এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখছে।'

বিমল বললে, 'স্বপন দেখতে দেখতে সে জেগে উঠতেও পারে!'

দ্বীপের ভিতর থেকে জীবনের টুঁ শব্দটি পর্যন্ত কানে এল না। এখানে যে মানুষ আছে, গাছ-পাতার ফাঁক দিয়ে কোনও কম্পমান আলোকশিখাও তার ইঙ্গিত দিলে না। এখানে যে প্রবল ও দুর্বল পশু আছে, পূর্বপরিচিত বন্য নাট্যাভিনয়ের কোনও হুঙ্কার বা আর্তনাদও তার প্রমাণ দিলে না। বিমল ও কুমারের মনে হল গঙ্গাসাগরের লবণাক্ত অশ্রুজলের উপরে অজানা বিভীষিকার ছায়া নাচিয়ে এই রহস্যময় দ্বীপ যেন পৃথিবীর ভিতরে থেকেও পৃথিবীর ভিতরে নেই।

বিমল চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, 'কাসিম, বুড়োবাবুকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে সেখানটা তুমি চিনতে পারবে?'

কাসিম মাথা নেড়ে বললে, 'না হুজুর। তিনি বোধহয় কোনও আঘাটায় নেমেছিলেন। এখানে কোনও ঘাট আছে কি না আমরা জানি না।'

বিমল বললে, 'তাহলে কাল সকালে আমাদেরও আঘাটাতেই নামতে হবে। আপাতত এক কাজ করো। ওই যেখানে অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ প্রায় জলের উপরে হেলে পড়ে চারিদিক অন্ধকার করে তুলেছে, ওইখানে গিয়েই নৌকো বাঁধো। এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না; এরপর একবার ওই অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারলেই আমরা আজকের রাতের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

কাসিম বললে, 'কিন্তু ও-অন্ধকার তো ভালো নয় হুজুর! মাথার উপরে গাছপালা—সেখানে অজগর থাকতে পারে। পাশেই ডাঙা—সেখানে বাঘ থাকতে পারে। যদি তাদের কেউ নৌকোয় এসে ওঠে?'

—'আমরা কামরার সব জানলা দরজা বন্ধ করে ভিতরে শুয়ে থাকব। এখন তো রাত দুপুর, বাকি রাতটুকু কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারব বোধহয়।'

নৌকো ও মোটরবোট ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতরে ঢুকল। সেইখান থেকে তারা দেখতে পেলে, আশেপাশের কষ্টিপাথরের মতো কালো ও নিরেট ছায়ায় সীমানা ছাড়িয়েই শুরু হয়েছে মুক্ত আকাশ থেকে নেমে আসা চাঁদের আলো-লহর—রুপোর জলতরঙ্গে নেচে নেচে উঠছে আলো চিকন ফেনার মালা। সেই রূপময় তরল ও চঞ্চল অসীমতা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে যে সুন্দর সংগীত গাইতে গাইতে, ভাবুকের মন নিয়ে তা শুনলে শান্তি ও আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

সবাই কামরার ভিতরে ঢুকে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে।

বিছানা পেতে বিমল ও কুমার শুয়ে পড়ল।

একথা সেকথা কইতে কইতে তাদের দুজনেরই চোখের পাতা তন্দ্রার আমেজে যখন ভারী হয়ে এসেছে, তখন বাইরের জলকল্লোলের মাঝখানে আচম্বিতে কী একটা বেসুরো শব্দ জেগে উঠল।

প্রথমে উঠল গাছের পাতার মর্মর-শব্দ,—যেন তিন-চারটে বড়ো বড়ো জীব ডাল-পাতার ভিতরে লাফাতে লাফাতে নৌকোর কাছে এগিয়ে আসছে।

বিমল ধড়মড় করে উঠে বসে বললে, 'অজগর নাকি?'

তারপর শোনা গেল—'কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচির-মিচির!'

কুমার আবার পাশ ফিরে শুয়ে চোখ মুছে বললে, 'বাঁদর।'

বিমলও আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে শোনা গেল—'কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচ মিচ—

কচমচে কাঁচা মাথা
কুচি কুচি কচু কাটা
কিছু যদি বোঝো দাদা,
ফিরে যাও ক্যালকাটা।

হা হা হা হা হা হা হা হা হা!'—সে কী হাসি, যেন থামতেই চায় না!

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ওঠো কুমার! বন্দুক নাও! আমি দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখি, তুমি বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হয়ে পাশে থাকো। বিপদ দেখলেই বন্দুক ছুড়বে।'

দরজা খুলে টর্চের উজ্জ্বল আলোকে কেবল দেখা গেল, বোটের ঠিক ওপারেই মস্ত বটগাছের দুটো-তিনটে ডাল খুব জোরে নড়ছে, যেন এইমাত্র কেউ সেখানে থেকে লাফ মেরে ঘন পাতার আড়ালে সরে গিয়েছে।

কুমার বললে, 'প্রথমে বাঁদরের কিচির-মিচির তারপরই মানুষের গান আর হাসি!'

বিমল বললে, 'বাঁদরের কিচির-মিচির ঠিকই শুনেছি বটে। কিন্তু যে গান আর যে হাসি শুনলুম, ও কি মানুষের? অমন অস্বাভাবিক আওয়াজ কোনও মানুষের গলায় কেউ কি কখনও শুনেছ?'

কুমার আর একবার চারিদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু কোনও গাছে বাঁদরও নেই। তবে কি আমরা কোনও অশরীরীর সাড়া পেলুম?'

বিমল হতভম্বের মতো বললে, 'এতদিন পরে শেষটা কি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতে হবে?'

খানিক তফাত থেকে আবার আর একরকম আওয়াজ জেগে উঠল—'ঘট ঘট ঘ্যাট ঘ্যাট!

ঘট ঘট ঘ্যাট ঘ্যাট!'

কুমার চমকে বলে উঠল, 'ও আবার কী?'

বিমল বললে, 'ওই শোনো!'

'ঘট-ঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট
ঘট-ঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট—
ঘুটঘুটে আন্ধি,
একলাটি কান্দি,
রেখে গেছে বান্ধি
সমুদ্রে!

মোটরের পাণ্ডা!
জল খুব ঠান্ডা
মোরগের আণ্ডা
দে ক্ষুদ্রে!

দাও যদি ঝম্প—
মোর মুখে লম্ফ
নিবে যাবে লম্ফো
চক্ষের!

কেন শ্রম যত্ন?
মোরা দুঃস্বপ্ন,
হেথা নেই রত্ন
যক্ষের।'

বিমল তাড়াতাড়ি জলের উপরে টর্চের আলো নিক্ষেপ করলে—কিন্তু বৃথা। কোথাও জনপ্রাণী নেই, কেবল এক জায়গায় জল অত্যন্ত তোলপাড় করছে—যেন কেউ সেখানে সবে ডুব দিয়েছে।

বিমল বোকার মতন কুমারের মুখের পানে তাকালে। কিন্তু কুমার বলে উঠল, 'বুঝেছি, বুঝেছি! এসব হচ্ছে ওই দ্বীপের বুড়োর চালাকি! নিশ্চয়ই সে ভেনট্রিলোকুজম জানে! লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে!

বিমল বললে, 'অসম্ভব নয়। কিন্তু গাছের ডাল কেন হঠাৎ দোল খায়, জল কেন হঠাৎ তোলপাড় করে?'

কুমার জুতসই কোনও জবাব না দিতে পেরে বললে, 'বুড়ো হয়তো ম্যাজিকের নানান কল-কৌশল জানে।'

বিমল বললে, 'ওসব বাজে কথা ভাববার সময় এখন নয়। উপরে গাছে, নীচে জলে ভিন্ন ভিন্ন গলায় কারা অমন অদ্ভুত রকম শব্দ করে, পদ্যে কথা কয়, হা হা করে হাসে, আমাদের ভয় দেখায়, আবার সাবধান করেও দেয়? তারা আমাদের দেখে, কিন্তু নিজেরা দেখা দেয় না! তারা স্পষ্টই বলেছে—'এ বড়ো মারাত্মক জায়গা, এখানে ধনরত্ন কিছুই নেই, ভালোয় ভালোয় তোমরা প্রাণ নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাও!' কে তারা? তারা শত্রু বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু তারা কি আমাদের বন্ধু?'

হঠাৎ কোনওরকম পূর্বাভাস না দিয়েই সারা দ্বীপ যেন সশব্দে সজাগ হয়ে উঠল।

সমুদ্রে প্রবল বন্যার দুরন্ত গর্জনের মতো, আগ্নেয়গিরির অগ্নিহুঙ্কারের মতো কল্পনাতীত কী এক ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি যেন ক্রুদ্ধ আবেগে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে তুললে। এবং তারই মাঝে মাঝে আবার শোনা যেতে লাগল—কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচ কিচ কিচ! ঘ্যাট ঘ্যাট ঘট ঘট ঘ্যাট ঘ্যাট! বানর ও আর একটা কোনও পশুর ভীত আর্তনাদ।

কুমার বিহ্বলের মতো বললে, 'দ্বীপে ও কাদের চিৎকার? হুড়মুড় করে গাছ ভেঙে পড়ছে—চিৎকারও যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!'

ওদিকে পানসি থেকে কাসিমও সভয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'হুজুর! আমার লোকজনরা ভয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠেছে! বলছে, তারা এই শয়তানের দ্বীপের কাছে আর একদণ্ড থাকবে না! আমরা পানসি নিয়ে চলে যেতে চাই!'

বিমল ফাঁপরে পড়ে বললে, 'সে কী কাসিম মিয়া, তোমরা কি আমাদের এখানে ফেলেই পালাতে চাও?'

'কী করব হুজুর, ভূতের সঙ্গে কে লড়াই করবে? আমরা গরিব মানুষ, ঘরে মা-বউ-বেটা আমাদের পথ চেয়ে দিন গোনে, আমরা কি ভূতের হাতে প্রাণ দিতে পারি?'

বিমল বললে, 'শোনো কাসিম, আরও বকশিশ চাও তো বলো!'

কাসিম মাথা নেড়ে বললে, 'মাপ করবেন হুজুর! প্রাণ গেলে বকশিশ নেবে কে? ...ভাই সব! বোট থেকে আমাদের নৌকোর দড়ি খুলে নাও!'

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

বিপদ জলে-স্থলে

কিন্তু সামুদ্রিক বন্যার গর্জনের মতো, আগ্নেয়গিরির হুঙ্কারের মতো, কালবৈশাখীর বজ্রকণ্ঠের চিৎকারের মতো ওসব কীসের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দ্বীপের ভিতর থেকে ক্রমেই জলের দিকে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে? ওই সব সৃষ্টিছাড়া আওয়াজ তো কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবের নয়, ওদের উৎপত্তি যেন জ্যান্ত জীবজন্তুর কণ্ঠ থেকেই!... পৃথিবীতে এমন কোনও জীবজন্তু আছে, যারা এমন সব ভয়ানক অপার্থিব চিৎকার করতে পারে?

সেই আশ্চর্য চিৎকার একেবারে দ্বীপের প্রান্তে নদীর ধারে এসে পড়ল। বিমল অবাক হয়ে দেখলে, একটা বনের অনেকখানি অংশ যেন হেলে বেঁকে একবার দুমড়ে পড়ছে এবং আর্তনাদ করে আবার শূন্যে ঠিকরে উঠছে,—তার ভিতরে যারা আজ এসে ঢুকছে, বনস্পতিরা তাদের যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। সেই অসহনীয় অত্যাচারী কল্পনাতীত দুরন্তদের ভৈরব হুঙ্কার বনস্পতিদের আর্ত মর্মর নাদকেও ডুবিয়ে দিলে।

কুমার হঠাৎ বিমলের কাঁধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

বিমল আগেই দেখেছিল। চাঁদ তখন পশ্চিম দিকে গিয়ে একটা তালকুঞ্জের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। আচম্বিতে সেই কুঞ্জের তালগাছগুলো চারিদিকে ঠিকরে পড়ল এবং তার মধ্যে বিকট দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠল সুদীর্ঘ ও বিরাট একটা ছায়ামূর্তি—চকিতের জন্যে। পরমুহূর্তে সেই মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তালগাছগুলোও আবার খাড়া হয়ে উঠে যেন বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

ওই মুহূর্তের মধ্যেই বিমল দেখে নিলে, সেই বিরাট দানবের দেহ প্রায় তালগাছগুলোরই মতো উঁচু।

কাসিম কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'হুজুর, আমরা নৌকো খুলে দিয়েছি! আপনারা কী করবেন?'

বিমল বললে, 'আমরাও যাব। ড্রাইভার, মোটরের স্টার্ট দাও। কাসিম তোমাদের পানসি আমাদের বোটের পিছনে বেঁধে নাও।'

হঠাৎ অন্ধকার জলের ভিতর থেকে আরও অন্ধকার মস্ত একটা কুৎসিত মুখ জেগে উঠল—তার চোখদুটো জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো।

পানসির লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'কুমির!'

কুমিরটা আবার ডুব মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাছের একটা বড়ো ডাল হঠাৎ দোল খেলে—সেখানেও দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। সেটা বানর, না মানুষ, না অন্য কোনও জীব তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত আগ্রহভাবে নৌকোর লোকদের গতিবিধি লক্ষ করছে, এটুকু ভালো করেই বুঝতে পারা গেল।

দ্বীপের বনজঙ্গলের ভিতর থেকে এতক্ষণ যে ভীষণ হট্টগোল উঠে চতুর্দিক শব্দময় করে তুলেছিল, আচম্বিতে তা থেমে গেল। অরণ্যের ছটফটানিও বন্ধ হয়ে গেল। বিমল ও কুমারের মনে হল যেন বিরাট এক নিস্তব্ধ বিভীষিকা দম বন্ধ করে ওঁত পেতে তাদের উপরে হঠাৎ লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।

মোটারবোটের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই শোনা গেল কে একজন হা হা হা হা করে অট্টাহাস্য করছে।

কুমার তাড়াতাড়ি টর্চের আলোটা সেইদিকে নিক্ষেপ করলে।

একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় এক দীর্ঘদেহ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে মূর্তির কাছ পর্যন্ত টর্চের আলোক রেখা ভালো করে পৌঁছোল না বলে তাকে স্পষ্ট করে দেখা গেল না; কিন্তু এটা বোঝা গেল, তার ধবধবে সাদা দীর্ঘ চুল, দাড়ি ও গায়ের জামাকাপড় লটপট করে হু হু বাতাসে উড়ছে।

কাসিম বললে, 'ওই সেই বুড়ো ভদ্রলোক!'

বিমল তাঁর উদ্দেশে চিৎকার করে বললে, 'নমস্কার মশাই, নমস্কার! এ যাত্রায় আর আপনার সঙ্গে আলাপ করা হল না।'

সে মূর্তি যেন পাথরের মূর্তি। একটু নড়লও না, আর কোনও সাড়াও দিলে না।

মোটরবোট ক্রমেই দ্বীপ থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে, দ্বীপ ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বিমল ও কুমার একদৃষ্টিতে সেই রহস্য-রাজ্যের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

তারপর দ্বীপটা যখন একেবারে চোখের আড়ালে চলে গেল, বিমল বললে, 'কুমার আবার আসব, আর রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই আসব। ও-দ্বীপের কিছুই আমি জানতুম না বলে এবার ব্যর্থ হতে হল, কিন্তু এর পরের বারের ইতিহাস হবে অন্যরকম।'

কুমার বললে, 'কলকাতা থেকে আমরা আশি মাইলের বেশি দূরে এসেছি বলে মনে হচ্ছে না, মনে হয় আমরা যেন অন্য কোনও পৃথিবীতে এসে হাজির হয়েছি। যা দেখলুম, আর যা শুনলুম, তা স্বপ্ন, না চোখ আর কানের ভ্রম?'

বিমল বললে, 'আমাদের সামনে এখন অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত, ওই বুড়ো কে? কেন সে এমন অদ্ভুত জায়গায় বাস করে? দ্বিতীয়ত, জল আর গাছের উপর থেকে

কারা ছড়া কেটে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছিল? কেনই বা তারা এখানে থাকে আর কেনই বা দেখা দেয় না? তৃতীয়ত, দ্বীপের বনজঙ্গলের ভিতরে কারা অমন হট্টগোল আর হুড়োহুড়ি করছিল? চতুর্থত, তালগাছগুলো ঠেলে যে অসম্ভব বিরাট ছায়ামূর্তিটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, সেটা কী? পঞ্চমত, সেই বাঘের মতন বড়ো বেড়ালটা কি এই দ্বীপেই বাস করত? সেরকম বিড়াল কি এখানে আরও আছে?'

কুমার বললে, 'দ্বীপের ব্যাপার যা দেখলুম তাতে মনে হচ্ছে বেশ একটি বড়ো দলবল না নিয়ে এলে আমরা ওখানে নামতেই পারব না।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ। কেবল দলবল নয়, দলে বাছা বাছা লোক নিতে হবে। কাসিমদের মতো ভিতু লোক নিয়ে কোনওই কাজ হবে না। এবারে যখন আসব, তখন আমাদের দলে বিনয়বাবু, কমল আর রামহরি তো থাকবেই, তার উপরে জনকয়েক বন্দুকধারী পুলিশের লোক যাতে পাওয়া যায়, সে-চেষ্টাও করতে হবে; নইলে এবারে এসেও হয়তো দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব না। দ্বীপে যারা আছে তারা বাধা দেবেই।'

কুমার বললে, 'আর আমাদের বাঘা? সে কার কাছে থাকবে?'

বিমল বললে, 'বাঘার মতন চালাক কুকুর অনেক মানুষের চেয়ে ভালো। এখানে তাকেও হয়তো দরকার হবে। সে-ও আমাদের দলে থাকবে।'

পানসি থেকে কাসিম শুধোলে, 'হুজুর আপনারা কোন দিকে যাবেন?'

বিমল বলল, 'আমরা পোর্ট ক্যানিংয়ে গিয়ে নামব।'

—'তাহলে হুজুর আমাদের রাইপুরের কাছে ছেড়ে দেবেন।'

—'আচ্ছা। চলো কুমার, শেষ রাতে আমরা একটু ঘুমিয়ে নি।'

বিমলের কথা শেষ হবামাত্রই হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে তলিয়ে দিয়ে একটা আর্তনাদ জেগে উঠল—'রক্ষা করো, রক্ষা করো!'

বিমল ও কুমার বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল। এই জনমানবহীন জলের দেশে সাহায্য চায় কে!

তখন একটা ছোট্ট চরের পাশ দিয়ে বোট যাচ্ছিল। তারা চাঁদের নির্বাণোন্মুখ ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখলে চরের উপরে সাদা মতো চলন্ত কী একটা দেখা যাচ্ছে।

আবার আর্তনাদ শোনা গেল—'রক্ষা করো! আমাকে এখানে ফেলে যেয়ো না!'

বিমল বললে, 'ড্রাইভার, বোট চরে ভেড়াও।'

কাসিম ভীত স্বরে বললে, 'হুজুর, এও ভূতের কারসাজি! এখানে মানুষ থাকে না!'

বিমল তার কথায় কর্ণপাত করলে না।

বোট চরে গিয়ে ঠেকল। 'টর্চ' জ্বেলে দেখা গেল, একটা লোক পাগলের মতো নৌকোর দিকে ছুটে আসছে—তার জামা কাপড় ছেঁড়া, চুল উশকোখুশকো, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত।

লোকটা কাতর স্বরে বললে, 'আজ তিন দিন অনাহারে এখানে পড়ে আছি! আমাকে বাঁচান!'

বিমল তাকে নৌকোর উপরে উঠতে বললে।

নৌকোয় উঠে সে বললে, 'আগে আমাকে কিছু খেতে দিন!'

কুমার তখনই একখানা পাউরুটি, কিছু মাখন ও খানিকটা জেলি এনে দিলে। লোকটা গোগ্রাসে তা খেয়ে ফেললে।

সে একটু ঠান্ডা হলে পর বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কেমন করে এখানে এলে?'

সে বললে, 'গ্রহের ফেরে! আমি হচ্ছি কাঠের ব্যাপারি। নৌকো করে লোকজনের সঙ্গে এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম। পথে একটা দ্বীপ পেয়ে ভাবলুম, ওখানে নেমে দেখব ভালো কাঠের গাছ পাওয়া যায় কি না। সেই কুবুদ্ধিই হল আমার কাল। দ্বীপে গিয়ে নামবামাত্র চারিদিকে যেন দৈত্যদানবরা চিৎকার করতে লাগল আর ভূমিকম্প হতে লাগল! আমার দলের লোকদের কী হল জানি না, কিন্তু আমি দেখলুম, হাতির মতো কী একটা জানোয়ার তিরের মতো আমার দিকে তেড়ে আসছে!'

বিমল বললে, 'সে জানোয়ারটাকে কি মস্ত একটা বিড়ালের মতো দেখতে?'

—'বিড়াল? না, তাকে দেখতে হাতির মতো বড়ো যেন একটা ডালকুত্তা!'

—'তারপর?'

—'আমি তখন জলের কাছে ছিলুম। প্রাণের ভয়ে তখনই জলে ঝাঁপ দিলুম—সঙ্গে সঙ্গে আমার খুব কাছেই প্রকাণ্ড একটা কুমির ভেসে উঠল। ডাঙায় প্রকাণ্ড অদ্ভুত জানোয়ার আর জলে কুমির দেখে আমার যে কী অবস্থা হল, সেটা বুঝতেই পারছেন। যদিও প্রাণের আশা আর রইল না, তবু দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সাঁতার কাটতে লাগলুম,—কারণ আমি শুনেছিলুম, মানুষ যখন সাঁতার কাটে কুমির তখন তাকে ধরতে পারে না। একথা সত্যি কি না জানি না, কিন্তু সেই কুমিরটা নাছোড়বান্দার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর এল বটে, তবু আমাকে ধরবার কোনও চেষ্টাই করলে না। তারপর সে ডুব মারলে। আমার ভয় আরও বেড়ে উঠল, ভাবলুম জলের ভিতর থেকে এইবারে সে আমাকে কামড়ে ধরবে! ক্রমাগত পা ছুড়তে লাগলুম! ...সেইভাবে ভাসতে ভাসতে যখন এই চরে এসে উঠলুম, তখন আমি আধমরা। এই চরেই আজ তিন দিন তিন রাত কেটে গেছে। আজ আপনাদের নৌকো এ পথে না এলে আমি অনাহারেই মারা পড়তুম।'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

কুম্ভকর্ণের বংশধর

বিনয়বাবু তাঁর পরীক্ষাগারে বসে একমনে আকাশের গ্রহ-তারা দেখবার বড়ো দূরবিনটা সাফ করছিলেন, এমন সময় একখানা খবরের কাগজ হাতে করে কমল সেই ঘরে প্রবেশ করল।

কমলের পায়ের শব্দ বিনয়বাবু চিনতেন, কাজেই দূরবিন থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'এসো কমল।'

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'বিনয়বাবু, আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

—'না। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে, নতুন কোনও খবর আছে।'

—'কেবল নতুন নয়, আশ্চর্য খরব!'

বিনয়বাবু দূরবিন থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আমরা মঙ্গল গ্রহে গিয়েছি, ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়েছি, হিমালয়ের ভয়ঙ্করের দেশে গিয়েছি। আমাদের কাছে কি কোনও খবরই আর আশ্চর্য বলে মনে হবে?'

কমল বললে, 'আচ্ছা, আগে আপনি খবরটা শুনুন।' এই বলে সে কাগজখানা খুলে পড়তে লাগল :

গঙ্গাসাগরের কুম্ভকর্ণ

'গঙ্গাসাগরের নিকটে এক অদ্ভুত রহস্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সাগর দ্বীপের নিকটস্থ নদ-নদীতে যাহারা নৌকো লইয়া আনাগোনা করে, সম্প্রতি তাহাদের ভিতরে অত্যন্ত বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে।

কয়েকখানি নৌকার এবং তাহাদের মাঝি-মাল্লার ও লোকজনের কোনও খবর পাওয়া যাইতেছে না, তাহারা যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল সেখানেও ফিরিয়া আসে নাই, অথবা গন্তব্যস্থলেও গিয়া উপস্থিত হয় নাই। যদি মনে করা যায় কোনওরকম দুর্ঘটনায় হঠাৎ নৌকাডুবি হইয়াছে, তবে এই কথা জিজ্ঞাস্য হওয়া স্বাভাবিক যে, দুর্ঘটনা কি এমন নিয়মিতভাবে ঘটিতে পারে? ঝড় বাদল বা বন্যা নাই, অথচ পরে পরে কয়েকখানা নৌকা আরোহীদের সহিত একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, একজন লোকেরও প্রাণরক্ষা হইল না? এটা কি যার-পর-নাই অস্বাভাবিক নহে?

নদীর কেবল এক নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই নৌকোগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। সাগর দ্বীপের পরে ফ্রেজারগঞ্জ। তাহার পর জামিরা নদী। তাহার পর বুলছড়ি দ্বীপ। তাহার পর মাতলা নদী। জামিরা নদীর জল যেখানে সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকিয়া মাতলা নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানেই কোনও এক জায়গায় গিয়া প্রত্যেক নৌকাই হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে।

পুলিশের লোকেরা তদন্তে গিয়া আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছে।

পুলিশের নৌকা একটা অজানা দ্বীপের নিকটে নোঙর ফেলিয়াছিল। শুক্লপক্ষের শুভ্র রজনি। নৌকার উপরে বসিয়া একজন চৌকিদার পাহারা দিতেছিল।

দ্বীপের উপরে হঠাৎ সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিল। প্রায় তালগাছ সমান উচ্চ ভয়াবহ এক মূর্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে যদিও তাহার মুখ চক্ষু দেখা যাইতেছিল না, তবে সেটা যে কোনও দানব-মনুষ্যমূর্তি, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই।

চৌকিদারের ভীত চিৎকারে নৌকোর অন্যান্য লোক বাহিরে আসে এবং তাহারাও সেই বিরাট মূর্তিকে দেখিতে পায়। সকলে তখন নৌকা লইয়া সভয়ে পলায়ন করে।

যেসব নৌকা অদৃশ্য হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত অমানুষিক মূর্তির কোনও সম্পর্ক আছে কি না, পুলিশ এখন এই কথা লইয়াই মাথা ঘামাইতেছে।

প্রকাশ, শীঘ্রই বৃহৎ এক পুলিশ বাহিনী ওই অজানা দ্বীপের দিকে যাত্রা করিবে।

স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস এই—লঙ্কাদ্বীপের কোনও অজ্ঞাত অংশ হইতে কুম্ভকর্ণের বংশধরগণ সন্তরণ দিয়া সমুদ্র পার হইয়া গঙ্গাসাগরের নিকটস্থ ওই দ্বীপের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অদৃশ্য নৌকাগুলির আরোহীরা গিয়াছে তাহাদেরই বিপুল উদরের মধ্যে।

অবশ্য এরকম কুসংস্কারে আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু ব্যাপারটা যে ভালো করিয়া তদন্ত করা উচিত, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। নহিলে সুন্দরবনের ও-অঞ্চলে নৌকা চলাচল একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।'

বিনয়বাবু তাঁর মাথার কাঁচা-পাকা চুল ক-গাছির ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে একমনে সমস্ত কথা শ্রবণ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'পৃথিবীতে কি আবার পুরাকাল ফিরে এল? এখন দানবের অত্যাচার যেন ক্রমেই বেড়ে উঠেছে! আমরা মৃনুকে উদ্ধার করতে গিয়ে হিমালয়ের যেসব ভয়ঙ্করকে দেখে এসেছি, এতদিন অনেকে তাদের কথা বিশ্বাস করত না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এভারেস্ট অভিযানের লোকেরা হিমালয়ের টঙে যে বিরাট পদচিহ্ন দেখেছিল, সেটা তখন একটা মজার গল্প বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সে গল্প যে সত্যি, আমরা তা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করি। আমাদের চেষ্টা বেশি-বুদ্ধিমানদের কাছে সফল হয়নি। তারপর গেল বছরে যখন খবরের কাগজে বেরুল যে, দার্জিলিংয়ের আরও নীচে আর বাংলা দেশের নানা স্থানে দানবের মতো বৃহৎ মানুষ দেখা গেছে, তখন আমাদের কাহিনির উপরে লোকের শ্রদ্ধা হল। বিমল বলে, হিমালয়ের ভয়ঙ্কররা তাদের দেবী...অর্থাৎ আমাদের মৃনুকে সারা দেশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং একদিন তারা মৃনুকে আবার খুঁজে বার করবেই করবে। গেল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'স্টেটসম্যান' কাগজে দেখেছি, মিঃ সিপটন নামে এক ভদ্রলোক মালয়ের ১৬,০০০ হাজার ফুট উপরে বরফের গায়ে আবার দানবের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বিমলের মত যদি ঠিক হয় তবে কে বলতে পারে, মৃনুকে খুঁজতে খুঁজতে দু-একটা দানব গঙ্গাসাগরের কাছে গিয়ে হাজির হয়নি?'

কমল বললে, 'বিমলবাবু আর কুমারবাবু যে গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি কোনও একটা দ্বীপে দানব-বিড়ালের খোঁজে গিয়েছেন, সে-কথাটাও মনে রাখবেন। দানবদের দেশে গিয়ে আমরা কিন্তু বাঘের মতো কোনও বিড়াল-টিড়াল দেখতে পাইনি। সেখানকার কুকুর দেখেছি, সাধারণ কুকুরের চেয়ে সে বড়ো নয়। গঙ্গাসাগরের কাছে কি তাহলে দানব-জীবদের অজানা কোনও আস্তানা আছে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'কেমন করে তা বলব? তবে এইটুকু জানি যে, বিলাতেও দানব-মানুষের কাহিনি কেবল গালিভারের গল্পে বা ছেলেভুলানো রূপকথায় পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষেরাও তাদের চর্মচক্ষে দেখতে পেয়েছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হচ্ছে 'বেল মাকবুই'। সে পাহাড়টি আছে হাইল্যান্ডারদের দেশে। যখন বরফ পড়ে তখন স্থানীয় লোকেরা কিছুতেই সেই পাহাড়ের উপরে উঠতে রাজি হয় না।

কারণ তারা বলে, বরফ পড়লেই সেখানে 'Lang mon'রা বেড়াতে আসে, তারা সাধারণ মানুষকে সুনজরে দেখে না। 'Lang mon' হচ্ছে 'Long man'-এরই রূপান্তর—অর্থাৎ 'লম্বা মানুষ'। সকলেই এই লম্বা মানুষদের অলীক কল্পনা বলেই মনে করত। কিন্তু কিছুদিন আগে Alpine Club-এর ভূতপূর্ব সভাপতি আর এভারেস্ট অভিযানেরই এক সাহেব স্বচক্ষে একজন লম্বা মানুষকে দেখতে পেয়েছেন। মাথায় সে উঁচু ছিল প্রায় ১২ ফুট। এই দুজন নির্ভরযোগ্য, বিখ্যাত আর শিক্ষিত দর্শকের কথা আজ আর কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না।'

কমল বললে, 'কিন্তু গঙ্গাসাগরের এই দানব-মানুষ নাকি প্রায় তালগাছের সমান উঁচু। হিমালয়ের ভয়ঙ্কররাও এদের চেয়ে ঢের ছোটো ছিল।'

বিনয়বাবু বললেন, 'উঁচু দানবের কথা যখন তুললে তখন আর একটা সত্য কাহিনি বলি শোনো। এরও ঘটনাস্থল হচ্ছে বিলাতে, ডিভনশায়ারে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়ে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারির সকালবেলায় ডিভনশায়ারের অনেকগুলো শহরের বাসিন্দারা সবিস্ময়ে দেখলে যে বরফের উপরে অদ্ভুত সব খুরের চিহ্ন সারিসারি এগিয়ে গেছে। এ ঘোড়া বা গাধা বা অন্য কোনও চতুষ্পদ পশুর খুরের দাগ নয়—এ দাগ হচ্ছে কোনও দু-পেয়ে জীবের। পৃথিবীতে এমন কোনও দু-পেয়ে জীব নেই যার পায়ে খুর আছে। প্রায় একশো মাইল পর্যন্ত চলে গেছে ওই আশ্চর্য পদচিহ্ন। যে সারা রাত ধরে অশ্রান্তভাবে পথ চলেছে এবং এক রাতে যে একশো মাইল পথ চলে, সে কীরকম জীব তা বুঝে দ্যাখো! যেতে যেতে একটা এক মাইল চওড়া নদীও (River Exe) সে অনায়াসে পার হয়ে গেছে—কারণ তার পদচিহ্ন নদীর এপারে জলের ধারে শেষ হয়ে গিয়ে আবার ওপার থেকে আরম্ভ হয়েছে। পথে অনেক ছোটো-বড়ো বাড়ি পড়েছিল, কিন্তু সেই রহস্যময় জীবটা কোনও বাড়ির ভিতরেই ঢোকেনি। অনেক বাড়ির এপাশে শেষ হয়ে গিয়ে ফের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে, তাদের ছাদের উপরে কোনও দাগই নেই—যেন সে অনায়াসেই গোটা বাড়িটাই ডিঙিয়ে চলে গেছে। ...এখন ভাববার চেষ্টা করো, এ কোন জীব? এরকম পদচিহ্ন ডিভনশায়ারে তার আগে বা পরে আর কখনও দেখা যায়নি। তার খুরওয়ালা দু-খানা পা, সে এক মাইল চওড়া নদী পার হয়, অম্লান বদনে এক রাতে একশো মাইল হাঁটে, বাড়ির ছাদে উঠে নেমে যায় বা বিনা কষ্টেই বাড়ি-কে বাড়ি লঙ্ঘন করে অগ্রসর হয়। স্থানীয় লোকেরা ধরে নিলে, গত রাত্রের তুষার বৃষ্টির সময়ে শয়তান ডিভনশায়ারে বেড়াতে এসেছিল—কারণ, প্রচলিত মতে, শয়তানের দুই পায়ে খুর আছে। এই ঘটনার পরে অনেক দিন পর্যন্ত ডিভনশায়ারের বাসিন্দারা সন্ধ্যার আগেই যে যার বাড়ির ভিতরে পালিয়ে এসে ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকত।'

কমল বললে, 'তবু লোকে বলে, পৃথিবীতে এখন আর অসম্ভব ঘটনা ঘটে না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আপাতত ওসব কথা থাক।......কমল, বিমল আর কুমার কি সুন্দরবন থেকে কোনও খবর পাঠিয়েছে? তারা তো এই দানবের খবর পাওয়ার আগেই গঙ্গাসাগরের দিকে গিয়েছে, এর জন্যে প্রস্তুত হয়েও যায়নি, —যদি তারা কোনওরকম বিপদে পড়ে?'

এমন সময়ে একতলা থেকে শোনা গেল, একটা কুকুর পরিচিত গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠল—'ঘেউ, ঘেউ ঘেউ!'

কমল উৎসাহ ভরে লাফিয়ে উঠে বললে, 'ওই বাঘা আমাদের ডাকছে! বাঘা যখন আসছে, তখন ওইসঙ্গে বিমলবাবুদেরও দেখা নিশ্চয় পাওয়া যাবে!'

বলতে বলতে ঘরের দরজাটা দুম করে খুলে গেল এবং বিমল ও কুমারের আগে আগে বাঘা ভিতরে ঢুকে বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের পা দিয়ে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করলে। তারপর কমলকেও সেইভাবে আদর করে বিপুল বেগে পটপট রবে ল্যাজ নাড়াতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'এই যে! তোমরা যে এরই মধ্যে ফিরে এলে?'

বিমল বললে, 'আমরা ফিরে এলুম না বিনয়বাবু, পালিয়ে এলুম!'

—'দানব-মানুষের ভয়ে?'

—'এই যে, আপনিও খবর পেয়েছেন দেখছি! হ্যাঁ, দানবের ভয়েই বটে। কিন্তু পালিয়ে এসেছি, আটঘাট বেঁধে পুনরাক্রমণ করব ল।'

—'আবার তোমরা যাচ্ছ?'

—'নিশ্চয়! কিন্তু এবারে কেবল আমরা দুজনই নই, আপনি যাবেন, কমল যাবে, রামহরি যাবে—এমনকি বাঘাও পড়ে থাকবে না। নিন! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! আমরা প্রস্তুত, আপনারাও দ্বিগুণ উৎসাহে মোটমাট বেঁধে তৈরি হয়ে নিন। আমরা কালকে সকালেই যাত্রা করব।'

বিনয়বাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'তার মানে?'

—'তার মানে, কাল সকালেই আমরা আপনাদের নিয়ে সম্ভবের মুল্লুক থেকে অসম্ভবের দেশে যাত্রা করব। তালগাছের মতো উঁচু মানুষ! হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা! বাঘের মতো মস্ত বিড়াল! পুলিশের লঞ্চ আর বন্দুকধারী সেপাই আমাদের সাহায্য করবার জন্যে এতক্ষণে প্রস্তুত হয়েছে, আমাকে ডানপিটে বলে গালাগাল দিতে দিতে আর রাগে গরগর করতে করতে বুড়ো রামহরি পর্যন্ত সমস্ত তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়েছে, আর আপনারা এখনও অলস হয়ে এখানে বসে আছেন? ছিঃ বিনয়বাবু! ছিঃ কমল!'

বিনয়বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমরা কেমন করে জানব যে—'

বাধা দিয়ে বিমল বললে, 'ব্যাস, ব্যাস, আর কথা নয়! এখন জেনেছেন তো? কাল সকালে আমরা সুন্দরবনে যাত্রা করব, আপনার জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিন। আমাদের হাতে এখনও অনেক কাজ রয়েছে। —চলো কুমার, আয় বাঘা।'

বাঘা বিনয়বাবুর দিকে ফিরে আবার বললে—'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ,' কুকুর-ভাষায় তার অর্থ বোধহয়—'কর্তা, এখন আসি?'

বিমল ও কুমার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বিনয়বাবু হতাশভাবে ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'না, আমার অপঘাত-মৃত্যু না ঘটিয়ে বিমল বোধহয় ছাড়বে না! ওরা এল আর গেল যেন কালবোশেখির মতো,—এখন সামলাও ধাক্কা!'

খিল খিল করে হেসে উঠে কমল বললে, 'আমার কিন্তু ভারী মজা লাগছে!'

বিনয়বাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'তা তো লাগবেই, সব গাধারই যে এক বুলি! কিন্তু আমার বয়স যে পঞ্চাশ পার হয়েছে, আমার কি এসব পোষায়, না শোভা পায়?'

দুষ্টু কমল বললে, 'শাস্ত্রে বলে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেতে। আপনি তো সুন্দরবনেই যাচ্ছেন বিনয়বাবু! যে সে বন নয়, পরমসুন্দর বন!'

বিনয়বাবু আরও রেগে বললেন, 'থামো, থামো! আর জ্যাঠামি করতে হবে না!'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

অমানুষিক কণ্ঠস্বর

আবার সেই সুন্দরবন। নির্জন বনভূমির মধ্যে আবার সেই নদীর 'জলতরঙ্গ' বাজনা। সে-যেন নিস্তব্ধতার বীণায় কার মূর্ছা ভাঙাবার অশ্রান্ত সুর।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ আজ দেরি করে মুখ দেখাবে। জ্যোৎস্নার যে কুহক স্বপ্ন নিয়ে বিমল ও কুমার গেলবারে ফিরে গিয়েছিল, এবার তারা সেই মাধুর্যের অভাব অনুভব করতে লাগল অত্যন্ত। আকাশে একটিমাত্র চাঁদকে দেখা না গেলে বনবাসী রাত্রির চেহারা যে কীরকম বদলে যায়, যারা তা দেখেনি তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। আকাশে কোটি কোটি তারকার নির্নিমেষ নেত্রে যেটুকু আলোর বোবা ভাষা ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে কিছুমাত্র সান্ত্বনার আভাস নেই। বাতাসে বাতাসে কী যেন একটা বুকচাপা স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে। কে যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে গিয়ে আতঙ্কে কাঁদতে পারছে না! অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! পায়ের তলা থেকে নদী সাড়া দিচ্ছে, দু-পাশ থেকে বিরাট অরণ্যের শিউরে ওঠা মর্মর আর্ত রব শোনা যাচ্ছে এবং তার জঠর থেকে ভেসে ভেসে আসছে লক্ষ লক্ষ নিশাচর জীবের জীবনযুদ্ধের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। কারুকেই দেখবার জো নেই, কেবল শব্দ—কেবল শব্দ। অন্ধকারের বিভীষিকা সমস্ত ধ্বনিপ্রতিধ্বনিকে করে তুলেছে ভয়াবহ। যে-দেশে তারা সবাই আজ যাত্রা করেছে, পথের এই অন্ধকারময় বিভীষিকা তারই স্বরূপের আভাস দেবার চেষ্টা করছে।

গভীর আঁধার সাগরে যেন ভেসে চলেছে দুটি ছোটো-বড়ো আলোক দ্বীপ—বিমলদের মোটরবোট ও পুলিশের ইস্টিমার।

বোটের কামরার ভিতরে বসে রামহরি ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দিচ্ছে এবং এখনও আহারের যথেষ্ট বিলম্ব দেখে বাঘা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত উজ্জ্বল পেট্রলের লণ্ঠনের আলোকে কমল একখানা গল্পের বই পড়ছে এবং বিনয়বাবু, বিমল ও কুমার কথাবার্তা কইছে।

বিমল বলছিল, 'না বিনয়বাবু, এই দ্বীপে হিমালয়ের সেই ভয়ঙ্কর দানবেরা এসে যে আস্তনা গেড়েছে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। হিমালয়ের ভয়ঙ্করদের কাহিনি যে আমাদের

কল্পনার দুঃস্বপ্ন নয়, বাংলা দেশে এখন এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে বলে আমি খুবই খুশি হয়েছি; কিন্তু সেদিন দ্বীপের উপরে যে দানবমূর্তির আভাসমাত্র দেখেছি, হিমালয়ের ভয়ঙ্কররাও হাত বাড়িয়ে তার মাথার নাগাল পাবে বলে মনে হয় না! সে এক নতুন আর অসম্ভব দানব!'

বিনয়বাবু বললেন, 'তুমি আভাসমাত্র দেখেছ। তোমার চোখের ভ্রম হতেও তো পারে?'

—'আমাদের চোখের ভ্রম যদি হয়ে থাকে, তাহলেই মঙ্গলের কথা, কারণ ওই দ্বীপে অমন সৃষ্টিছাড়া দানব যদি আরও গোটাকয়েক থাকে, তাহলে এই যাত্রাই আমাদের শেষ যাত্রা হতেও পারে!'

রামহরি প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল, 'খোকাবাবু, এই বুড়ো বয়সে ভূতুড়ে রাক্ষসের খোরাক হবার জন্যেই কি তোমরা আমাকে ধরে আনলে?'

কুমার হেসে ফেলে বললে, 'ভয় কী রামহরি, গঙ্গাসাগরে মরলে রাক্ষসের পেটের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে তুমি সোজাসুজি স্বর্গে গিয়ে হাজির হতে পারবে। সকলে তখন মহা পুণ্যবান বলে তোমাকে হিংসা করবে!'

রামহরি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললে, 'থামো থামো, আর কথার ফোড়ন দিতে হবে না, ঢের হয়েছে! রাক্ষসের পেটেই যদি হজম হই, তাহলে স্বর্গে যাবে কে?'

কুমার বললে, 'এইবারে রামহরি তুমি নিরেট বোকার মতো কথা কইলে। রাক্ষসের ভুঁড়ি বড়ো জোর তোমার দেহকেই হজম করতে পারে, কিন্তু তোমার আত্মাকে হজম করে এমন সাধ্য কার আছে? মানুষের দেহ তো স্বর্গে যায় না, স্বর্গে যায় তার আত্মাই!'

রামহরি বললে, 'অমন স্বর্গে যাওয়ার পায়ে আমি গড় করি,—অমন করে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না!'

কমল বই থেকে মুখ তুলে বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি ভাবছেন বিমলবাবুদের চোখের ভ্রম হয়েছে। কিন্তু আপনি খবরের কাগজের রিপোর্ট ভুলে যাচ্ছেন কেন? তাতেও তো এখানকার একটা দ্বীপে তালগাছ সমান উঁচু এক দানবের কথা আছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কী জানি বাপু, এখানকার ব্যাপারটা আমার মনে কেবল একটা অমঙ্গলের ভাব জাগিয়ে তুলছে! মনে হচ্ছে এদিকে না আসাই যেন উচিত ছিল!'

কুমার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললে, 'এতক্ষণে চাঁদ উঠল। কিন্তু চাঁদের আর জেল্লা নেই।'

বিনয়বাবু একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নেই বা রইল জেল্লা! চাঁদ যে উঠেছে, এই অন্ধ করা অন্ধকারে সেইটেই হচ্ছে বড়ো কথা। এতক্ষণ আমার তো মনে হচ্ছিল চাঁদের বুঝি মৃত্যু হয়েছে, আলো আর ফুটবে না!'

কমল বললে, 'কিন্তু ও চাঁদ যেন অন্ধকারকেই ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছে! গাছের তলায় পড়ন্ত ছায়াগুলোকে দেখে সন্দেহ হয়, ওরা যেন বিরাট-দেহ প্রেতমূর্তি, আমাদের ঘাড় ভাঙতে পারলে আর ছেড়ে কথা কইবে না!'

রামহরি কাজ করতে করতে মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে বনজঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সন্দেহ আবার কী, সত্যি কথাই! নিশ্চয় ওখানে ভূত-প্রেত আছে!'

বিমল বললে, 'পৃথিবীর শৈশবে আদিম মানুষরা গিরিগুহার ভিতর থেকে বাইরের আলো-আঁধারিতে চোখের ভ্রমে অমনি সব কত বিভীষিকাই দেখতে পেত। সেই সময় থেকেই ভূত-প্রেতের মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি। সে-ভয় আজও আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পণ্ডিত হয়েও মানুষ তাই তাকে আর ভুলতে পারে না!'

হঠাৎ বাঘা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে কানদুটো খাড়া করে কী শুনতে লাগল।

বিমলও বাইরের দিকে তাকালে। বোট তীরের একদিক ঘেঁসে যাচ্ছিল—দেখা গেল কেবল খানিক কালো আর খানিক আলো মাখা গাছপালা। সেখানে কোনও জীবজন্তুর সাড়া পর্যন্ত নেই।

আচম্বিতে শোনা গেল—

'ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘট ঘট!
ঘণ্টা বাজে যমালয়ে, কে যাবি আয় চটপট!'

কুমারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল এবং বাঘাও বোটের ধারে গিয়ে জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করতে লাগল।

বিমল লাফিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় হু হু করে জলস্রোত ছুটে চলেছে, তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

রামহরি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'কোথাও জনপ্রাণী নেই, তবে এমন হেঁড়ে গলার ভয়ানক চেঁচিয়ে কে কথা কইলে খোকাবাবু?'

সত্য-সত্যই সে এমন উচ্চ কণ্ঠস্বর যে, পিছনের ইস্টিমারে পুলিশের লোকেরাও তা শুনতে পেয়েছিল, ইস্টিমারের 'সার্চলাইট' তখনই নদীর বুকের উপরে তীব্রোজ্জ্বল আলোক-সেতুর মতন গিয়ে পড়ল, তারপর সে অরণ্যের বক্ষ ভেদ করেও খুঁজে দেখলে, কিন্তু কোথাও জ্যান্ত কোনও কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

বিনয়বাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'এ কী ব্যাপার, কুমার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

কুমার বললে, 'এ কণ্ঠস্বর গেলবারেও আমরা দ্বীপের কাছে এসে শুনেছি। কিন্তু কে যে কথা কয়, কিছুতেই দেখতে পাইনি!'

কমল বললে, 'মানুষের কথা শুনলুম বটে, কিন্তু এমন বিকট স্বরে কোনও মানুষ কি কথা কইতে পারে?'

বিমল বললে, 'দ্বীপটা এখনও মাইল দশ-বারো দূরে আছে বোধহয়। কিন্তু গেলবারে কেউ তো দ্বীপ থেকে এত দূরে এসে এমন স্বরে কথা কয়নি!'

কুমার বললে, 'তাহলে আমরা যে আবার আসছি, এর মধ্যেই কি দ্বীপে সে খবর পৌঁছে গেছে?'

বিমল জবাব দেবার আগেই অনেক দূর থেকে আবার সেই উৎকট ভৈরব আওয়াজ জেগে উঠল—

'ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘট ঘট!'

বিমল বললে, 'এ ভালো লক্ষণ নয়। শব্দটা দ্বীপের দিকেই চলে যাচ্ছে।'

রামহরি বলে উঠল, 'রাম রাম রাম রাম! অনেক ভুতের কথা শুনেছি, কিন্তু শব্দ-ভুতের কথা তো কখনও শুনিনি!'

বিমল বললে, 'কুমার, বাঘার গলায় শিকল দাও! ও পাগলের মতো হয়ে উঠেছে—জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ওর পশু-চোখ বোধহয় জলের ভিতরেই কোনও বিপদকে আবিষ্কার করেছে!'

বিমল টর্চ নিয়ে আবার নদীর ভিতরটা দেখতে লাগল—ঝাপসা চাঁদের আলো আর আবছায়া নিয়ে লোফালুফি করতে করতে ও পাক খেতে খেতে প্রবল জলের স্রোত ছুটছে এবং চিৎকার করে যেন নিকটস্থ সমুদ্রকে ডাকের পর ডাক দিচ্ছে। জলচর কুমির ও হাঙর ছাড়া সেখানে কোনও মানুষের পক্ষে এতক্ষণ ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব।

ইস্টিমার থেকে 'মেগাফোনে' মুখ দিয়ে ইনস্পেকটার জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে কোনও লোক ভয়ানক চেঁচিয়ে কথা কয়েছে। আপনারা কেউ দেখতে পেয়েছেন?'

বিমল বললে, 'না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, আমার মতে আজ রাতে দ্বীপের কাছে না যাওয়াই ভালো, আজ এইখানেই নোঙর ফেলে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক, কাল সকালে আলোয় আলোয় দ্বীপের কাছে গিয়ে হাজির হব।'

বিমল বললে, 'আমারও সেই মত।'

পরদিন পূর্ব আকাশে প্রভাত এসে যখন রঙিন আলোর লাইন টানছিল, বিনয়বাবু তখন বোটের ভিতর থেকে বাইরে এসে বসলেন।

কাল সারারাত তাঁর অশান্তিতে কেটেছে, একবারও ঘুম আসেনি, কারণ জলধারার একটানা ঐকতানের মাঝে মাঝে সেই অমানুষিক মানুষের চিৎকার আরও কয়েকবার জেগে উঠেছে—অনেক দূর থেকে।

কার এই কণ্ঠস্বর? এ যদি কোনও দানবের কণ্ঠস্বর হয় তাহলে কোথায় সে? দানবের আকার যদি আশ্চর্যরকম প্রকাণ্ড হয় তবে তাকে তো আরও সহজেই দেখতে পাবার কথা! আর, এই গভীর নদীর গর্ভে কোনও নরদেহী দানবের এতক্ষণ ধরে থাকবার ঠাঁই-ই বা কোথায়?

এইসব উত্তরহীন প্রশ্ন নিয়েই বিনয়বাবুর রাত কেটে গেছে, এখন ভোরের আলো দেখে বাইরে এসে বসে তিনি অনেকটা আরাম বোধ করলেন। রামহরি তাঁর আগেই উঠে তখন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছে—'স্টোভে' চায়ের জল গরম হচ্ছে এবং আর একটা 'স্টোভ' জ্বালিয়ে 'অমলেট' ভাজবার উদ্যোগ চলছে। রামহরি সকলকে রেঁধে খাওয়াতে ভারী ভালোবাসত, বিষম সব বিপদ-আপদের মাঝখানেও এ বিভাগের কর্তব্য পালনের জন্যে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করত। তাই পৃথিবীর ভিতরে ও বাইরে অনেক সৃষ্টিছাড়া দেশে গিয়েও বিমল ও কুমার প্রভৃতিকে কখনও কোনও কষ্ট-বোধ করতে হয়নি।

রাত্রের বিভীষিকা রোদের সোনার জলের ধারায় কুয়াশার মতোই ধুয়ে মুছে গিয়েছে, নদীর কলধ্বনি শুনে মনে হচ্ছে যেন ছোটো শিশুর খুশিভরা হাসির শব্দ। দূরে বনে বনে

গায়ক পাখির দলও জেগে উঠে চারিদিক সরগরম করে তুলেছে এবং বাতাসের উচ্ছ্বাসে ভেসে আসছে যেন কোনও চন্দনস্নিগ্ধ পুলকস্পর্শ।

বিমল, কুমার ও কমল বাইরে এসে বসতে না বসতেই রামহরি সকলের সামনে চায়ের পিয়ালা এবং 'প্লেটে' করে গরম 'টোস্ট' ও 'অমলেট' সাজিয়ে দিয়ে গেল।

বাঘাও যথাসময়ে অত্যন্ত সভ্য-ভব্যের মতো সকলের মাঝখানে এসে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রামহরির গতিবিধি লক্ষ করছিল। তার জন্যেও এল কতকগুলো কুকুর-বিস্কুট।

বিমল আগে বোট ও ইস্টিমার চালাবার হুকুম দিলে, তারপর এক 'স্লাইস' রুটি তুলে নিয়ে বললে, 'বিনয়বাবু, আর ঘণ্টা দুয়েক পরেই আমরা সেই দ্বীপের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারব।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তারপর?'

—'তারপর আমরা একেবারে তীরে গিয়ে নামব।'

—'যদি কেউ বাধা দেয়?'

—'ইস্টিমারে মিলিটারি পুলিশ আছে—এমনকি একটা 'মেশিনগান'ও আছে। যদি সত্যই সেখানে কোনও বিপজ্জনক অতিকায় বিড়াল, কুকুর, বাঘ ও দানব থাকে, তাহলে তাদের মেজাজ ঠান্ডা করবার জন্যে আমরা কোনও আয়োজনেই ত্রুটি করিনি।'

—'কিন্তু এইসব অদ্ভুত জীবের সঙ্গে সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধের সম্পর্ক কী, সেটা তো আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না! লোকালয়ের বাইরে এমন বিজন জায়গায় নির্বাসিতের মতো বসে দানব-জীবদের নিয়ে তিনি কী করেন? দানবের ভয় তার যখন নেই তখন এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে, দানবরাও তাঁর উপরে কোনও অত্যাচার করে না।'

কুমার বললে, 'আরও একটা মস্ত জানবার কথা হচ্ছে, সামান্য এক তুচ্ছ অজানা দ্বীপের বিড়াল আর কুকুর কেমন করে বাঘ আর হাতির মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠল?'

বিনয়বাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু, এসব কি সত্যি?'

বিমল বললে, 'কুকুরটাকে আমি দেখিনি বটে, কিন্তু বাঘের মতো বড়ো একটা বিড়ালকে আমি নিজেই যে গুলি করে মেরেছি সে কথা তো আপনি শুনেছেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার! আর তার চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে এই যে, যেখানেই আশ্চর্য ব্যাপার, সেখানেই তোমরা? আমাদের এই নিত্য দেখা একঘেয়ে পৃথিবীটাকে তোমরা ক্রমেই অসাধারণ আর বিচিত্র করে তুলছ!'

বোট ও ইস্টিমার তখন ছুটে চলেছে পুরোদমে—কেবল একদিকেই নদীর বনশ্যামল তটরেখা দেখা যাচ্ছে, অন্য তীর হারিয়ে গেছে প্রায় অসীমতার মধ্যেই।

হঠাৎ কুমার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'দূরে ওই সেই দ্বীপ দেখা যাচ্ছে!'

আর সকলেও সাগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠল। দূরে একটা গাছপালা ভরা ভূমি জেগে উঠেছে বটে।

বিমল খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'হ্যাঁ, কুমারের চোখ ঠিক দেখেছে।'

ধীরে ধীরে দ্বীপটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বাহির থেকে সে দ্বীপের মধ্যে কোনও নতুনত্বই আবিষ্কার করা গেল না—প্রবল হাওয়ায় গাছাপালা দুলছে এবং নদীর

জলে ঝিলমিল করছে তাদের ছায়া। কালকের রাতের সেই অমানুষিক কণ্ঠস্বর আজ আর কারুকে ভয়াবহ অভ্যর্থনা করলে না এবং বনজঙ্গলের উপরে তালগাছ সমান উঁচু দেহ নিয়ে কোনও বিরাট দানবও আবির্ভূত হল না।

বিনয়বাবু একটা দূরবিনের সাহায্যে দ্বীপটা পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তিনি চমকে উঠে দূরবীক্ষণটা বিমলের হাতে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'দ্যাখো বিমল, দ্যাখো!'

দূরবিনটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে বিমল দেখলে, দ্বীপের একটা উঁচু জমির উপরে একটি লোক পাথরে তৈরি মূর্তির মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন সে ইস্টিমারের দিকেই তাকিয়ে আছে নিষ্পলক নেত্রে। আজকেও তার ধবধবে সাদা লম্বা চুল, দাড়ি ও গায়ের জামাকাপড় লট পট করে হু হু বাতাসে উড়ছে।

দূরবিনটা নামিয়ে বিমল বললে, 'ওই সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধ! এখানে যত রহস্যের সৃষ্টি বোধহয় ওই লোকটির জন্যেই! ......যাক, সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতে আর বেশি বিলম্ব নেই!'

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

উড়ো বোট

দ্বীপ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

গেলবারে রাত-আঁধারে আর নানারকম অস্বাভাবিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বিভীষিকার জন্যে এই অজানা দ্বীপটাকে যেমন রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল, আজ তাকে দেখে বিমল ও কুমারের মনে তেমন কোনও ভাবেরই উদয় হল না।

নীল আকাশের ছায়া দোলানো, নদীর গান জাগানো চপল জলের কোলে আজ এই সূর্যকরের আলো-আদর মাখা সবুজ সুন্দর দ্বীপটিকে মনে হতে লাগল ঠিক যেন কোনও ভোরের স্বপ্নে দেখা পরিস্থানের মতো।

গায়ক-পাখিরা গাছের এ ডালে বসে খানিক নেচে আবার ও ডালে উড়ে গিয়ে বসে নাচে গানে মেতে উঠছে, ছবিতে আঁকা শকুন্তলার তপোবনের হরিণের মতো দুটি ছোটো ছোটো হরিণ এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে একান্ত নির্ভয়ে এবং দ্বীপের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দলে দলে বকেরা আকাশের দোলন্ত বেলের গোড়ের মতো।

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কী চমৎকার দ্বীপটা! যেন মুনি-ঋষির সাধনকুঞ্জ! এখানে ভয়ানক কিছু দেখবার আশাই করা যায় না!'

বিমল বললে, 'দিনের আলো বড়ো কপট, ভয়াবহকে অনেক সময়ে সুন্দর করে দেখায়।'

কুমার বললে, 'বাইরের খোলস অনেক সময়ে চোখে ধাঁধা দেয়। সুন্দর মৌমাছিকে দেখলে কে বলবে যে তার ভিতরে বিষাক্ত হুল আছে!'

এমন সময়ে ইস্টিমার থেকে 'মেগাফোনে', ইনস্পেকটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল— 'ইস্টিমার আর এগুতে পারবে না, এখানে জল বেশি নেই।'

বিমল চেঁচিয়ে বললে, 'বেশ, আর এগিয়ে যাবার দরকার নেই, এইখানেই নোঙর ফেলা যাক।'

দ্বীপ সেখান থেকে একশো হাতের ভিতরেই।

কমল বললে, 'ওই ভদ্রলোক কিন্তু এখনও সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন!'

কুমার বললে, 'বোধহয় আমরা কী করি তাই দেখছেন।'

বিমল বললে, 'কিংবা কী করে আমাদের তাড়ানো যায় তাই ভাবছেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু ওকে দেখলে তো আমার চেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হয় না!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, দিনের বেলায় উনি এই দ্বীপের মতোই নিরীহ। কিন্তু রাত্রে বিপরীত মূর্তি ধারণ করেন। ......এইবার দ্বীপে নামবার ব্যবস্থা করা যাক, কী বলেন? ইস্টিমারের সঙ্গে দু-খানা বোট আছে, তাতে সিপাইরা আর ইনস্পেকটার থাকবেন। আমরা মোটরবোটেই যাব।'

...সবাই যখন দ্বীপের উপরে গিয়ে উঠল, দুপুরের রোদ তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল—অধিকাংশ ঝোপঝাপের ভিতরে পর্যন্ত নজর চলে।

দ্বীপের মধ্যে কোনওরকম নতুনত্ব নেই—চারিদিকে গাছপালা জঙ্গল ঝোপঝাপ, মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা পথ, মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো মাঠ।

বিমল বললে, 'ইনস্পেকটারবাবু, আপনার সেপাইদের বন্দুক তৈরি রাখতে বলুন।'

ইনস্পেকটারবাবু হেসে বললেন, 'যত সব গাঁজাখোরের কথা শুনে আমরা এসেছি বটে, কিন্তু এখানে তো ভয় পাবার কিছুই দেখছি না। কোথায় মশাই আপনাদের কুম্ভকর্ণ? এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি?'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'হতে পারে। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা তার টিকিটিও আবিষ্কার করতে পারব না।'

—'তাহলে এখানে এত তোড়জোড় করে এসে কী লাভ হল?'

—'আমরা এসেছি জনরব সত্য কি না জানবার জন্যে। জনরব যদি মিথ্যে হয়, তবে ফিরে গিয়ে সেই রিপোর্টই দেবেন।'

'জনরব কী মশাই? কুম্ভকর্ণকে তো আপনারাও দেখেছেন বললেন। তারপর হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা, বাঘের মতো বড়ো বিড়াল, কত আজগুবি গল্পই যে শুনলুম!'

—'কাল রাতে নদীর মাঝখানে যে অমানুষিক কণ্ঠস্বর আপনারা শুনেছেন সেটাও তো আমাদের বানানো নয়?'

ইনস্পেকটার একটু যেন শিউরে উঠলেন এবং আর কোনও কথা বললেন না।

যে-পথ ধরে সবাই চলেছে, হঠাৎ তার মোড় ফিরেই দেখা গেল, সামনের একখানা বাংলোর মতো ছোটো একতলা মেটে বাড়ি, উপরে পাতার ছাউনি।

বারান্দায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বুড়ো ভদ্রলোক।

সকলে যখন বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, বুড়ো ভদ্রলোকটি দুই পা এগিয়ে এলেন। একবার সকলের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শান্ত হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'এত সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে আপনারা কোন রাজ্য জয় করতে যাচ্ছেন?'

বিমল এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আমরা দিগ্বিজয়ে বেরুইনি। খালি এই দ্বীপটা খুঁজতে এসেছি।'

—'কেন?'

—'এখানে এমন কিছু দেখেছি যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।'

—'বলেন কী মশাই? আমি এখানে বাস করি, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই তো দেখিনি!'

এমন সময়ে ইনস্পেকটার তাঁর সমুখে গিয়ে বললেন, 'আপনার নাম কী?'

—'ধরণীকুমার মজুমদার।'

—'এই নির্জন দ্বীপে আপনি কী করেন?'

—'আমি সন্ন্যাসী নই বটে, কিন্তু সংসার ত্যাগ করেছি। এখানে বসে পরকালের চিন্তা করি।'

—'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

—'একজন পুরানো চাকর।'

—'কোথায় সে?'

ধরণী মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'হরিদাস!'

ঘরের ভিতর থেকে আর একটি অতিশয় নিরীহের মতো দেখতে প্রাচীন লোক বেরিয়ে এল।

ইনস্পেকটার তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বললেন, 'ধরণীবাবু, আপনার বাড়ির ভিতরটা আমরা একবার দেখব।'

—'স্বচ্ছন্দে।'

কিন্তু সেখানেও নতুন কিছু আবিষ্কার করা গেল না। আসবাবপত্তর খুবই কম।

বিমল শুধোলে, 'আপনার একখানা মোটরবোট আছে না?'

ধরণী বললেন, 'আছে। দেখতে চান তো ওইদিকে নদীর ধারে গেলেই দেখতে পারেন।'

বিমল বললে, 'না। আজ অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। কাল আমরা সারা দ্বীপটা একবার ভালো করে ঘুরে দেখব, আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?'

—'নিশ্চয়ই করব! কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখছি, এখানে বনজঙ্গল ছাড়া দেখবার কিছুই নেই।'

বিমল তাঁর কাছে গিয়ে খুব চুপিচুপি শুধোলে, 'বনজঙ্গলের ভিতরে গিয়ে দু-একটা হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা আর বাঘের মতো বড়ো বেড়ালও খুঁজে পাওয়া যাবে না?'

ধরণী যেন কিছুতেই বুঝতে না পেরে বিমলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

—'আর তালগাছ সমান উঁচু মানুষ?'

—'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?' বলেই ধরণী হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। সে অট্টহাস্য বিমল ও কুমার আগেই শুনেছিল—গেলবারে দ্বীপের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সময়ে।

কমল সেদিন রামহরিকে ধরে বসেছিল, তাকে একটা নতুন রান্না খাওয়াতে হবে!

রামহরি যত বলে, 'সুমুদ্দুরের জলে ডোঙায় বসে কি নতুন রান্না খাওয়ানো চলে ভাই?'

—কমল ততই বলে, 'পাকা রাঁধিয়ে আকাশে উড়েও হাতের বাহাদুরি দেখাতে পারে! রামহরি, তুমি তাহলে কোনও কর্মের নও!'

তার রন্ধন নিপুণতার উপরে কেউ কৌতুক ছলে ঠাট্টা করলেও রামহরি সহ্য করতে পারত না। অতএব সবাই যখন গিয়েছিল দ্বীপে বেড়াতে, রামহরি তখন ছিল নৌকোয় বসে মাছ ধরতে ব্যস্ত।

এবং আজ রাত্রে সে যে নতুন রান্না করল ও আর সবাইকে খাওয়ালে, তার নাম রেখেছিল 'মুখবন্ধ'।

রান্নাটি কমলের এতই ভালো লেগেছিল যে মনের ভাব আর প্রয়োগ করতে পারলে না।

বিনয়বাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মস্ত এক বক্তৃতা দিয়ে শেষটা বললেন, 'এটা কোন দেশি রান্না বিমল?'

বিমল বললে, 'তা আমি জানি না। তবে লিখিত মতে একে 'মাছের রোস্ট' বলেও ডাকা যায়।'

আহারাদির পর যখন শয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন কুমার বললে, 'দ্বীপটা স্বচক্ষে দেখে আমি কিন্তু হতাশ হয়েছি। মনে হচ্ছে আমাদের খালি গাদা ঘেঁটে মরাই সার হল!'

বিমল বললে, 'আমি কিন্তু এখনও হতাশ হইনি। আমি কালকের জন্যে অপেক্ষা করছি। হয়তো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারব।'

বিনয়বাবু সারাদিন দ্বীপের কথা নিয়ে কোনও মত প্রকাশ করেননি। এখন তিনি হঠাৎ সবাইকে বিস্মিত করে বললেন, 'দ্বীপে গিয়ে আমি কিন্তু একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছি।'

কুমার বললে, 'আপনি! কী আবিষ্কার?'

—'ধরণীবাবুর বাংলোর পিছনে আছে একটা জলাভূমির মতো জায়গা। সেখানে ভিজে মাটির উপরে আমি এমন কতকগুলো পায়ের দাগ দেখেছি, যা মানুষের পায়ের দাগের মতোই, কিন্তু মানুষের পায়ের দাগের চেয়ে বারো-তেরো গুণ বেশি বড়ো।'

কমল সবিস্ময়ে বললে, 'কিন্তু আপনি এতক্ষণ তো এ কথা বলেননি!'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'বিনয়বাবু বলেননি, আমিও বলিনি। সে-পায়ের দাগগুলো আমিও দেখেছি।' —বলেই সে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং বিনয়বাবুও তার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করলেন।

কুমার ও কমল একবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারপর যে-যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময়েই সকলকার কানে অদ্ভুত স্বর জেগে উঠল :

'ঘোঁ ঘট ঘট,
ঘোঁ ঘট ঘট!
ঘোঁ ঘট ঘট,

চল রে চল,
চট পট চল
দি চম্পট!'

সকলেই সচমকে ধড়মড় করে আবার উঠে বসল। গতকল্য গভীর রাত্রে নদীর বক্ষে এই অমানুষিক কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল।

সকলেই বোটের ধারে ঝুঁকে পড়ে মুখ বাড়ালে। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, কিছুই দেখা গেল না এবং কিছুই দেখবার উপায় নেই।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, আমরা মঙ্গলগ্রহেও গিয়েছি, কিন্তু সেখানেও এমন আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শুনিনি!'

বিমল টর্চের কল টিপে আলো জ্বেলে বললে, 'নদীর জল এক জায়গায় খুব তোলপাড় হচ্ছে,—যেন কেউ ওখানে বিরাট দেহ নিয়ে সবে ডুবে দিয়েছে। কিন্তু আর কিছুই দেখা যায় না।'

এমন সময়ে খানিক তফাতে উপর থেকে আবার অন্য একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

'কিচির-মিচির কিচির-মিচির
কচ মচ মচ কচ মচ মচ!
বুকের কাছে করছে কেমন
খচ মচ খচ খচ মচ মচ!
মানুষ-ভূতে কালকে পাবে,
কলকাতা কি শালকে যাবে,
কাটবে মগজ চালিয়ে ছুরি
কচু কাটা কচ কচ কচ!'

টর্চের আলো শূন্যের অন্ধকার ফুঁড়ে খুঁজে পেলে খালি শূন্যতাই।

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'বিংশ শতাব্দীতেও তাহলে দৈববাণী হয়?'

কুমার একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, 'কিন্তু এ দৈববাণীর জন্ম বোধহয় গাছগুলোর ভিতরে থেকেই।'

সকলে দেখলে, নদীর জলের উপরে ঘন শাখাপল্লব নিয়ে একটা মস্তবড়ো গাছ ঝুঁকে পড়েছে এবং তারই ডালপালাগুলো সশব্দে দুলে দুলে উঠছে—যেন তার ভিতরে কোনও জীব লুকিয়ে এদিকে-ওদিকে আনাগোনা করছে।

রামহরি বন্দুক নিয়ে বললে, 'খোকাবাবু, আন্দাজে আন্দাজে একটা গুলি ছুড়ব নাকি?'

বিমল বললে, 'না রামহরি, কেউ তো এখনও আমাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেনি! আমরাই বা আগে থাকতে অস্ত্র ব্যবহার করব কেন?'

এমন সময়েই ইস্টিমারের 'সার্চলাইট' অন্ধকারের উপর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলের তোলপাড় শব্দ এবং গাছের ডালপালার মড়মড়ানি একেবারে থেমে গেল।

কুমার বললে, 'এখানে যেসব কবি কবিতা শোনায়, তারা সশরীরে দেখা দিতে রাজি নয় দেখছি!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু কে ওরা? আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, না সাবধান করে দিচ্ছে?'

ইস্টিমার থেকে চেঁচিয়ে ইনস্পেকটার বললেন, 'এসব কী কাণ্ড মশাই!'

বিমল বললে, 'যা শুনছেন আর দেখছেন, তা কি গাঁজাখোরের কল্পনা বলে মনে হচ্ছে?'

—'কিন্তু কেউ বোধহয় ভয় দেখাবার জন্যে আমাদের ঠাট্টা করছে! এটা তো আর সত্যযুগ নয় যে, জল আর গাছ কথা কইবে!'

—'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঠাট্টা করছে কে?'

—'নিশ্চয় সেই বুড়ো জাদুকরটা! আমি কালই ধরণীকে গ্রেপ্তার করব!'

—'কী অপরাধে? সে তো এখনও আমাদের কোনও অনিষ্ট করেনি!'

—'সরকারি লোকেদের ভয় দেখানোর মজাটা তাকে টের পাইয়ে দেব!'

দ্বীপের ভিতর থেকে হা হা হা হা করে কে ভীষণ অট্টহাসি হেসে উঠল। এ সেই হাসি,—যে হাসি সবাই আজই ধরণীর কণ্ঠে শুনে এসেছে, কিন্তু এখন তার চেয়ে ঢের বেশি তীব্র ও ভীতিপ্রদ।

ইনস্পেকটার খাপ্পা হয়ে বললেন, 'সেপাই, সেপাই! সবাই বন্দুক নাও! বোট ভাসাও! আজই আমি বুড়োকে গ্রেপ্তার করব!'

বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, আজ আর গোলমালে কাজ নেই। আজ খালি দেখুন, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। নইলে সব পণ্ড হবে।'

অট্টাহাসি থামল না,—কিন্তু ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'ধরণী পাগল নয় তো?'

অনেক দূর থেকে যথাক্রমে নদীর জলে ও গাছের উপরে উঠছে সেই আশ্চর্য ঘোঁ ঘট ঘট ও কিচির-মিচির শব্দ।

কুমার বললে, 'ওই হাসি আর শব্দ দুটো যখন একসঙ্গে হচ্ছে, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে তিনটে আলাদা আলাদা জীব আছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে এই তৃতীয় জীবটি কে? দ্বীপে গিয়ে আমরা তো কেবল ধরণী আর তার চাকর হরিদাসের দেখা পেয়েছি।'

বিমল ভাবতে ভাবতে বললে, 'কুমার তুমি ঠিক ধরেছ। হ্যাঁ বিনয়বাবু, এই তৃতীয় জীবটি কে, এখন সেইটেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।'

ক্রমে সমস্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেল, নির্জনতা সজাগ হয়ে উঠল এবং রাত্রির অন্ধ স্তব্ধতাকে সংগীতময় করে তুলতে লাগল সাগরসঙ্গমে উচ্ছ্বসিত নদীর কলধ্বনি। ...সে অশ্রান্ত ধ্বনি যেন সুদূর অসীমের স্মৃতিকে কানের কাছে ডেকে আনে। সে-ধ্বনি যেন নিকটের যা-কিছুকে সুদূর অসীমতায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

বিমল বাঘাকে বোটের বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে, 'যা বাঘা, বাইরে যা। আমরা এখন একটু ঘুমোব, তুই পাহারা দে।'

বাঘা যেন বিমলের কথা বুঝতে পারলে। সে বোটের ধারে গিয়ে কান খাড়া করে বসে রইল।

বোটের তলায় নদীর করাঘাতের শব্দ শুনতে শুনতে সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়ল।

এমনকি শেষটা বাঘার চোখেও ঢুল এল।

গভীরা নিশীথিনীর কালো শাড়ির আঁচল সরিয়ে বেরিয়ে এল যেন রুগ্ন চাঁদের অত্যন্ত হলদে মুখ। তাকে এই বিজনতার মধ্যে দেখলে ভয় হয়, চিতার পাশে খাটে শোয়ানো মড়ার মুখ মনে পড়ে যায়।...

আচম্বিতে বাঘা ভয়ানক জোরে চেঁচিয়ে উঠল এবং কমল জেগে ধড়মড় করে উঠে বসল।

কমলের মনে হল, সে বোটের ভিতরে আছে বটে, কিন্তু বোট যেন আর নদী গর্ভে নেই! কী অদ্ভুত অনুভূতি!

হঠাৎ বাঘা ভয় পেয়ে বোটের উপর থেকে লাফ মারলে। অনেক উঁচু থেকে জলে লাফিয়ে পড়লে যে-রকম শব্দ হয়, সেই রকম একটা শব্দ হল।

ইতিমধ্যে আর সকলেও জেগে উঠল। তাদেরও মনে হল তারাও যেন কারুর মাথার উপরে ঝাঁকার ভিতরে মোরগের পালের মতো বসে রয়েছে।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে মুখ বাড়িয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে বিস্মিত চোখে দেখলে, তারা দ্বীপের গাছের সারের চেয়েও আরও উপরে উঠেছে এবং অনেক নীচে আলো-আঁধারির মধ্যে চিক চিক করছে নদীর জল।

একটা নিশ্বাস ফেলে, কঠিন হাস্য করে বিমল বললে, 'বোধহয় সেই কুম্ভকর্ণই বোটসুদ্ধ আমাদের মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে!'

সেই রুগ্ন চাঁদের হলদে মুখ। মিটমিটে আলোতে পৃথিবীর কিছুই ভালো করে নজরে পড়ে না। বিমল বোটের তলায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। বোটের তলায় রয়েছে কেবলই অন্ধকার—কষ্টিপাথরের মতো কালো আর নিরেট।

বোটের ভিতরে আর সবাই তখন নির্বাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছে, বোধহয় তাদের মাথার ভিতরে তখনও বিমলের সেই অসম্ভব কথাগুলোই বারংবার ঘোরাফেরা করছে—'সেই কুম্ভকর্ণই বোটসুদ্ধ আমাদের মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে!'

বোটের নীচের দিকটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বিমল আবার বললে, 'না, আর কোনও সন্দেহ নেই। কুম্ভকর্ণই আজ ঝাঁকামুটে হয়েছে! তার ঝাঁকা হয়েছে এই বোট, আর বোটের মধ্যে আছি আমরা!'

বিনয়বাবুর মুখে অস্ফুট স্বর শোনা গেল—'অসম্ভব!'

বিমল শুকনো হাসি হেসে বললে, 'হ্যাঁ অসম্ভবই বটে, কিন্তু অসম্ভবের দেশে অসম্ভবও সম্ভব হয়! জলে সাঁতার কাটা যার একমাত্র কর্তব্য, সেই বোট পাখিও নয় এরোপ্লেনও নয় যে শূন্য দিয়ে উড়ে যাবে। বিনয়বাবু, চেয়ে দেখুন—নদীর জল এখন কত দূরে!'

সকলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, নদীর জলে আলোর ঝিকিমিকি বহু দূরে সরে গিয়েছে এবং ক্রমে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। জলতরঙ্গের কলকল্লোলও আর শোনা যায় না।

বিমল বললে, 'আমাদের মাথায় নিয়ে কালাপাহাড় এখন জমির উপর দিয়ে হাঁটছে।'

বিনয়বাবু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছে সে!'

—'এর উত্তর সেই-ই জানে। কলকাতায় ঝাঁকায় চড়ে রামপাখিরা আসে আমাদের জন্যে। এখানে ঝাঁকায় চড়ে আমরা যাচ্ছি হয়তো ধরণীর বাসায়!'

এতক্ষণে রামহরির হুঁশ হল। সে হাউমাউ করে বলে উঠল, 'ও খোকাবাবু! ওই ধরণী কি পিচাশ? আমাদের কেটে খানা খাবে নাকি?'

কুমার বলে উঠল, 'বন্দুক নাও বিমল! বোটের তলার দিকে গুলি বৃষ্টি করো!'

বোটের তলায় কে আছে, ভগবানই জানেন। কিন্তু যে-জীবই থাকুক, সে যে কুমারের কথা শুনতে পেলে ও বুঝতে পারলে, তৎক্ষণাৎ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ কুমারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বোটখানা ধরে সে এমন ঘন ঘন বিষম ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে সকলেই তার ভিতরে চারিদিকে ছিটকে পড়ল। সে ভয়ানক ঝাঁকুনি আর থামে না—সকলেরই অবস্থা হল কুলোর মধ্যে ফুটকড়াইয়ের মতো, গতর গুঁড়ো হয়ে যাবার জোগাড় আর কী! ঝাঁকুনি যখন থামল, বোটের ভিতরে সবাই তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

*   *   *

একে একে যখন তাদের আবার জ্ঞান হল, তখন রাত কি দিন প্রথমে তা বোঝা গেল না। চারিদিকে না আলো না অন্ধকার,—সন্ধ্যার মুখেই পৃথিবীকে দেখতে হয় এইরকম আবছা মায়া মাখা রহস্যময়।

সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা দরজার মতো, বিমলের চোখ সেই ফাঁকা জায়গাটুকু দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল—কিন্তু সেখানেও আলো খুব স্পষ্ট নয়।

বিমল ওঠবার চেষ্টা করলে, পারলে না। তার সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধা।

কুমার বললে, 'বন্ধু, আমরা বন্দি!'

বিমল বললে, 'হুঁ! কিন্তু কার বন্দি—ধরণীর না কুম্ভকর্ণের?'

বিনয়বাবু বললেন, 'বোধহয় ধরণীর। বিমল, ভালো করে তাকালেই বুঝতে পারবে, আমরা একটা অন্ধকার ঘরে বন্দি হয়ে আছি। এর দরজাটা সাধারণ মানুষ ঢোকবারই উপযোগী, এর ভিতর দিয়ে তোমাদের ওই কুম্ভকর্ণ কিছুতেই দেহ গলাতে পারবে না। সুতরাং যে আমাদের এ ঘরে এনে রেখেছে তার দেহ তোমার আমার চেয়ে বড়ো হতে পারে না।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমরা কোথায় আছি? বাহির থেকে গাছপালার আওয়াজ আসছে—একটা কাকও কা কা করছে। মনে হচ্ছে এখন দিনের বেলা। কিন্তু আলো এত কম কেন?'

কমল বললে, 'বাইরে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে আলো আসছে যেন উপর থেকেই। আমরা বোধহয় কোনও উঠানওয়ালা বাড়ির একতলার ঘরে বন্দি হয়ে আছি।'

বিমল বললে, 'কিন্তু দ্বীপে এমন কোনও উঁচু বাড়ি থাকলে কালকেই আমাদের নজরে পড়ত। ...বিনয়বাবু, আমরা বোধহয় জমির নীচে কোনও পাতালপুরীতে বন্দি হয়েছি!'

হঠাৎ রামহরি আর্ত স্বরে বলে উঠল, 'ওই। আবার সেই শব্দ-ভূত!'

সকলে কান পেতে শুনলে, বাইরে আবার কোথায় সেই পরিচিত কিচির-মিচির কিচির-

মিচির শব্দ হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে ডাল-পাতা নড়ে ওঠারও শব্দ; কে যেন গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে লাফালাফি করছে।

তারপরেই সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

'নেইকো হেথায় রম্ভা-টম্ভা
আছে অষ্টরম্ভা
লম্বা লম্বা লম্ফ মেরে
জলদি দে রে লম্বা।
হুমড়োমুখো ধুমড়ো বিড়াল,
আকাশমুখো দৈত্য,
দেখলে তাদের চিত্ত কাঁপায়
হিমালয়ের শৈত্য।
মুখ বাড়িয়ে কুত্তা ধরে
বটের ডালের পক্ষী,
পালাও ভায়া! কেমন করে
সইবে এসব ঝক্কি।'

বিমল অভিভূত স্বরে বললে, 'সেই কণ্ঠস্বর! আবার আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে।'

কুমার বললে, 'অতিকায় বিড়াল, কুকুর, দৈত্য—সকলকার কথাই ও বলছে। কে ও, বিমল? অমন করে লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে কেন, বিপদের আগেই সাবধান করে দেয় কেন, আর কবিতাতেই বা কথা কয় কেন?'

বিমল বললে, 'আর একটা কণ্ঠস্বরও আমরা শুনেছি—নদীর জলে সেই ভীষণ অমানুষিক কণ্ঠস্বর। এখানে জল নেই বলেই বোধহয় সেই গলার আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'চুপ চুপ, ওই শোনো।'

আবার শব্দ হতে লাগল—কিচির-মিচির। আবার গাছের ডালে ডালে লাফালাফির শব্দ। কিচির-মিচির শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর শোনা গেল, অত্যন্ত দুঃখে যাতনায় যেন ভেঙে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে কে বলছে—

'অনেক দিনের রূপকথা ভাই,
বহুকালের গল্প—
ছিলাম যেন মাটির মানুষ,
সুখ ছিল না অল্প!
রাঙা রাঙা খোকা-খুকি
খেলত আমার বক্ষে,
টুকটুকে মোর বউটি সদাই
হাসত মুখে চক্ষে!

আজ অদৃষ্ট শক্ত করে
আমার যখন বাঁধছে—
হায় রে তারা কোথায় বসে
আমার তরেই কাঁদছে!'

হঠাৎ একটা নতুন কণ্ঠে উচ্চস্বরে শোনা গেল, 'হা হা হা হা! কী হে কবি, এখনও কবিতা ভোলোনি? হা হা হা হা!' এ ধরণীর হাসি।

কবিতা আর শোনা গেল না ...খালি গাছের ডাল-পাতার শব্দ হল। তারপরেই আর এক শব্দ। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। বিমল ও কুমার পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। দরজার কাছটা অন্ধকার করে একটা মূর্তি এসে দাঁড়াল—ধরণী।

খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধরণী ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপর সহাস্যে বললে, 'এই যে বন্ধুগণ! ধরণীর শ্রেষ্ঠশয্যা ভূমিশয্যায় শুয়ে আছ, আশা করি বিশেষ কোনও কষ্ট হচ্ছে না?' কেউ কোনও জবাব দিলে না। ধরণী তেমনি হাসতে হাসতে বললে, 'হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা দেখতে চেয়েছিলে, শীঘ্রই তাকে দেখতে পাবে। আর বাঘের মতো বড়ো বিড়ালকে তো তোমরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছ। আর তালগাছের মতন উঁচু মানুষকে কাল অন্ধকারে তোমরা ভালো করে দেখতে পাওনি—নয়?'

বিমল বললে, 'কে সে?'

ধরণী বললে, 'দেখছি এখনও তোমার কৌতূহল দূর হয়নি। সে কে জানো? আমার চাকর হরিদাসকে কাল দেখেছ তো? সে তার ছোটোভাই রামদাস—তোমরা যার নাম রেখেছ কুম্ভকর্ণ।'

বিমল সবিস্ময়ে থেমে থেমে বললে, 'হরিদাসের ছোটোভাই রামদাস?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুম্ভকর্ণ নয়, আর কেউ নয়, হরিদাসের ছোটোভাই রামদাস। ভাবছ, কেমন করে রামদাস এত বড়ো হল? হা হা হা হা!'—তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর স্বরে ধরণী বললে, 'কেন তোমরা আমাকে জ্বালাতন করবার জন্যে এখানে এসেছ? মূর্খ মানুষদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে আমি এত দূরে পৃথিবীর একপ্রান্তে এসে অজ্ঞাতবাস করছি, কিন্তু এখানেও তোমাদের মূর্খতা আর অন্যায় কৌতূহল থেকে মুক্তি নেই? যতসব তুচ্ছ জীব, কতটুকু শক্তি তোমাদের, এসেছ আমার সাধনায় বাধা দিতে? জানো, আমি একটা আঙুল নাড়লে তোমরা এখনই ধুলোয় মিশিয়ে যাবে?'—ধরণী জ্বলন্ত চক্ষে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল অতিশয় উত্তেজিতভাবে।

বিনয়বাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ধরণীবাবু, আমাদের আপনার শত্রু বলেই বা ধরে নিচ্ছেন কেন? আমরা তো আপনার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে এখানে আসিনি, আমরা এসেছি শুধু এখানকার অদ্ভুত ঘটনাগুলো স্বচক্ষে দেখবার জন্যে।'

ধরণী আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে আরও বেশি চেঁচিয়ে বললে, 'দেখবার জন্যে, না মরবার জন্যে? তোমরা আমার বিড়ালকে হত্যা করেছ, তোমাদের আমি ক্ষমা করব না!'

বিমল বললে, 'আপনার বিড়ালকে মেরেছি একলা আমি। আমার অপরাধে ওঁরা কেন শাস্তি পাবেন? ওঁদের ছেড়ে দিন।'

—'ছেড়ে দেব? হা হা হা হা! ছেড়ে দেবই বটে! ওদের ছেড়ে দি, আর ওরা দেশে গিয়ে সারা পৃথিবীর লোককে নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসুক! সবাই আমরা গুপ্তকথা জানুক! জানো বাপু, যে আমার গুপ্তকথা জেনেছে তার আর মুক্তি নেই!'

—'আপনার কী গুপ্তকথা আমরা জানতে পেরেছি?'

—'কিছু কিছু জানতে পেরেছ বই কি। আসল কথা এখনও জানতে পারোনি বটে, তবে তোমাদের কাছে তা বলতে এখন আমার আর আপত্তিও নেই। তোমরা তো আর দেশে ফিরে যাবে না!'

ঘরের কোণে একটা টুল ছিল, ধরণী তার উপরে গিয়ে বসল। তারপর বলতে লাগল, 'এই নির্জনে একলা বসে আমি সাধনা করি। কী সাধনা করি জানো? পুরাতন পৃথিবীকে নতুন রূপ, নতুন শক্তি দেবার সাধনা। মানুষ বড়ো ছোট্ট, বড়ো দুর্বল জীব। তার মস্তিষ্ক অন্য সব জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দেহ হিসেবে তার চেয়ে বৃহৎ আর বলবান প্রাণী আছে অনেক। কাজেই মানুষকে কী করে আরও বড়ো ও শক্তিমান করে তোলা যায় প্রথমে সেইটেই হল আমার ধ্যান-ধারণা। কেমন করে সে ধ্যান-ধারণা সফল হল, তোমাদের কাছে সেকথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে লাভ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের গোবর ভরা মাথায় তা ঢুকবে না। তবে সামান্য দু-একটা ইঙ্গিত দিচ্ছি শোনো। Glands বা গ্রন্থিদের নাম শুনেছ তো! এই গ্রন্থিদের রসেই মানুষের দেহ টিকে থাকে। গুটি পাঁচেক গ্রন্থি দেহের ভিতর রস সঞ্চার করে; আর তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি গ্রন্থির নাম হচ্ছে Thyroid, Adrenal ও Pituitary. প্রথমটির অবস্থান মানুষের কণ্ঠে, দ্বিতীয়টির মূত্রাশয়ে আর তৃতীয়টির মস্তিষ্কে। এইসব গ্রন্থির হের-ফের মানুষের দেহের অদল-বদল হয়। ধরো Thyroid গ্রন্থির কথা। যে-শিশুর দেহে এই গ্রন্থি বিকৃত অবস্থায় থাকে—'

বিনয়বাবু ধরণীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—'তার মস্তিষ্ক আর কঙ্কালের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিশ বছর বয়সেও তার দেহ আর বুদ্ধি হয় খোকারই মতন। আমি এসব জানি ধরণীবাবু। আবার Pituitary গ্রন্থি অতিরিক্ত রস ঢাললে মানুষের দেহের বাড়ও অতিরিক্ত রকম হয়ে ওঠে—কেউ হয় আশ্চর্য রকম মোটা, আবার কেউ বা হয় আট-দশ ফুট লম্বা। গ্রন্থি নিয়ে মিছিমিছি লেকচার না দিয়ে আপনি কাজের কথা বলুন,—যতটা ভাবছেন আমরা ততটা মূর্খ নই!'

ধরণী একটু থতমত খেয়ে অল্পক্ষণ বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'তাহলে তোমাদের ঘটে একটু-আধটু বুদ্ধি আছে দেখছি! তবে আমার পরীক্ষার আসল পদ্ধতিটা তোমাদের কাছে আর খুলে বলা হবে না। যদিও ওই দেহ নিয়ে তোমরা আর এ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না, তবু সাবধানের মার নেই।'

কুমার বললে, 'দেহ নিয়ে বাইরে বেরুতে পারব না! তার মানে?'

ধরণী হেসে উঠে বললে, 'মানে? মানে নিশ্চয়ই একটা আছে। হ্যাঁ, শীঘ্রই তোমাদের চেতনা থাকবে বটে, কিন্তু তোমাদের দেহগুলো পঞ্চভূতে মিশিয়ে যাবে।'

সকলে মহা বিস্ময়ে এই ধাঁধার কথা ভাবতে লাগল। চেতনা থাকবে, কিন্তু দেহ থাকবে না? আশ্চর্য! ভয়ানকও বটে!

ধরণী বললে, 'তারপর শোনো। আমার পরীক্ষা পদ্ধতির কথা আর বলব না বটে, কিন্তু পরীক্ষার ফলের কথা তোমাদের কাছে বলতে ক্ষতি নেই। আমি এমন সব বিশেষ ঔষধ বা খাবার আবিষ্কার করেছি, দ্রব্যগুণে যা গ্রন্থিদের রস উৎপাদনের ক্ষমতা কল্পনাতীতরূপে বাড়িয়ে তোলে। ওই আবিষ্কারের দৌলতে আমি এখন মানব-দানব সৃষ্টি করতে পারি।'

বিমল বললে, 'যেমন হরিদাসের ভাই রামদাস?'

—'হ্যাঁ। রামদাস জন্মাবার পর থেকেই মানুষ হয়েছে আমার আবিষ্কৃত খাবার খেয়ে। সে যখন তিন মাসের শিশু, তখনই তার দেহ লম্বায় হয়ে উঠেছিল তিন ফুট। তার অতি বাড় দেখে পাড়ার লোক এমন কৌতূহলী হয়ে উঠল যে আমাকে এই নির্জন দ্বীপে পালিয়ে আসতে হল। কেবল রামদাস নয়, একটা বিড়াল ও একটা কুকুরকেও আমি আমার খাবার খাইয়ে বাঘ আর হাতির মতো বড়ো করে তুলেছি। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। আদিম যুগের হাতি, বাঘ, সিংহ আর ষাঁড়রা এখনকার চেয়ে ঢের বড়ো হত কেন? কোমোডোর গোসাপরা এখনও বড়ো বড়ো কুমিরেরও চেয়ে মস্ত হয় কেন? কেবল ওই গ্রন্থির অতিরিক্ত রসের মহিমায়। এদিকে আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন সুদিনের অপেক্ষায় বসে আছি।'

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীসের সুদিন?'

ধরণী বিকট উল্লাসে চিৎকার করে বললে, 'আমি এই ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষের পৃথিবী জয় করব! আর বছর বারো পরে আমার দানববাহিনী নিয়ে তোমাদের মতো জ্যান্ত পুতুলের খেলাঘর আক্রমণ করব, ধীরে ধীরে একালের সমস্ত মানুষ জাতিকে লুপ্ত করে দিয়ে দুনিয়ার সর্বশক্তিমান সম্রাট হয়ে নূতন এক মহামানবের পৃথিবী গড়ে তুলব! সে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ হবে প্রায় কলকাতার মনুমেন্টের মতন উঁচু, আর সেখানকার বড়ো বড়ো অট্টালিকা উঁচু হবে দার্জিলিং পাহাড়ের সমান! আমার তৈরি মানুষরা তিন-চার বার পা ফেলে হেঁটেই গঙ্গা আর পদ্মা নদী পার হয়ে যাবে! আমার রামদাস তো এখনও বালক, মাথায় সে আরও কত উঁচু হবে আমিই তা জানি না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'পৃথিবীর মানুষ যত ছোটো আর দুর্বলই হোক, আপনার ওই রামদাসের মতন একটিমাত্র দানবকে বধ করবার শক্তি তাদের আছে।'

'—একটিমাত্র দানব? মোটেই নয়, মোটেই নয়! আর এক দ্বীপে আমি আমার শিশু-দানবদের লুকিয়ে পালন করছি। সেই দ্বীপ থেকে এখানে আসবার সময়েই তো আমার বিড়ালবাচ্চাটাকে হতভাগা মাঝি-মাল্লারা জলে ফেলে দিয়েছিল! না জানি সে বাচ্চাটা আরও কত বড়ো হতে পারত! তাকেই তোমরা হত্যা করেছ, তোমাদের ও-অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না!'

বিমল একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'দানব-রহস্য তো বুঝলুম, কিন্তু ছড়া কাটে কারা?'

প্রশ্ন শুনেই ধরণী ও হো হা হা হা হা করে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, 'ছড়া কাটে কারা? ছড়া কাটে কারা? এখনও তাদের দেখতে পাওনি বুঝি? তারা হচ্ছে বাংলা দেশের মাসিকপত্রের দুজন কবি!'

বিমল সবিস্ময়ে বললে, 'কবি!'

—'হ্যাঁ। তারা এমনি যাচ্ছেতাই কবিতা লিখত যে বাংলা মাসিকপত্রগুলো অপাঠ্য হয়ে উঠেছিল। কত সমালোচক তাদের গালাগালি দিয়েছে, কিন্তু তাদের ভয়ঙ্কর কবিতা লেখার উৎসাহ একটুও কমাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আমি তাদের এখানে এনে ধরে রেখেছি—অবশ্য তাদের দেহকে নয়, তাদের মস্তিষ্ককে।'

—'সে আবার কী?'

—'তোমরা কি এখনকার ইউরোপীয় অস্ত্র-চিকিৎসকদের বাহাদুরির কথা শোনোনি? বাঁদরের দেহের গ্রন্থি কেটে তারা মানুষের দেহের ভিতরে বসিয়ে দিচ্ছে। একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড খারাপ হয়ে গেলে কেটে বাদ দিয়ে, তার জায়গায় কোনও সদ্য মৃত মানুষের হৃৎপিণ্ড তুলে বসিয়ে দিচ্ছে। আমি নিজেও ডাক্তারি পাশ করেছি। তাই এসব নিয়েও পরীক্ষা করি। মানুষের মস্তিষ্ক জন্তুর মাথায় চালান করলে কী ব্যাপার হয় সেটা দেখবার জন্যে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। তাই একদিন ওই দুই নাছোড়বান্দা দুষ্ট কবিকে ধরে এনে কী করলুম জানো? করলুম ছোটোখাটো একটা অস্ত্রোপচার। একটা কুমির আর একটা হনুমান ধরলুম, তারপর তাদের জানোয়ারি মস্তিষ্ক কেটে বাদ দিয়ে দুই কবির মস্তিষ্ক কেটে নিয়ে বসিয়ে দিলুম। কিন্তু হতভাগা কবির মস্তিষ্ক! কুমির আর হনুমানের দেহে ঢুকেও কবিতা রচনা করতে ভোলে না! করুক তারা এই অরণ্যে রোদন। কিন্তু বাংলা মাসিকের পাঠকরা বেঁচে গিয়েছে!'*

এই ভীষণ কথা যারা শুনলে তাদের মনের ভিতরটা তখন কেমন করছিল, তা জানেন কেবল অন্তর্যামীই! ধরণী আবার অট্টহাস্য করে বললে, 'তোমরাও বেশি ভয় পেয়ো না, তোমাদের আমি একেবারে মেরে ফেলব না। তোমাদের দেহগুলো নষ্ট হবে বটে, কিন্তু তোমাদের মস্তিষ্ক বেঁচে থাকবে পশুদের মাথার ভিতরে গিয়ে। তবে, কোন পশুকে কার মস্তিষ্ক দান করব, সেটা এখনও স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ রাত্রেই একটা কোনও ব্যবস্থা করতে পারব বলে বোধ হচ্ছে! হা হা হা হা!'

কুমার গর্জন করে বললে, 'পিশাচ! দুরাত্মা! মনে করছিস আমাদের হত্যা করে তুই নিস্তার পাবি? ইস্টিমারে আমাদের বন্ধুরা আছে, তারা তোকে ক্ষমা করবে না!'

বিমল শান্তভাবেই বললে, 'ধরণীবাবু, এখনও আমাদের ছেড়ে দিন, নইলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।'

অট্টহাসি হাসতে হাসতে ধরণী বললে, 'তোমরা হাসালে দেখছি! আমরা এখন কোথায় আছি জানো? পাতালে! এই পাতালে ঢোকবার পথ এমন গভীর জঙ্গলে ঢাকা আছে, আজ সারাদিন ধরে খুঁজলেও ইস্টিমারের লোকেরা কোনও সন্ধান পাবে না! আজ রাত্রেও যদি ইস্টিমার দ্বীপের কাছে থাকে, তাহলে অন্ধকারে গা ঢেকে রামদাস গিয়ে সেখানাকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে আসবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মনুষ্য দেহ ত্যাগ করবার জন্যে তোমরা এখন প্রস্তুত হও! হা হা হা!' হাসতে হাসতেই ধরণী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

*পশুর মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক চালান করবার এই অদ্ভুত কল্পনার জন্যে আমি এক বিলাতি লেখকের কাছে ঋণী। ইতি—লেখক

রামহরি হঠাৎ গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। বিমল হেসে বললে, 'থামো রামহরি, থামো! অমন শেয়ালের মতো চ্যাঁচালে ধরণী এখনই এসে তোমার মগজ কেটে নিয়ে হয়তো শেয়ালেরই মাথায় ঢুকিয়ে দেবে!'

বিনয়বাবু গম্ভীরভাবে বললে, 'না, ঠাট্টা নয় বিমল! যা শুনলুম তা আমাদের পক্ষেও ভয়াবহ, সমস্ত মানুষ জাতির পক্ষেও ভয়াবহ! এখন কীসে প্রাণ বাঁচে, ভালো করে সেটা ভেবে দেখা দরকার।'

বিমল অবহেলা ভরে বললে, 'আর মিথ্যা ভাবনা! আছি পাতালপুরীতে—বাইরে রামদাসের পাহারা। আমাদের হাত-পা এমনভাবে বাঁধা যে, নড়বার ক্ষমতাও নেই। বিনয়বাবু, বাঁচবার ভাবনা মিথ্যা!'

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইবার ভাষা খুঁজে পেলে না।

পাতালপুরীর গর্ভে যেটুকু রোদ এসে পড়েছিল, সেও যেন ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে—ঘরের ভিতরে দিনের বেলাতেই সন্ধ্যার আভাস ফুটে উঠছে।

বাহির থেকে মাঝে মাঝে গাছপালার দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনও শব্দই ভেসে আসছে না।

কুমার বললে, 'পৃথিবী আর মঙ্গলগ্রহ জয় করেও শেষটা কি তাহলে ওই বুড়ো ধরণীর হাতে আমাদের হার মানতে হবে?'

বিমল বললে, 'উপায় কী? মরতে তো হবেই একদিন। আজ না হয় ধরণী হবে আমাদের যমদূত! জীবনের প্রবল আনন্দ আমরা দুই হাতে লুণ্ঠন করে নিয়েছি—সাধারণ মানুষের দশ জন্মের যৌবন আমাদের এক জন্মের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; তোমার আর কী অভিযোগ থাকতে পারে কুমার? এই অতিরিক্ত জীবনের বন্যা আমার যৌবনকে শ্রান্ত করে তুলেছে, আমি এখন ঘুমোতে পেলে দুঃখিত হব না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু এ তো চিরনিদ্রা নয় বিমল, এ যে জীবন্ত মৃত্যু! আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ে ধরণী কী করতে চায়, শুনলে তো!'

বিমল চিন্তিত মুখে বললে, 'হ্যাঁ, ওই কথা ভেবেই মাঝে মাঝে মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। মানুষের দেহ থাকবে না, কিন্তু মানুষের প্রাণ থাকবে—কিন্তু সে প্রাণের মূল্য কী? কারণ এক হিসাবে মস্তিষ্কই হচ্ছে মানুষের প্রাণ! কিন্তু বিনয়বাবু, এও কি সম্ভব?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আজীবন বিজ্ঞানচর্চা করছি, কিন্তু এমন উদ্ভট কল্পনার কথা কখনও মনেও আসেনি। এ কল্পনায় যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সে যেন রূপকথার যুক্তি!'

কমল বললে, 'আমাদের মধ্যে বাঘাই সুখী! রামদাস আমাদের বোট ঘাড়ে করতে না করতেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বেঁচে গেছে!'

রামহরি কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'আহা, সেকি আর বেঁচে আছে!'

কুমার বললে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। শত বিপদেও বাঘা কখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সে রামদাসের পিছনে পিছনে আসত।'

* * *

বাঘার কী হল সেটা আমাদের দেখা দরকার। বিমল ও কুমারের সমস্ত ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন, বাঘা সাধারণ কুকুর নয়। পশুর মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক ঢুকিয়ে ধরণী নতুন পরীক্ষা করতে চায়, কিন্তু পশুর মস্তিষ্কে যে খানিকটা মানুষী বুদ্ধি থাকতে পারে, অনেক কুকুরই অনেকবার তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে। বাঘাও হচ্ছে সেই জাতীয় কুকুর।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই বাঘা যখন দেখলে জলের নৌকো আকাশে উড়ছে, তখন তার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এমন অস্বাভাবিক কাণ্ড কোন কুকুর কবে দেখেছে? ভয়ে তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না, বিকট চিৎকার করে এক লাফে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পড়ে জলে সাঁতার কাটতে কাটতে সে দেখলে, খানিক তফাতেই একটা তালগাছ সমান উঁচু ছায়ামূর্তি কোমর জল ভেঙে ডাঙার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু সেই দানবমূর্তি দেখেও বাঘা বিশেষ বিস্মিত হল না। কারণ বিমল ও কুমারের সঙ্গে গিয়ে 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' দেরও সে দেখে এসেছে, তার চক্ষে দানবমূর্তি এখন আর অস্বাভাবিক নয়। সে খালি এইটুকুই বুঝে নিলে যে, ওই দানবের কাছ থেকে যত তফাতে থাকা যায় ততই ভালো।

এমন সময়ে আর-একদিকে তার নজর পড়ল। জলের উপরে আবছা-আলোর ভিতরে যেন খানিকটা নিরেট অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। খালি তাই নয়, অন্ধকারের এক জায়গায় যেন দু-টুকরো আগুনের মতো কী জ্বলজ্বল করছে।

সে-অন্ধকার আর কিছুই নয়, মস্ত বড়ো একটা কুমির।

এই জলচর জীবটিও বাঘার চোখে নতুন নয়। জলে এর সঙ্গে লড়াই হলে তারই যে সমধিক বিপদের সম্ভাবনা এটাও সে বুঝতে পারলে।

কুমির হঠাৎ বললে :

'ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট, ঘোঁ ঘট ঘট!
দে চম্পট দে চম্পট দে চম্পট!'

হতভম্ব বাঘার দুই কান খাড়া হয়ে উঠল। সে মানুষের ভাষার কথা কইতে পারে না বটে, কিন্তু শুনলে মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। এই কুমিরটার কথা যে মানুষের মতন শোনাচ্ছে!

কিন্তু এসব কথা নিয়ে এখন সময় নষ্ট করবার সময় নেই। সে নিজের দেহ দিয়ে কোনও ক্ষুধার্ত জলচরের উপবাস ভঙ্গ করতে মোটেই রাজি নয়। অতএব বাঘা তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে অনেক দূরে চলে গেল।

কিন্তু কুমিরটা তাকে একবারও আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে না।

বাঘা তখন আবার ডাঙার দিকে ফিরল। তখন আবার সেই ছায়া-দানবের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু কোথায় গেল সে? কোনওদিকেই তাকিয়ে বাঘা তাকে আবিষ্কার করতে পারলে না।

বোট যে কেন আকাশে উড়েছিল, সে এখন তা বুঝতে পেরেছে। দানবের মাথায় বোটের

ভিতরেই যে তার মনিবরা আছেন, এও সে জানে। এখন সে অনায়াসেই পুলিশের ইস্টিমারে উঠে নিজে নিরাপদ হতে পারত, কিন্তু সেকথা একবারও তার মনে হল না। বাঘা যে-জাতের জীব, সে-জাত প্রাণের চেয়েও বড়ো মনে করে মনিবকে। অতএব সে সাঁতার কেটে ডাঙায় গিয়ে উঠল,—কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, মনিবরা দানবের মাথায় চড়ে ওই দ্বীপেই গিয়েছেন।

কিন্তু দ্বীপে উঠে হল আর এক মুশকিল। দানবটা কোনদিকে গিয়েছে? চারিদিকেই গভীর জল, কোনদিকে যাওয়া উচিত?

মানুষ হলে বাঘাকে এখন হতাশ হতে হত। কিন্তু সে হচ্ছে কুকুর, তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি আছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। রামদাস যখন বোট শূন্যে তুলেছিল, তখনই তার গায়ের বিশেষ গন্ধ বাঘার নাকে এসেছিল। সে এখন চারিদিকে মাটি শুঁকে শুঁকে রামদাসের গায়ের গন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টায় লেগে গেল।

ভোর হল। সূর্য উঠল। গাছের মাথায় মাথায় রোদের আলপনা। বাঘা তখনও ব্যস্ত হয়ে মাটি শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে।

আরও কতক্ষণ পরে এক জায়গায় বড়ো বড়ো কয়েকটা পায়ের দাগ দেখা গেল। সেইখানে নাক বাড়িয়েই বাঘা আনন্দে অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল। এতক্ষণে সেই গন্ধ পাওয়া গেছে!

আর কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না! মহা খুশি হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাঘা মাটিতে নাক রেখে অগ্রসর হল।

কখনও খোলা জমির উপর দিয়ে এবং কখনও বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ পথ চলে বাঘা শেষটা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির পাশে তাদের সেই মোটরবোটখানা কাত হয়ে পড়ে আছে।

বাঘা দৌড়ে গিয়ে বোটে উঠল। কামরার ভিতরে ঢুকল। সেখানে তার মনিবদের জিনিসপত্তর ও বন্দুকগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তার মনিবরা কোথায়?

কামরা থেকে বেরিয়ে এসে বাঘা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ একটা দাড়িওয়ালা লোক ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে এল।

এ লোকটাকে বাঘা আগেও দেখেছে এবং তার কুকুর বুদ্ধি বললে, এ তাদের বন্ধুলোক নয়। সে চটপট আবার কামরার ভিতরে গা ঢাকা দিলে।

খানিক পরে সাবধানে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সেই সন্দেহজনক লোকটা অদৃশ্য হয়েছে।

তখন, অমন হঠাৎ লোকটা কেমন করে আবির্ভূত হল তার তদারক করবার জন্যে কৌতূহলী বাঘা খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে কতকগুলো ডালপাতা রাশীকৃত হয়ে রয়েছে এবং তারই ফাঁক দিয়ে একসার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ঝোপের বাহির থেকে এসব কিছুই দেখা যায় না এবং ঝোপের ভিতরে এসে দাঁড়ালেও সহজে সেই সিঁড়ির সার আবিষ্কার করা যায় না।

বাঘা সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। তারপরেই তার কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর। বাঘার খুশি-ল্যাজ তখনই বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাঘা সর্বপ্রথমে কুমারের ভূতলশায়ী দেহের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আদর করে তার গা চেটে দিতে লাগল।

রামহরি বিষাদ ভরা গলায় বললে, 'কেন বাঘা মরতে এলি এখানে? আমরা মরব, তুইও মরবি!'

বিমল কিন্তু বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, 'না, না! আমরাও বাঁচব, বাঘাও বাঁচবে! ভগবান এখনও বোধহয় আমাদের স্বর্গের টিকিট দিতে রাজি নন! বাঘা সেই খবরই নিয়ে এসেছে!'

বিনয়বাবু ম্লান মুখেই বললেন, 'বিমল, হঠাৎ তোমার এতটা খুশি হওয়ার কারণ বুঝলুম না!'

'বুঝলেন না? কিন্তু আমি বুঝেছি। বাঘা যখন এসেছে, তখন ধরণীর ছুরি থেকে নিশ্চয়ই আমাদের মাথা বাঁচাতে পারব। মরি তো একেবারেই মরব, কিন্তু মাসিকপত্রের ওই দুই কবির মতো কুমির কি হনুমান হয়ে থাকব না!'

কমল বললে, 'আমাদের হাত-পা দুই-ই বাঁধা, ধরণী আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে!'

কুমার বললে, 'না, তা আর পারে না! বিমল কী বলছে আমি বুঝেছি। —বাঘা!'—বলেই সে বাঘার মুখের কাছে নিজের বাঁধা হাতদুটো কোনওরকমে এগিয়ে দিলে।

বাঘা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল।

কুমার তখন বাঘার মুখের উপরে নিজের হাতদুটো ঘষতে ঘষতে বললে, 'ও কী রে বাঘা, তুই আমার ইশারা বুঝতে পারছিস না? নে, নে, দড়ি কাট!'

বাঘার আর কোনও সন্দেহ রইল না। সে তখনই নিজের ধারালো দাঁত দিয়ে কুমারের হাতের দড়ি চেপে ধরলে। দেখতে দেখতে তার হাতের দড়ি খসে পড়ল। কুমার তখন আগে নিজেই নিজের পায়ের বাঁধন খুলে ফেললে। এবং তারপর একে একে সকলেরই বন্ধনদশা ঘুচতে আর দেরি লাগল না।

বিমল বাঘাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'ওরে বাঘা, বাঘা রে! গেল জন্মে তুই আমাদের কে ছিলি রে বাঘা?' বাঘাও সুখে যেন গলে গিয়ে বিমলের কোলের ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে দিলে।

বিনয়বাবু বললেন, 'ওঠো বিমল, পরে বাঘাকে ধন্যবাদ দেবার অনেক সময় পাবে!'

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ঠিক বলেছেন! আগে এই পাতালপুরী থেকে বেরুতে না পারলে নিস্তার নেই! এসো সবাই! কিন্তু খুব ধীরে আর খুব হুঁশিয়ার হয়ে!'

একে একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে, যেখানটাকে তারা এতক্ষণ উঠান বলে মনে করেছিল, সেখানে রয়েছে মস্ত বড়ো একটা জলের ইঁদারা।

বিমল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললে, 'বিনয়বাবু, এই পাতালপুরীটা কী রকম তা বুঝেছেন? লক্ষ্ণৌয়ের নবাবরা গরমের সময়ে মাটির নীচে ঘর তৈরি করে বাস করতেন। সেই আদর্শেই এটা তৈরি হয়েছে। বর্ধমানেও এইরকম পাতালপুরী আছে! বিপদের সময়ে লুকোবার জন্যেই ধরণী এটা বোধহয় তৈরি করেছে।'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হো হো হো করে একটা বিষম অট্টহাসি সেই পাতালপুরীর ভিতরে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুললে। বিমল সচমকে মুখ তুলে দেখলে, সিঁড়ির উপরকার ধাপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে ধরণী।

ধরণী হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিষ্ঠুর স্বরে বললে, 'এই যে, দড়িটড়ি সব বুঝি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে?'

বিমল দুই পা এগিয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা মানুষ, দড়ি বাঁধা থাকতে ভালো লাগল না!'

ধরণী দুই পা পিছিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'ও! এখনও তোমরা মানুষই বটে! কিন্তু ভয় নেই, তোমাদের মনুষ্য দেহ আর বেশিক্ষণ থাকবে না!'

বিমল সিঁড়ির উপরে এক ধাপ উঠে বললে, 'আজ্ঞে না, এখনও আমাদের নরদেহ ত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়নি।'

ধরণী গর্জে উঠে বললে, 'খবরদার! আর এক পা এগিয়ো না! ভাবছ এখান থেকে বেরুতে পারলেই বাঁচবে? জানো, বাইরে কে পাহারা দিচ্ছে?'

—'রামদাস।'

—'হ্যাঁ, এখান থেকে এক পা বেরুলেই সে তোমাদের পায়ের কড়ে আঙুলে টিপে বধ করবে!'

—'বেশ, সেইটেই একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক'—বলেই বিমল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল এবং তার পিছনে পিছনে আর সকলেও।

বিমলের ইচ্ছা ছিল, ধরণীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তার অভিপ্রায় বুঝে ধরণী এক মুহূর্তেই তিন লাফ মেরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারাও তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখলে ধরণী তিরবেগে ছুটছে এবং প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকছে—'রামদাস! রামদাস! রামদাস!'

ঝোপের বাইরে একটুখানি ঘাস জমি এবং তারপরেই নিবিড় অরণ্য যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধরণী সেই অরণ্যের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, 'এখন আমরা কোনদিকে যাব?'

কুমার বললে, 'আমাদের আর কোনওদিকে যেতে হবে না। ওই দেখুন!'

অরণ্যের এক অংশ আচম্বিতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে—মড় মড় করে বড়ো বড়ো ডালপালা ভেঙে পড়ার এবং মাটির উপরে ধুপ ধুপ করে আশ্চর্য পায়ের শব্দ।

তারপরেই এক অতি ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর—'রামদাস, রামদাস! ওই পোকাগুলোকে পায়ে থেঁতলে, ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও!'

বিমল মৃদু হেসে বললে, 'এইবারে রামদাসকে আমরা স্বচক্ষে দেখব।'

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

কবির আবির্ভাব

রামদাস, ছোট্ট হরিদাসের মস্ত ভাই রামদাস, ধরণীর সৃষ্টিছাড়া পরীক্ষার জ্যান্ত ফল রামদাস,—যার পায়ের তলে পৃথিবী টলে, যার হাতের জোরে মানুষ ভরা মোটরবোট জল ছেড়ে শূন্যে ওড়ে, যার মাথা দোলে বুড়ো তালগাছের মাথার সমান উঁচু হয়ে ঝড়ের হুহুঙ্কারে!

সেই রামদাস আসছে আজ বিমলদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, ধরণীর নিষ্ঠুর হুকুম পালন করবার জন্যে, এক এক বিরাট পায়ের চাপে পাঁচ-পাঁচটি ক্ষুদ্র মানুষের দেহ ঠুনকো কাচের পেয়ালার মতো চূর্ণ করবার জন্যে।

সকলে অত্যন্ত অসহায়ের মতো এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল,—কিন্তু কোথায় পালাবার পথ? সামনে খোলা জমি, তারপরেই দুর্ভেদ্য বন, যার ভিতর দিয়ে মড় মড় করে বড়ো বড়ো ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে আসছে স্বয়ং রামদাস, বাম পাশে ও ডান পাশেও নিবিড় অরণ্য যেন নিরেট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে—হয়তো তার ভিতরেও তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সেই হাতির মতো ডালকুত্তা এবং সেখানে গিয়ে পথ খোঁজবারও সময় নেই।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, আমাদের আবার সেই পাতালপুরীতেই ফিরে গিয়ে বন্দি হতে হবে—রামদাস তার ভিতরে ঢুকতে পারবে না!'

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, 'সেখানে গিয়ে ধরণীর ছুরিতে মস্তিষ্ক দান করব? প্রাণ থাকতে নয়!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু এখানেই প্রাণ আর থাকছে কই?'

কুমার বললে, 'রামদাসের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমি প্রাণ দিতে রাজি আছি, কিন্তু ধরণীর ছুরিতে মস্তিষ্ক দিয়ে মরেও বেঁচে থাকতে পারব না!'

কমল বললে, 'আমারও ওই মত!'

রামহরি কেবল কাঁদতে লাগল।

কিন্তু বাঘা চ্যাচাচ্ছে শুধু ঘেউ ঘেউ করে—সে বোধহয় রামদাসকে শুনিয়ে শুনিয়ে কুকুর ভাষায় সবচেয়ে খারাপ গালাগালিগুলো বর্ষণ করছে।

হঠাৎ কমল বলে উঠল, 'বিমলবাবু, দেখুন—দেখুন!'

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখলে, ডান দিকের একটা বড়ো গাছের উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসছে মস্ত একটা হনুমান। নীচের ডাল থেকে এক লাফে ভূতলে অবতীর্ণ হল এবং তারপর দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে সবাইকে ডাকতে লাগল।

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'ও কী ব্যাপার?'

বিমল বললে, 'বোধহয় সেই হনুমান—যার মাথায় বেঁচে আছে মানুষের মগজ!'

কুমার বললে, 'ও যে আমাদের ডাকছে!'

বনের ডালপালা ভাঙার শব্দ তখন খুব কাছে এসে পড়েছে—রামদাসের দেখা পেতে বোধহয় আর আধ মিনিটও দেরি লাগবে না।

বিমল বললে, 'ধরণীর কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ওই পশুদেহের ভিতরে আছে মানুষেরই মন। চলো সবাই, প্রাণ তো গিয়েছেই, এখন ওর কথা শুনে কী হয় সেইটেই দেখা যাক!'

বাঘা গরর গরর করে এগিয়ে যাচ্ছিল হনুমানজিকে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে বাহাদুরি নেবার জন্যে; কিন্তু কুমারের কাছ থেকে এক চড় খেয়ে সে ল্যাজ গুটিয়ে সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল—কিন্তু বুঝতে পারল না যে, হনুমানের মতো একটা জানোয়ারকে কামড়াতে যাওয়াটা আজ হঠাৎ অপরাধ হয়ে দাঁড়াল কেন?

তারা সবাই হনুমানের দিকে অগ্রসর হল, হনুমানও গিয়ে দাঁড়াল একেবারে অরণ্যের ধার ঘেঁষে একটা ঝোপের পাশে। তারপর, কী আশ্চর্য, সে ঠিক মানুষেরই মতো ঝোপের দিকে হাত তুলে আঙুল দিয়ে কী ইঙ্গিত করলে।

কিন্তু বিমলের তখন অসম্ভব ব্যাপার দেখে বিস্মিত হবার অবকাশ ছিল না, তারা তাড়াতাড়ি যখন সেই ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল হনুমান তখন লাফ মেরে একটা গাছে উঠে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়েছে।

ঝোপের পিছনেই প্রায় নিরেট বনের তলায় একটা অন্ধকারমাখা পায়ে চলা সরু পথ।

বিমল মহা খুশি হয়ে বলে উঠল, 'হনুমান আমাদের পথ দেখিয়ে দিলে! জয় হনুমান!'

সকলে সেই পথ ধরে যখন বনের ভিতরে প্রবেশ করলে তখন তাদের মনে হল, যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো চোখের সমুখে 'সুইচ' টিপে কে নিবিয়ে দিলে! সে অরণ্য এমনি নিবিড় যে, তার ভিতরে রোদ বা জ্যোৎস্না কোনওদিন বেড়াতে আসতে পারেনি!

অন্ধকার যখন একটু চোখ সওয়া হয়ে এল, তখন তারা চারিদিক হাতড়াতে হাতড়াতে কোনওগতিকে গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল।

সেই সময়ে পিছন থেকে ভেসে এল যেন গম্ভীর মেঘগর্জন।

বিনয়বাবু বললেন, 'আমাদের দেখতে না পেয়ে রামদাস বোধহয় খাপ্পা হয়ে গর্জন করছে!'

সকলে সেই অবস্থাতে যথাসম্ভব পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই চির অন্ধকারের রাজ্য দিয়ে তাদের আর বেশিক্ষণ যেতে হল না, অরণ্যের নিবিড়তা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল এবং আলোকের আভাসে বনের ভিতরটা ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অরণ্য শেষ হয়ে গেল, তারা আবার একটা বড়ো মাঠের উপরে এসে দাঁড়াল।

সারা আকাশ তখন প্রখর রৌদ্রে সমুজ্জ্বল, ময়দানের নীলিমার উপর দিয়ে সোনালির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বিমল একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' উচ্চারণ করে যেন সেই নির্মল আলোক আর প্রমুক্ত বাতাসকে দৃষ্টি আর নিশ্বাস দিয়ে নিজের বুকের ভিতরে টেনে নিতে লাগল।

কুমার বললে, 'এখনও আঃ বলে নিশ্চিন্ত আরাম করবার সময় হয়নি বিমল! রামদাস গোটা কয় লাফ মারলেই এখানে এসে হাজির হতে পারবে!'

বিমল বললে, 'ঠিক! খোলা মাঠ পেয়েছি, চলো এইবার আমরা দৌড়োই!'

কমল বললে, 'কিন্তু কোনদিকে যাব?'

কুমার বললে, 'কোনদিকে আবার! আমরা এসেছি পূর্ব দিক থেকে, আমাদের যেতেও হবে পূর্ব দিকে।'

সবাই পূর্ব দিকে ছুটতে শুরু করলে। ছুটোছুটিতে বাঘার ভারী আমোদ! সে ভাবলে এইবারে খেলার পালা শুরু হল! তখনই সে ভালো করেই দেখিয়ে দিলে ছুটোছুটি খেলায় তাকে হারিয়ে কেউ 'ফার্স্ট প্রাইজ' নিতে পারবে না।

ময়দানের ওপারে আবার একটা বনের আরম্ভ,—এ বন তেমন ঘন নয়।

কিন্তু সকলে এখানে এসেই সভয়ে শুনলে, বনের ভিতর দিয়ে কারা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

শত্রুরা কি তাদের ইস্টিমারে যাবার পথ বন্ধ করে আক্রমণ করতে আসছে?

পিছনে আছে রামদাস, আর এদিকে আছে কে! সশস্ত্র ধরণী, হরিদাস—আর সেই হাতির মতো ডালকুত্তা?

তাহলে উপায়? তারা নিরস্ত্র, বাধা দেবার কোনও উপায়ই নেই। এক উপায়, পালানো। কিন্তু এবারে তারা কোনদিকে পালাবে?

কুমার হঠাৎ প্রচণ্ড উৎসাহে বলে উঠল, 'পুলিশ! পুলিশ! মিলিটারি-পুলিশ!'

বিমল চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, বনের ভিতর থেকে সার বেঁধে সমতালে পা ফেলে মিলিটারি-পুলিশের লোক বেরিয়ে আসছে।

সে সানন্দে বললে, 'আর আমাদের কোনও ভয় নেই! বিনয়বাবু, ওই দেখুন বন্দুকধারী পুলিশ ফৌজ, ওই দেখুন 'মেশিনগান'! আসুক এখন রামদাস, আসুক এখন ধরণী আর আসুক তার হাতি কুকুর!'

ইনস্পেকটার তাদের দেখে দৌড়ে এসে বললেন, 'বিমলবাবু, ব্যাপার কী? মোটরবোটসুদ্ধ কোথায় উধাও হয়েছিলেন?'

বিমল বললে, 'আমরা যমালয় ফেরত মানুষ!'

—'তার মানে?'

—'তার মানে তালগাছের মতন উঁচু দৈত্য মোটরবোটসুদ্ধ আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল!'

—'কী যে আপনি বলেন!'

—'বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনুন।'

বিমল তাড়াতাড়ি খুব অল্প কথায় মোটামুটি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে।

ইনস্পেকটার সব শুনে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না! এ যে গাঁজাখুরি কথার মতো শোনাচ্ছে!'

—'বিশ্বাস করুন মশায় বিশ্বাস করুন। গাঁজার ধোঁয়া যেমন সত্য, আমাদের কথাও তেমনি সত্য।'

—'আপনারা স্বপ্ন বা ম্যাজিক দেখেছেন কি না জানি না, কিন্তু আপনারা যে বিপদে পড়েছেন, এটা আমি আন্দাজ করেছিলুম। তাই তো লোকজন নিয়ে আমি আপনাদের খুঁজতে বেরিয়েছি!'

—'বড়ো ভালো কাজ করেছেন মশাই, বড়ো ভালো কাজ করেছেন। আমাদের তো খুঁজে পেয়েছেন, এইবারে চলুন সেই রামদাসের খোঁজে!'

—'নিশ্চয়ই যাব! কিন্তু ওই যে বললেন, আপনাদের এই রামদাসের গল্প গাঁজার ধোঁয়ার মতন সত্য, শেষটা গাঁজার ধোঁয়ার মতোই রামদাস উবে যাবে না তো?'

কুমার বললে, 'হুঁ! রামদাস উবে যাবারই ছেলে বটে! ওই দেখুন, মাঠের পারের ওই বনে দাঁড়িয়ে রামদাস আমাদেরই দেখছে!'

ইনস্পেকটার সেইদিকে তাকিয়েই চমকে মস্ত এক লাফ মারলেন।

ময়দানের ওদিককার বনের সারের উপরে এক মানুষ-তালগাছ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ করছে, দুই হাত দুই কোমরে রেখে। তার অদ্ভুত দেহের তুলনায় বড়ো বড়ো তালগাছগুলোকেও ছোটো দেখাচ্ছে। এতদূর থেকে তার মুখের ভাব দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেটা যে বিপুলবপু এক নরদৈত্যের মূর্তি, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

মিলিটারি-পুলিশের দলের ভিতর থেকে একটা বিস্মিত কোলাহল ধ্বনি উঠল।

বিমল বললে, 'কিন্তু সেই হাতির মতো ডালকুত্তা? সে এখনও একবারও দেখা দিলে না কেন?'

ইনস্পেকটার বললেন, 'রক্ষে করুন মশায়, আর আমি তাকে দেখতে চাই না! যা দেখেছি, তাতেই পিলে চমকে উঠেছে! এই সেপাই, ফায়ার করো—ফায়ার করো!'

বিমল ব্যস্তভাবে বললে, 'না না! আগে দেখাই যাক, রামদাসকে আমরা জ্যান্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে পারি কি না!'

ইনস্পেকটার দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে তুলে সবিস্ময়ে বললেন, 'গ্রেপ্তার! ওকে গ্রেপ্তার করতে চায় কে? ওর কাছে গেলে ও তো পুঁটিমাছের মতো টপ টপ করে আমাদের মুখে ফেলে দেবে! ওর হাতে পরাবার হাতকড়িই বা কোথায় পাব? ইস্টিমারে ওর দেহ কুলোবে না, নিয়ে যাব কেমন করে? না না, গ্রেপ্তার-ট্রেপ্তার নয়, ওকে একেবারে বধ করতে হবে!'

বিমল বললে, 'কিন্তু এত দূর থেকে গুলি ছুড়লে তো ওর গায়ে লাগবে না!'

—'তবু বন্দুক ছুড়ুক! বন্দুকের শব্দে ভয় পেয়ে দৈত্যবেটা এখান থেকে পালিয়ে যাক? ওকে দেখতে আমার একটুও ভালো লাগছে না! এই সেপাই, বন্দুক ছোড়ো—'মেশিনগান' ছোড়ো!'

বন্দুক ও কলের কামানের ঘন ঘন বজ্র গর্জনে চতুর্দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে রামদাসের দেহ বনের ভিতর ডুব মারলে। তাহলে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি সে জানে।

ইনস্পেকটার উৎসাহ ভরে বলে উঠলেন, 'দেখছি দৈত্যবেটা গোঁয়ারগোবিন্দ নয়। তবে

চলো সবাই অগ্রসর হই। কিন্তু খবরদার, বন্দুক ছোড়া বন্ধ কোরো না। সেই ফাঁকে দৈত্যটা কাছে এসে পড়লে আর রক্ষে নেই!'

সকলে মিলে অগ্রসর হল—যেখানটায় রামদাসকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে রামদাসের বদলে পাওয়া গেল ধরণীকে। একটা গাছের তলায় ধরণী লম্বা হয়ে শুয়ে আছে—বন্দুকের গুলি লেগে তার কপাল বয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

বিমল তার বুকে হাত দিয়ে দেখে বললে, 'ধরণী এ জীবনে আর আমাদের মগজ নিয়ে পরীক্ষা করতে পারবে না!'

তারপর আবার রামদাসের সন্ধান আরম্ভ হল। কিন্তু দ্বীপের চারিদিক, ছোটো-বড়ো সমস্ত বন খুঁজেও তার কোনওই পাত্তা পাওয়া গেল না।

সবাই যখন দ্বীপের ওপাশে আবার নদীর ধারে এসে পড়ল, বিনয়বাবু তখন একদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

আগেই বলা হয়েছে, নদী এখানে প্রায় সমুদ্রের মতন দেখতে। সেই বিশাল জলের রাজ্যে দেখা গেল, বহুদূরে দুটো বড়ো বড়ো জীব সাঁতার কেটে কোথায় ভেসে চলেছে।

বিমল বললে, 'নিশ্চয়ই ওরা হচ্ছে রামদাস আর সেই বিরাট কুকুর!'

—'কিন্তু রামদাসের দাদা হরিদাসটা গেল কোথায়?'

—'হয়তো রামদাসের চওড়া পিঠে বসে নদী পার হচ্ছে! কী বলেন ইনস্পেকটারমশাই, ইস্টিমারে চড়ে আবার ওদের তাড়া করব নাকি?'

ইনস্পেকটার বললেন, 'আপদ যখন নিজেই বিদেয় হয়েছে, তখন আর হাঙ্গামা করে দরকার কী? কীসে কী হয় বলা তো যায় না, ও বেটা যদি ডুবসাঁতার দিয়ে এসে ঢুঁ মেরে ইস্টিমারের তলা ফাটিয়ে দেয়?'

সকলে যখন বনের ভিতর দিয়ে আবার ফিরে আসছে, তখন মাথার উপরকার একটা গাছের ডাল-পাতা হঠাৎ নড়ে উঠল, তারপর শোনা গেল—কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচ কিচ কিচ কিচ!

'মানুষ আমি নইকো রে ভাই,
আজকে আমি মানুষ নই,
তোমরা সবাই চললে দেশে,
একলা আমি হেথায় রই!
আমার দেশের সবুজ মাঠে
ধানের খেতে সোনার দোল,
বইছে নদীর রুপোর লহর,
শিউলি ঝরা মাটির কোল!'

সে করুণ স্বর শুনে সকলেরই মন ব্যথায় ভরে উঠল।

বিনয়বাবু উপর দিকে মুখ তুলে মমতা-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'কবি, আজ তোমার চেহারা

যেরকমই হোক, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ। তুমি গাছ থেকে নেমে এসো, আমাদের সঙ্গে আবার দেশে ফিরে চলো।'

গাছের উপর থেকে আবার সেই দুঃখমাখা কণ্ঠ শোনা গেল :

'আমার ঘরের মিষ্টি বধূ
ডাকছে আমায় রাত্রিদিন,
আমার খোকার, আমার খুকির
কণ্ঠে বাজে স্বপ্ন-বীণ।
কেমন করে ফিরব ঘরে,
আজকে আমি মানুষ নই,
তোমরা সবাই চললে দেশে,
একলা আমি হেথায় রই!'

সত্যিকার শার্লক হোমস

'সত্যিকার শার্লক হোমস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে।

॥ প্রথম ॥

ছেলেবয়সে

লেফটেনান্ট হেরল্ড মুর—আমেরিকার সত্যিকার শার্লক হোমস। কিছুদিন আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু এখনও তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বৎসরের বেশি নয়।

হেরল্ড মুর—আমেরিকার অদ্বিতীয় গোয়েন্দা। দুঃসাহসে তিনি দুর্জয়, কর্তব্য-ক্ষেত্রে বন্ধুকেও তিনি ক্ষমা করবেন না এবং আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর হস্তে অব্যর্থ।

প্রায় প্রত্যেক কাল্পনিক গল্পে পড়া যায়, অপরাধীরা গুলির পর গুলি বৃষ্টি করছে, তবে সেসব গুলি বোঁ বোঁ করে ছুটে যাচ্ছে গোয়েন্দাদের মাথার বা কানের পাশ দিয়ে। কিন্তু মুর এ শ্রেণির আজব গোয়েন্দা নন, গুণ্ডা ও দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তিনি নিজে আহত হয়েছিলেন এক-আধ বার নয়, গোনা সতেরো বার।

একবার দেহের তেরো জায়গায় রিভলভারের গুলিতে আহত হয়েও অপরাধীদের তিনি পালাতে দেননি। কতবার সশস্ত্র হত্যাকারীদের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন একাকী, অকুতোভয়ে।

মুরের আশ্চর্য বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আমেরিকার পৃথিবী বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্যন্ত সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন দিয়ে এসেছিলেন।

তোমরা গল্পের গোয়েন্দাদের অনেক কথাই শুনেছ। এমনকি সুপ্রসিদ্ধ শার্লক হোমস পর্যন্ত গল্পের গোয়েন্দা ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু এখানে তোমাদের কাছে আমি যে-গোয়েন্দার কথা বলব, রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আজও তিনি বিদ্যমান আছেন এই পৃথিবীতে।

হেরল্ড মুর জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। নিউ ইয়র্কের যে কুখ্যাত পল্লিতে তাঁর জন্ম হয়, সেখানে পুলিশের চেয়ে অপরাধীরাই ছিল দলে বেশি ভারী।

ছেলেবেলায় মুর যাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতেন, তাদের অনেকেই পরে ডাকসাইটে খুনি, গুণ্ডা ও ডাকাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পর থেকেই মুর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন, 'আমি পুলিশের লোক হব।'

বাল্যবন্ধুরা বিরক্ত হয়ে বলত, 'ভদ্রলোকের ছেলে কখনও পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে? আরে, ছিঃ!'

কিন্তু মুরের ঘুসির জোরে মুখ বন্ধ হত বাল্যবন্ধুদের। তাদের ছেলেবেলার একটি খেলা ছিল তার নাম, 'পুলিশ ও ডাকাতের দল।' পুলিশের দলের নায়ক হত মুর নিজে।

মুরের বয়স যখন মোটে নয় বছর, তখনই তিনি গ্রেপ্তার করেন প্রথম অপরাধীকে।

প্রতিবেশীর বাড়িতে চুপি চুপি ঢুকল এক চোর, কিন্তু সে মুরের চোখ এড়াতে পারল না।

তিনি পা টিপে টিপে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চোরকে ফেললেন ফাঁদে। তারপর যতক্ষণ না পুলিশের আবির্ভাব হল, ততক্ষণ দরজা অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সেইখানে।

ছেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা পিতার কানে উঠতে দেরি হল না। তিনি তো হেসেই অস্থির। মুরের পিতা ছিলেন বিখ্যাত স্থপতি। যশ, অর্থ ও মান, তাঁর কিছুরই অভাব ছিল না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর বন্ধু। এমন পিতার সন্তান কিনা পুলিশে যোগ দিতে চায়!

ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন, 'তুই পাহারাওয়ালা হবি কী রে! পুলিশের কাজে না আছে মান, না আছে টাকা। যা, ইস্কুলে গিয়ে ভরতি হ!'

মুর ইস্কুলে গেলেন। খেলাধুলোর সঙ্গে পড়াশুনোও চলল। কিন্তু মনের ভিতর পুষে রাখলেন নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

কিছুকাল যায়। মুরের বয়স বারো বৎসর।

তখন সে-অঞ্চলে বুম রজার্সের নামডাকের সীমা নেই। তার বয়স পুরোপুরি একুশও নয়, কিন্তু এর মধ্যেই সে গুণ্ডামি আর রাহাজানিতে মস্ত ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল, তার নাম শুনলে সবাই ভয়ে কেঁপে মরে। তার অপরাধী জীবন আরম্ভ হয় মাত্র তেরো বৎসর বয়স থেকেই। সতেরো বৎসর বয়সে গুরুতর অপরাধে পড়ে সে কারাদণ্ড লাভ করে।

কারাগার থেকে বুম এবং বন্ধুকে পত্র লেখে: 'এজ ফ্রোস আমাকে এইখানে পাঠিয়েছে। যেমন করে হোক সে যেন আবার আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয়। নইলে তাকে যেন পথের মাঝে ধরে তার হাড়গোড় চূর্ণ করে দেওয়া হয়।'

পরে পত্রসুদ্ধ বুমের বন্ধু ধরা পড়ে। চিঠির কথা জানাজানি হয়ে যায়।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, বুম রজার্সকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারে বুম আরও নামজাদা হয়ে উঠল, অপরাধী মহলে তার খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নেই। একুশ বৎসরে পা দিতে না দিতেই সে হয়ে দাঁড়িয়েছে গুণ্ডাদের সর্দার।

বালক মুর, বয়স মোটে বারো। সমবয়সি এক বন্ধুর সঙ্গে পথ দিয়ে যাচ্ছে।

অন্য দিক দিয়ে আসছে বুম, বুক ফুলিয়ে, সদম্ভে। মুরের সামনা-সামনি এসেই সে তাকে আর তার বন্ধুকে মারলে বিষম এক ধাক্কা। দুই বালকই পথের একপাশে ছিটকে গিয়ে পড়ল এবং মুরের বন্ধু হল রীতিমতো আহত।

বিনা কারণে এই আক্রমণের জন্যে তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না। মুর একলাফে উঠে দাঁড়ালেন—হাতে তাঁর দুধের বোতল। চিৎকার করে বললেন, 'ওরে ভাড়াটে গুণ্ডা, ওরে ধুমসো বদমাইস! আমাদের মতো ছেলে-ছোকরার সঙ্গে লাগতে এসেছিস কেন, নিজের বয়সি লোকের সঙ্গে লড়তে পারিস না?'

পুঁচকে এক ছোকরার মুখে এই কথা শুনে বুম মহা খাপ্পা হয়ে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে এল যমের মতো।

মুর অটল। ফস করে হাত তুলে সে দুধ ভরা বোতলটা সজোরে ছুড়ে মারলে বুমের মাথা টিপ করে।

বুম ধাঁ করে বসে পড়ে বোতলটা কোনও রকমে এড়াল এবং তারপর চোখে পলক পড়বার আগেই সেখান থেকে টেনে লম্বা দিলে সভয়ে। বোতলটা পাশের এক দোকান ঘরের উপর পড়ে চুরমার করে দিলে কাচের জানলা।

বারো বছর বয়সেই মুর একটা মস্ত শিক্ষা লাভ করলেন। গুণ্ডারা মুখে যতই তর্জন গর্জন করুক, মনে মনে তারা কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইদিন থেকে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রইল বিজাতীয় ঘৃণা।

পুত্রের কীর্তিকাহিনি শুনে পিতার দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত। একরত্তি হেরল্ডের ভয়ে ভয়াবহ গুণ্ডাসর্দার পলাতক! সারা শহরেও হই-চই পড়ে গেল।

পিতা তখন বুঝলেন, এমন ছেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাধা দেওয়া উচিত নয়। বললেন, 'বাছা হেরল্ড, সত্যিই তুমি যদি পুলিশে ঢুকতে চাও তাহলে তোমার হাতের লক্ষ্য স্থির করো। আমি তোমাকে বন্দুক আর রিভলভার কিনে দিচ্ছি।'

তার পরদিন থেকে প্রত্যহ মুর একমনে বন্দুক ও রিভলভার ছোড়ায় হাত পাকাতে লাগলেন।

মুরের পিতার মৃত্যু হল।

একুশ বৎসর বয়সের আগে আমেরিকায় কেউ পুলিশের চাকরি নিতে পারে না। মুরের বয়স এখন ষোলো বৎসর। একুশ হতে অনেক দেরি, এর মধ্যে কী করা যায়!

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে বাধে। মুর গেলেন ফৌজের কর্তাদের কাছে, তিনি সেনাদলে ভরতি হতে চান।

জিজ্ঞাসা হল, 'উনিশ বৎসর বয়স না হলে কারুকে ফৌজে নেওয়া হয় না। তোমার বয়স কত?'

মুর বয়স ভাঁড়ালেন। বললেন, 'উনিশ বৎসর।'

তিনি সেনাদলে ভরতি হলেন। আগ্নেয়াস্ত্রে তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্য দেখে উপরওয়ালা অত্যন্ত খুশি।

কিন্তু ফৌজেও তাঁর চাকরি স্থায়ী হল না, কারণ মুরের বয়স যে উনিশ নয়, এ কথাটা ধরা পড়ে গেল।

আঠারো বৎসর বয়সে মুরকে আবার ঘরে ফিরে আসতে হল।

॥ দ্বিতীয় ॥

রিভলভার যুদ্ধ

কিছুকাল যায়। মুরের বয়স একুশ বৎসর পার হয়েছে।

আশান্বিত চিত্তে পুলিশ বাহিনীতে ঢোকবার জন্যে তিনি দরখাস্ত করলেন এবং মঞ্জুর হল তাঁর দরখাস্ত। কিন্তু তার পরেই হতাশভাবে শুনলেন, অন্তত মাথায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি না হলে আমেরিকার পুলিশ বাহিনীতে কেউ যোগ দিতে পারে না। তাঁর নিজের মাথার উচ্চতা ছিল মোটে পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি।

কিন্তু তবু তিনি একেবারে হাল ছাড়লেন না। তাঁর দৈহিক পরীক্ষা নেওয়া হবে আরও

মাস কয়েক পরে। ইতিমধ্যে কেমন করে দেহের উচ্চতা বাড়ানো যায়, তাই নিয়ে তিনি ডাক্তার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের কথামতো প্রত্যহ উপযোগী ব্যায়াম চর্চায় নিযুক্ত হলেন।

পরীক্ষার ঠিক আগের দিন রাত্রিটা কাটালেন তিনি 'তুর্কি স্নানাগারে' (Turkish Bath) গিয়ে। সেখানে চলল সারারাত ধরে গাত্র মর্দন।

একটা সত্য অনেকেই জানে না যে, প্রত্যেক মানুষ সকালে যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে তখন সে থাকে মাথায় অপেক্ষাকৃত লম্বা। তারপর বেলা যত বাড়ে মানুষের দেহ ততই সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

শয্যা ত্যাগ করেই একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে মুর তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হলেন যথাস্থানে। তাঁর দেহের মাপ নেওয়া হল। দেখা গেল তাঁর মাথার উচ্চতা ঠিক পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মুরকে পুলিশের ইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যথাসময়ে সমাপ্ত হল তাঁর শিক্ষাকাল। শিক্ষকরা এমন উচ্চশ্রেণির প্রশংসাপত্র দিলেন যে, সর্বপ্রথমেই তাঁকে সাধারণ পাহারাওয়ালার কাজ করতে হল না—আর সকলকেই যা করতে হয়। বিনা ইউনিফর্মে সাদা পোশাকে তাঁকে বদমাইস ও জুয়াড়িদের উপরে নজর রাখতে বলা হল। এতদিন পরে মুর উঠিলেন তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রথম ধাপে।

অধিকাংশ পুলিশ কর্মচারীদের চেয়েই মুর ছিলেন মাথায় খাটো। বাহির থেকেও তাঁকে গুণ্ডার মতন দেখাত না। তিনি যখন সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়াতেন তখন তাঁকে পুলিশের লোক বলে চেনাই যেত না। ফলে মাস দুই যেতে না যেতেই তিনি অনেকগুলো নতুন ও পুরাতন পাপীকে গ্রেপ্তার করে ফেললেন।

তাঁর উপরে নেকনজর পড়ল উপরওয়ালাদের। মেয়র হাইলান তাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'তুমি জুয়াখানার সর্দার আর্নল্ড রোদস্টিনের নাম শুনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি।'

'আজ থেকে কেবল রোদস্টিনের উপরে নজর রাখা ছাড়া তোমাকে আর কোনও কাজ করতে হবে না। যা দেখবে শুনবে, সরাসরি আমার কাছে এসে বলবে।'

কুবিখ্যাত আর্নল্ড রোদস্টিন। বাইরে সে বিশিষ্ট ভদ্র ও শৌখিন লোকের মতো জীবন যাপন করত। রোলস রয়েস গাড়িতে চড়ে স্ত্রীকে নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় বেড়াত এবং প্রত্যহই গিয়ে হাজিরা দিত বিখ্যাত লিন্ডরির রেস্তোরাঁয়—যেখানে এসে জনতা সৃষ্টি করত নামজাদা নট-নটী, সাংবাদিক ও জুয়াড়িরা।

থিয়েটার পাড়ার একটি হোটেলে গিয়ে ঘর ভাড়া নিলেন মুর। তাঁর চালচলন ও ধরন-ধারণ দেখে সবাই ধরে নিলে তিনি এক বিলাসী যুবক—জুয়া খেলতে ও অকাতরে টাকা খরচ করতে ভালোবাসেন।

মুর উপর-উপরি পঁয়তাল্লিশ রাত্রি ধরে ঘুরলেন রোদস্টিনের পিছনে পিছনে। লিন্ডরির রেস্তোরাঁয় গিয়ে তিনি জর্জ ম্যাকম্যানাস, নিগার নেট, রেমন্ড, হাইম্যান বিলার ও নিক দি গ্রিক প্রভৃতি জুয়াখানার দলপতির সঙ্গে পরিচিত হলেন। রোদস্টিনকেও তাদের সঙ্গে দেখলেন।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। সুচতুর রোদস্টিন তাদের সর্বেসর্বা হয়েও নিজে কোনওদিন কোনও জুয়াখানার চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াত না। সে থাকত আড়ালে আড়ালে সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ম্যাকম্যানাসও ছিল একজন প্রধান লোক। সে মুরকে সত্যিকার জুয়াড়ি বলে ধরে নিয়েছিল! তাই কবে কোন ঠিকানায় জুয়ার আড্ডা বসবে, আগে থাকতেই সেটা তাঁকে জানিয়ে রাখত। পুলিশের ভয়ে আড্ডার স্থান পরিবর্তন করা হত প্রতিদিনই।

কিন্তু তবু প্রায় প্রতিদিনই আড্ডার উপরে এসে পুলিশ হানা দেয়। দলে দলে জুয়াড়ি ধরা পড়ে। জুয়াখানার বড়োকর্তারা দস্তুরমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কেমন করে পুলিশ আড্ডাধারীদের নিত্যনতুন আড্ডা আবিষ্কার করে মুর জানেন সে-সব গুপ্তকথা।

কিন্তু বেশিদিন আর গুপ্তকথা অব্যক্ত রইল না।

এক সকালে মুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সামনের একটি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল রোদস্টিন।

সে হনহন করে এগিয়ে এসে বললে, 'তুমি হচ্ছ হেরল্ড মুর—পুলিশের বিশেষ কর্মচারী!'

মুর শুধালেন, 'কে বললে এ কথা?'

রোদস্টিন বললে, 'লুকোবার চেষ্টা কোরো না, আমি পাকা খবর পেয়েছি। তোমার পুলিশ ব্যাজের নম্বর পর্যন্ত আমি জানি। তুমি আমাকে অনেক দিন ধরে বোকা বানিয়ে আসছ বটে, কিন্তু যে-ব্যক্তি তোমাকে আমার পিছনে পাঠিয়েছে তাকে গিয়ে বলে এসো, পুলিশকে আমি থোড়াই কেয়ার করি!'

মুর পালটা জবাব দিলেন, 'পুলিশকে তুমি তো ভয় করো না, তবু সর্বদা এত ভয়ে ভয়ে থাক কেন?'

'ভয়ে ভয়ে থাকি?'

হ্যাঁ। কখনও কোনও খোলা জানলার সামনে দাঁড়াও না, সর্বদাই থাকো নিরেট দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে।'

'ঠিক। আমার ব্যবসায়ে পদে পদে শত্রু-ভয়। কে যে কখন আমাকে বধ করবার চেষ্টা করবে, তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই।'

কয়েক বৎসর পরেই সফল হয়েছিল রোদস্টিনের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী। একটি হোটেলের ভিতরে কে তাকে হত্যা করে যায় এবং হত্যাকারী ধরা পড়েনি।

আপাতত জুয়াখানার লীলাখেলা শেষ। তল্পিতল্পা গুছিয়ে মুর ফিরে গেলেন আবার মেয়র হাইলানের কাছে। আবার আরম্ভ হল নতুন পরিচ্ছেদ।

পুলিশে যোগ দেবার এক বৎসর পরেই ডাকাতদের সঙ্গে মুরকে লড়াই করতে হয়।

এক জায়গায় হানা দিতে এসে দুজন ডাকাত পুলিশ দেখে পলায়ন করছিল। ডাকাতদের মোটরের সঙ্গে ছুটছে পুলিশের মোটর। দুজন পুলিশ কর্মচারী করছে গুলিবৃষ্টি এবং একজন ডাকাতের রিভলভারও করছে ঘন ঘন অগ্নি উদ্‌গার।

মুরের সেদিন কোনও কর্তব্যই নেই, তিনি ছুটিতে আছেন, পরের হাঙ্গামায় তিনি যোগ

না দিলেও পারতেন; কিন্তু ব্যাপার দেখে তাঁর চড়ুকে পিঠ যেন সড়সড় করে উঠল। নিজের মোটর সাইকেল চড়ে তিনিও করলেন ডাকাতদের অনুসরণ।

ডাকাত দুজন আচমকা গাড়ি থামিয়ে একখানা বড়ো বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। পুলিশ কর্মচারীরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সেই বাড়িতে ঢুকল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

মোটর সাইকেল থামিয়েই মুর শুনতে পেলেন বাড়ির ভিতর থেকে আসছে ঘন ঘন রিভলভারের আওয়াজ।

কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই মুর বাড়ির দিকে গিয়ে দেখলেন, পুলিশ কর্মচারীরা রক্তাক্ত দেহে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে আসছে, তারা দুজনেই আহত।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, সিঁড়ি দিয়ে দুই ডাকাত উপরে উঠছে দ্রুতপদে। তিনিও অবলম্বন করলেন সোপান শ্রেণি।

লম্বা সিঁড়ি। ডাকাতরা প্রত্যেক বাঁকের মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে মুরের দিকে রিভলভার ছোড়ে এবং ব্যর্থ হয়। মুরও রিভলভার ছুড়লেন পর পর চারবার। সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ থেকে ডাকাতরা ছাদে গিয়ে উঠল।

মুরও ছাদে গিয়ে দেখলেন ডাকাতরা তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছে। তাদের একজন ছিল চিমনির আড়ালে লুকিয়ে এবং আর একজন ছিল একটা জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কিন্তু মুরের পিছন দিকে একটা আলোর আভাস ছিল বলে ডাকাতরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল। তারা উপর্যুপরি গুলিবৃষ্টি করতে লাগল।

একটা বুলেট লেগে উড়ে গেল তাঁর মাথার টুপি। আর একটা বুলেট এসে লাগল তাঁর বুকের উপরে। তাঁর মৃত্যু ছিল নিশ্চিত, কিন্তু সহায় হল দৈব। তাঁর বুক পকেটে ছিল একখানা স্মারক পুস্তক, বুলেটটা এসে তার মাঝামাঝি পর্যন্ত ভেদ করে থেমে গেল, তাই রক্ষা। কিন্তু সেই বুলেটের ধাক্কা যেই তাঁর দেহকে দিল ঘুরিয়ে অমনি আর একটা গুলি এসে তাঁর পেটে লিভার ভেদ করলে।

মুর সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত। সেই অবস্থায় কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি আলোকরেখার বাহিরে এসে পড়লেন। ডাকাতরা তাঁকে আর ভালো করে দেখতে না পেয়েও গুলির পর গুলি চালাতে লাগল।

মুরের রিভলভারে অবশিষ্ট আছে মাত্র দুটি গুলি। সঙ্গিন মুহূর্ত!

ডাকাতরা নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য, কিন্তু তিমির পটে ফুটে উঠছে তাদের একজনের সশব্দ রিভলভারের আগুনের ছটা।

সেই আগুনের দীপ্তি লক্ষ করে মুর উপর-উপরি দু-বার গুলি ছুড়ে নিজের রিভলভার খালি করে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন একজনের আর্তনাদ।

অন্য ডাকাতটা আবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে পালাবার জন্যে মুরের দেহের উপর দিয়ে মারলে এক লাফ। গুলিশূন্য রিভলভারটা ফেলে দিয়ে মুর হাত বাড়িয়ে তার একখানা পা ধরে ফেললেন—ডাকাত যে সশস্ত্র তা জেনেও।

ডাকাতটা আবার দু-বার গুলি ছুড়লে। তার প্রথম গুলি বিদ্ধ করল মুরের একখানা হাতের কবজি এবং দ্বিতীয় গুলিটা হল লক্ষ্যভ্রষ্ট। কিন্তু ডাকাতটা তবু পালাতে পারলে না।

গোলমাল শুনে তখন আরও অনেক পুলিশের লোক এসে পড়েছে, সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতেই ধরা পড়ে গেল।

মুর তখনও খালি রিভলভারটা হাতছাড়া করেননি বটে, কিন্তু তাঁর জ্ঞান আছে কি নেই।

জলের ট্যাঙ্কের পিছনে অন্য ডাকাতটাও বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল। তার একটা চোখ কাচের, মুরের গুলিতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ। আর একটা গুলি লেগেছে ঠিক তার কাঁধের উপরে। মুরের আন্দাজে ছোড়া শেষ গুলিদুটোও ব্যর্থ হয়নি। ডাকাতটা মরেনি, বিচারে তার উপরে ত্রিশ বৎসর জেল খাটবার হুকুম হয়।

ঘটনাস্থলের ঠিক পাশের বাড়িতে ছিল একটা হাসপাতাল। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শুনে সেখানকার ডাক্তার ও ধাত্রী বা রুগ্ন সেবিকার দল কৌতূহলী হয়ে ছাদের উপরে উঠে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি তরুণী ও সুন্দরী রুগ্ন সেবিকার নাম হেলেন হোগান, তাঁর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের সামনে জেগে উঠেছিল যেন চিত্তোত্তেজক চিত্রনাট্যের একটি রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

সেই হাসপাতালেই তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করা হল মুরের প্রায় অচেতন দেহ। ডাক্তাররা মত প্রকাশ করলেন, রোগীর জীবনের আশা নেই বললেই হয়। হেলেনের উপরে ন্যস্ত হল তাঁর সেবা-সুশ্রূষার ভার।

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা হেলেন বসে থাকেন আহত মুরের বিছানা। পাশে, তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় তিনি যেন বীর-পূজা করছেন। তারপর ডাক্তার বললেন, মুরের আর জীবনের আশঙ্কা নেই।

হাতপাতালে মুরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন মেয়র ও পুলিশ কমিশনার প্রভৃতি। অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাঁর পদোন্নতি হল।

তারপর জানা গেল, মুর ও হেলেন পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। হাসপাতালে গিয়ে মুর কেবল পুনর্জীবন লাভই করলেন না, সেইসঙ্গে লাভ করলেন জীবনসঙ্গিনী।

॥ তৃতীয় ॥

৪৮ নম্বরের রহস্য

যে-সময়ের কথা বলছি, আমেরিকায় তখন গুণ্ডাদের রাজত্ব উঠছিল চরমে।

সেখানে গুণ্ডা ছিল নানা শ্রেণির। কোনও কোনও গুণ্ডা মানুষ চুরি করত এবং তারপর প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তি দিত। টাকা না পেলে তারা বন্দিদের মেরে ফেলতে ইতস্তত করত না। বিখ্যাত বৈমানিক লিন্ড বার্গের শিশু-পুত্র এইভাবেই গুণ্ডাদের হাতে পড়েছিল। সেই ঘটনায় সারা আমেরিকার লোক এমন খেপে উঠেছিল যে, সত্যিকার বাপ-মার সঙ্গে ছেলেপুলেকে দেখলেও তারা সন্দেহ করত। ওই শ্রেণির মানুষ-চুরির সংখ্যা এখন

বোধহয় অনেকটা কমে এসেছে, কারণ ও-রকম ঘটনার কথা আর বেশি শোনা যায় না।

অন্যান্য সাধারণ ডাকাত ও গুণ্ডাদের সঙ্গে তখন আর একদল লোক আমেরিকানদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তারা গোপনে চড়া দামে নিষিদ্ধ জিনিস বিক্রয় করত। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে এমন বেড়ে ওঠে যে, তারা বেসরকারি ফৌজ রাখত তো বটেই, তার উপর তাদের অধীনে থাকত মেশিনগান ও লৌহবর্মাবৃত গাড়ি পর্যন্ত। পুলিশবাহিনী তাদের ধরতে গেলে প্রকাশ্য রাজপথের উপরে তারা লড়াই করতে ছাড়ত না—অনেক সময়েই এইরকম হাঙ্গামায় দলে দলে নিরীহ ও নিরপরাধ পথিকদেরও প্রাণ হারাতে হত।

তোমরা জানো, ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক নির্বাচনের সময়ে মাঝে মাঝে কোনও কোনও জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। অনেক সময় গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে প্রতিপক্ষদের বশীভূত করবার চেষ্টা চলে।

আমেরিকার অসাধু রাজনৈতিকরাও বড়ো বড়ো গুণ্ডাসর্দারদের পুষতেন প্রচুর মাহিনা দিয়ে। নির্বাচনের সময়ে তারা তাঁদের কাজে লাগত। তাঁদের কাছে আশকারা পেয়ে গুণ্ডাদের আস্পর্ধাও অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। রাহাজানি বা হত্যা প্রভৃতি অপরাধের জন্যে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেও ধরে রাখতে পারত না। প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিকরা নিজেদের দলভুক্ত গুণ্ডাদের পক্ষ নিয়ে আড়াল থেকে এমন কলকাঠি নাড়তেন যে, আইনের নাগপাশকে ফাঁকি দিয়ে তারা বেরিয়ে আসতে পারত অনায়াসেই। এক সময়ে অল ক্যাপন নামে এক গুণ্ডাসর্দার পৃথিবী বিখ্যাত নাম কিনেছিল। সে রীতিমতো টাকার পাহাড়ের উপর বসে থাকত এবং থিয়েটারে, সিনেমায়, শৌখিন হোটেলে ও ঘোড়দৌড়ের মাঠে প্রকাশ্যভাবে সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে আনাগোনা করত, পুলিশ তার কিছু করতে পারত না।

কিন্তু আজ হাওয়া কিছু বদলেছে। কয়েকজনের চেষ্টায় অসাধু রাজনৈতিকদের বিষ দাঁত ভেঙে গিয়েছে, গুণ্ডাদের আশ্রয়দাতা কোনও কোনও রাজনীতিজ্ঞকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। অল ক্যাপন ও আরও কয়েকজন শক্তিশালী গুণ্ডাসর্দারও আজ জেলের ভিতরে বাস করছে।

মুর এখন দ্বিতীয় শ্রেণির গোয়েন্দা রূপ পরিচিত। এত অল্পকালের মধ্যে এমন পদোন্নতি খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। তাঁর জন্যে কার্যক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হল নিউ ইয়র্কের পশ্চিম অঞ্চল। এদিকটা তখন গুণ্ডাদের আড্ডার জন্যে অতিশয় কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। বহু নামজাদা গুণ্ডা তখন ভদ্রলোকের পোশাক পরে বাস করে ভদ্র পল্লির ভিতরে।

সেটা হচ্ছে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ। গুণ্ডা ও চোরা কারবারিদের তখন দুর্দান্ত প্রতাপ। ওলন্দাজ সালটজ ও ওনি ম্যাডেন প্রভৃতি দলপতিরা কেবল জনসাধারণের উপরেই অত্যাচার করে না, শহরে সর্বেসর্বা হবার জন্যে তারা যখন তখন পরস্পরের সঙ্গেও করে মারাত্মক মারামারি।

পরে যারা ভয়াবহ গুণ্ডা ও ঠগী হয়ে দাঁড়িয়েছে, ছেলেবেলায় মুর খেলা করেছে তাদের অনেকেরই সঙ্গে। যেমন, ভিনসেন্ট কল ও ফ্যাটস ম্যাকার্থি। তারা এখন সর্দার ওলন্দাজ সালটজ-এর দলের হোমরাচোমরা ব্যক্তি। ইতিপূর্বে যে বুম রজার্সের কথা

বলেছি, তার আসনে বসেছে এখন ফ্যাটস ম্যাকার্থি এবং তার নিজস্ব দলের নাম 'কার বার্নস গ্যাং'।

মুরের চেয়ে সে বয়সে তিন বছরের ছোটো। মুর পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে শুনে মাকার্থি বিরক্ত হয়ে বন্ধুদের ডেকে বলেছিল, 'দেখ, আমাদের আর এক স্যাঙাত গোল্লার দোরে গেল!'

দু-চার দিন যেতে না যেতেই গুণ্ডার দল বুঝে নিলে মুর হচ্ছেন এক অসম্ভব ব্যক্তি। তিনি ঘুসও নেন না, চেনা-অচেনা কোনও গুণ্ডাকে ক্ষমাও করেন না। তাঁর হাতে পড়লে কারুর আর রক্ষা নেই, তাকে থানায় যেতেই হবে। অনেককেই মুর গ্রেপ্তার করলেন বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। রাজনীতিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের কেবল মুক্তিই দিলেন না, অকারণে লোককে হয়রান করছে বলে উলটে ধমকে দিলেন পুলিশ কর্মচারীকেই।

মাস কয় পরেই মুরকে আবার রিভলভার যুদ্ধ করতে হল তিনজন ডাকাতের সঙ্গে।

সেবারেও মুর ছুটিতে আছেন। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলেন, একখানা বন্ধকি দোকানের সামনে তিনজন লোক ঘুর ঘুর করছে। তাঁর সতর্ক দৃষ্টি তখনই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন তাদের হালচাল।

ফিস ফিস করে কী পরামর্শ করলে তারা তিনজনে। তারপর দুজন লোক বন্ধকি দোকানের সামনে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল এবং তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করলে দোকানের ভিতরে। মুরও গেলেন তার পিছনে পিছনে।

দোকানের মধ্যে গিয়েই লোকটা বার করলে এক রিভলভার, কিন্তু সে ঘোড়া টেপবার আগেই মুর তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাঘের মতো। তারপর চলল এক বিষম ধস্তাধস্তি—কখনও সে উপরে আর মুর নীচে, আর কখনও মুর উপরে আর সে নীচে। এইভাবে জড়াজড়ি করে দুজনেরই দেহ গিয়ে পড়ল রাস্তার উপরে।

পথের উপরে যে-দুজন ডাকাত ছিল তারাও রিভলভার বার করে ছুটে এল। একজন রিভলভারের বাঁট সজোরে মাথার উপরে আঘাত করলে এবং মুর অভিভূতের মতো হয়ে পড়তেই তৃতীয় ডাকাতটা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টেনে লম্বা।

কিন্তু নাছোড়বান্দা মুর তৎক্ষণাৎ কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার হলেন তার পিছনে ধাবমান।

খানিক তফাতে রয়েছে একটা সেকেলে জড়োয়া গহনার দোকান, তার সামনে পথের উপরেই ছিল একটা 'শো-কেস' বা চারদিকে কাচ বসানো বৃহৎ কাষ্ঠাধার। ডাকাতটা তার পিছনে গিয়েই রিভলভার ছুড়লে, গুলিটা সোঁ করে চলে গেল মুরের কপালের উপরে রক্তাক্ত আঁচড় কেটে।

তারপরেই দেখা গেল যেন একটা প্রহসনের দৃশ্য—যদিও তার মধ্যে হাস্যকর ছিল না কিছুই। দুজনে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ক্রমাগত সেই কাষ্ঠাধারটাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। ডাকাতটার মুখের উপরে মুর গুলি ছুড়লেন এবং শত্রুর আর একটা গুলি খেয়ে মুরও হলেন ধরাশয়ী। সেই ফাঁকে ডাকাত দিল চম্পট।

তিন মাস পরে পুলিশ সন্দেহক্রমে একটা লোককে গ্রেপ্তার করলে,—তার মুখের উপরে ছিল টাটকা বুলেটের দাগ।

তাকে দেখেই মুর বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এই লোকটাই বন্ধকি দোকানের উপরে হানা দিতে গিয়েছিল!'

ডাকাতের মুখে শোনা গেল, তার জীবনের কোনও আশাই ছিল না, অনেক কষ্টে সে এযাত্রা রক্ষা পেয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তা থেকে তাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মুরের নিক্ষিপ্ত গুলি তার গণ্ডদেশ ভেদ করে মুখের ভিতর গিয়ে পড়ে এবং ফলে তার সামনের পাটির কয়েকটা দাঁত ভেঙে উড়ে যায়।

মুর ছিলেন সব দিক দিয়ে চৌকশ গোয়েন্দা। তিনি যে কেবল মারামারি ও রিভলভার ব্যবহারেই দক্ষ ছিলেন তা নয়, হঠাৎ দেখলে যে-সব সূত্রকে তুচ্ছ বলে মনে হয়, তাই অবলম্বন করেই অনেক সময়ে জটিল মামলারও কিনারা করতে পারতেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই:

একবার এক রত্ন ব্যবসায়ীর দোকানে হানা দেয় তিনজন সশস্ত্র ডাকাত। দুজন ডাকাত দোকানের মালিককে ভিতর দিকে নিয়ে যায়। তৃতীয় ডাকাতটা টুপি ও কোট খুলে ফেলে দোকানের কর্মচারী সেজে খানাতল্লাশ করতে থাকে।

একজন খরিদ্দার এসে জানায়, 'আমার একটা আংটি চাই।'

জাল দোকানি বাক্সভরা একরাশি নানা শ্রেণির আংটি এনে বলে, 'প্রত্যেক আংটিরই দাম সাড়ে সতেরো টাকা। গুদাম সাবাড়ের জন্যে আজ এখানে বিশেষ নীলাম!'

খরিদ্দার এই অভাবিত সৌভাগ্যে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে। বিলম্ব হচ্ছে দেখে অধীর হয়ে ডাকাতটা রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে খরিদ্দারকে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর তাড়াতাড়ি প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা লুণ্ঠন করে সরে পড়ে।

খবর পেয়ে মুর ও অন্যান্য গোয়েন্দারা এসে হাজির।

খরিদ্দার বললে, 'যে-ডাকাতটা আমাকে মেরেছে তার টুপি আর কোট ছিল না।

মুর তখনই দোকানের আনাচে কানাচে খানাতল্লাশ শুরু করে দিলেন।

দোকানদার অধির কণ্ঠে বললে, 'ডাকাতরা এখানে লুকিয়ে নেই। তারা ওই দরজা দিয়ে সরে পড়েছে।'

মুর আমলেও আনলেন না দোকানির কথা। তিনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন এবং আন্দাজ করেছিলেন যে, ডাকাতটা তাড়াতাড়িতে নিশ্চয় টুপি ও জামা নিয়ে পালাতে পারেনি। তাঁর সন্দেহ সত্যে পরিণত হল একটু পরেই। পরিত্যক্ত টুপি ও কোট পাওয়া গেল।

কোটের পকেটে ছিল একটুখানি কাগজের টুকরো। তার উপরে খালি এইটুকু লেখা: '৪৮ নম্বর সি ৭৮৩৪ কে ডাকবে।'

মুরের সঙ্গী গোয়েন্দারা বললে, 'এ হচ্ছে চোর-ডাকাতদের সাঙ্কেতিক কথা।'

মুরের ধারণা অন্যরকম। তিনি স্থির করলেন, সি ৭৮৩৪ হচ্ছে টেলিফোন নম্বর। ফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে নম্বরটা তিনি বার করলেন। বোঝা গেল, যে-বাড়িতে ওই নম্বরটা আছে তা ঘটনাস্থল থেকে বেশিদূর নয়। সে-বাড়িতে বাস করে এক নার্স, তরুণী ও সুন্দরী। মুর তাকে নিয়ে থানায় এলেন। টুপি ও কোটটা তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ দুটো জিনিস আর কখনও দেখেছ?'

নার্স বললে, 'উঁহু, মোটেই না।'

মুর হতাশ হলেন না। ৪৮ নম্বরের কথা চেপে গেলেন। যে-তারিখে দোকান লুট হয় সেই তারিখের সন্ধেবেলায় নার্স কোথায় ছিল তিনি তাই জানতে চাইলেন কথায় কথায়।

নার্স বললে, 'এক বন্ধুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছে। আমি তার সঙ্গে ছিলুম।'

'কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?'

'হোটেলে, সিনেমায়, একটি নাচের আসরে।'

প্রায় আধঘণ্টারও উপর এইভাবে কেটে গেল। নার্স বার বার সেই বন্ধুর আর হোটেলের আর সিনেমা প্রভৃতির গল্পই বলে।

মুরের সঙ্গী গোয়েন্দারা তো চটেই লাল! তারা তাঁকে আড়ালে নিয়ে বললে 'রক্ষা করো! এই মেয়েটা হচ্ছে বার বার শোনা গ্রামোফোনের রেকর্ডের চেয়েও অসহনীয়! এ বাজে আপদকে তুমিই এখানে এনেছ, এখন তুমিই একে বিদায় করে আমাদের শান্তি দাও!'

মুর হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, মেয়েটা যেন তোতাপাখির মতো ক্রমাগত মুখস্থ করা একই বুলি আউড়ে যাচ্ছে। সেইটেই তো সন্দেহজনক!'

নার্সের কাছে এসে তিনি যেন অন্যমনস্কের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বন্ধুটি বুঝি তোমার বাসার কাছেই থাকে?'

নার্স বললে, 'হতে পারে। কিন্তু আমি তার ঠিক ঠিকানা জানি না।'

মুর ভান করে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, 'তাহলে হঠাৎ দরকার পড়লে তুমি তাকে খবর দাও কেমন করে?'

নার্সের মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'কেন, এটা তো খুবই সোজা। আমার বন্ধু হোটেল বা ওইরকম কোনও জায়গায় বাস করে। ফোনে সেখানকার কেউ সাড়া দিলে আমি জানাই ৪৮ নম্বরকে ডেকে দিতে।'

হাসি মিলিয়ে গেল মুরের মুখে। অন্যান্য ডিটেকটিভরাও অবাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে নার্সের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণ পরে পরিষ্কার হয়ে গেল ৪৮ নম্বরের রহস্য।

মুর আবার সেই টুপি ও কোট বার করে কঠিন স্বরে বললেন, 'আর চালাকি কোরো না! বলো দেখি এখন এগুলো কার?'

অল্পক্ষণ পরেই নার্স কথা স্বীকার করে ফেললে। সে বললে, দোকান লুটের একটু পরেই তার বন্ধু তাকে ফোনে ডেকে বলে যে, যদি আমি ধরা পড়ি তাহলে আমাকে alibi (মিথ্যা-স্থানান্তরের স্থিতি) প্রমাণিত করে আইনকে ফাঁকি দিতে হবে। পুলিশ তোমাকে প্রশ্ন করলে তুমি বলবে যে ঘটনার সময়ে আমি তোমার সঙ্গেই ছিলুম।'

নার্স আসলে নার্স নয়, ডাকাতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল।

বলা বাহুল্য, বামালসুদ্ধ ডাকাতদের ধরা পড়তে বিলম্ব হল না।

॥ চতুর্থ ॥

ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে অভিযান

তিন বৎসরে পাঁচবার পদোন্নতি। মুরের এ সৌভাগ্য যে-কোনও গোয়েন্দার গর্বের বিষয় হতে পারে।

একবার এক জায়গায় ডাকাতরা লৌহবর্মাবৃত গাড়ির উপরে চড়াও হয়ে চৌদ্দ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়। মুরের সাহায্য না পেলে পুলিশ ডাকাতদের ধরতে পারত কি না সন্দেহ। এ মামলাটি আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে আছে।

আর একবার পুলিশ কিছুতেই একজন অপরাধীকে ধরতে পারছিল না। মুর তখন ছদ্মবেশ পরে চোর সেজে মিশলেন গিয়ে চোরের দলে। চোরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়েছিল এমন চমৎকার যে, পূর্বোক্ত অপরাধীকে তিনি তার আড্ডার ভিতর থেকেই গ্রেপ্তার করে আনেন।

টিন ম্যাকেভের জ্বালায় পুলিশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল—'আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ জালিয়াত।' তাকে ধরবার সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল তখন মুরের হাতে পড়ল ম্যাকেভের মামলা। অবিলম্বেই মুরের কাছে ম্যাকেভেকে হার মানতে হল। তার ব্যাগের ভিতরে পাওয়া গেল জালিয়াতির সবরকম যন্ত্র এবং পাঁচশো রকম কলমের নিব।

মুরের এমনি এত কীর্তি আছে যে, সবিস্তারে সে-সমস্ত বর্ণনা করা তো দূরের কথা, এখানে তার মোটামুটি তালিকা দেওয়াও সম্ভবপর নয়।

পুলিশে মুরের চাকরি যখন তিন বৎসর পূর্ণ হয়েছে, সেই সময়ে তাঁর পূর্বোক্ত বাল্যবন্ধু বা খেলার সাথি ভিনসেন্ট কল ও ফ্যাটস ম্যাকার্থিও ধাপে ধাপে উঠেছিল শয়তানির উচ্চ শিখরে। যে-কোনও দুষ্ট লোকের ভাড়াটে গুণ্ডা হয়ে তারা মানুষের পর মানুষ খুন করত অম্লান বদনে। ওলন্দাজ সালটজের কথা আগেই বলেছি। প্রথম কিছুকাল তারা ছিল তারই দলের লোক। কিন্তু তারপর সালটজের সঙ্গে ঝগড়া করে তারা নিজেদের আলাদা দল গঠন করে। তারপর আরম্ভ হয় দুই দলে মারামারি ও হানাহানি। কল ও ম্যাকার্থি প্রতিজ্ঞা করলে, 'সালটজের রক্তদর্শন না করে ছাড়ব না!' সালটজও প্রতিজ্ঞা করলে, 'শীঘ্রই তোমার যমের বাড়ির পথ খুলে দেব!'

সালটজের দলের একজন লোককে হত্যা করার অপরাধে ম্যাকার্থি একদিন দৈবগতিকে ধরা পড়ল মুরের হাতে। কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর অভাবে সে মামলা ফেঁসে গেল।

মাস কয়েক পরের ঘটনা। জোয় রাও নামে শত্রুপক্ষের এক গুণ্ডা পথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কল ও ম্যাকার্থি দ্রুতগামী মোটরে চড়ে মেশিনগান নিয়ে গুলিবৃষ্টি করতে করতে তার উপরে এসে পড়ল। সেখানে খেলা করছিল একদল খোকাখুকি। তিনজন শিশু তখনই মারা পড়ল। কল এবং ম্যাকার্থি অদৃশ্য।

তারপরেই শোনা গেল, ম্যাকার্থি একজন পাহারাওয়ালাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কল ও ম্যাকার্থিকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুলিশ তখন উঠে পড়ে লেগে গেল।

জন ব্রোডেরিক হচ্ছে পাহারাওয়ালা। পথ দিয়ে তিনজন লোক যাচ্ছিল, তাদের একজনকে

সে চিনতে পারলে। তার নাম ব্যাটাগলিয়া, বাল্যকালে তারা স্কুলে পড়েছে একসঙ্গে। কিন্তু কুসঙ্গে মিশে ব্যাটাগলিয়া এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্দান্ত গুণ্ডা।

ব্রোডেরিক তাদের পিছু নিলে। তারা কিছুদূর গিয়ে একখানা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। ব্রোডেরিক যথাস্থানে এসে উপরওয়ালাদের জানালে সেই খবর।

পুলিশের সন্দেহ হল ম্যাকার্থিও হয়তো ওই বাড়িতে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। তখন তিনজন গোয়েন্দা সেই বাড়ির দিকে ছুটল।

ব্রোডেরিককে সদর দরজার কাছে পাহারায় রেখে গোয়েন্দারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

বাড়িওয়ালি এসে শুধোলে, 'কে আপনারা?'

'চুপ, কোনও গোলমাল কোরো না! আমরা পুলিশের লোক।'

গোলমাল করবে না কী, প্রচণ্ড চিৎকারে বাড়িওয়ালী বলে উঠল, পুলিশ, পুলিশ। তোমরা এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন? এ হচ্ছে ভদ্রলোকের বাড়ি!'

সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তেতলার সিঁড়ির উপর থেকে একটা লোক উঁকি মারলে নীচের দিকে।

গোয়েন্দারা তখন বিনা বাক্যব্যয়ে মুখরা বাড়িওয়ালীকে ঠেলে পথ থেকে সরিয়ে টপাটপ সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল।

সর্বাগ্রে পেস্যাগ্নো নামে এক গোয়েন্দা। তেতলার যে-দরজা একটু আগে খুলে গিয়েছিল এখন তা বন্ধ। পেস্যাগ্নো করাঘাত করতেই আবার খুলে গেল দরজা এবং সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চার-চারটে গুলি ছুটে এসে ঢুকল তার বুকের ভিতরে। দ্বিতীয় গোয়েন্দাও বুকে দুটো গুলির আঘাত পেয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। একটা গুলি এসে তৃতীয় গোয়েন্দারও কণ্ঠভেদ করলে, সে-ও মাটিতে শুয়ে ছটফট করতে লাগল।

আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ শুনে ব্রোডেরিক দৌড়ে এসে দেখলে, একদল লোক পালিয়ে ছাদের উপরে উঠছে এবং সর্বশেষে রয়েছে তার স্কুলের বন্ধু ব্যাটাগলিয়া। তাকে লক্ষ্য করে সে রিভলভার ছুড়লে এবং ব্যাটাগলিয়াও ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে গুলিবৃষ্টি করলে বটে, কিন্তু উপর-উপরি ছ-বার আহত হবার পর সে ধরাশায়ী হয়ে ত্যাগ করলে অন্তিম নিশ্বাস।

আহত গোয়েন্দাদের তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠানো হল। ঘণ্টাচারেক পরে মারা পড়ল পেস্যাগ্নো। অন্য দুইজন গোয়েন্দার অবস্থাও গুরুতর।

এই ব্যাপারে পুলিশ-মহলে হুলস্থুল পড়ে গেল। পুলিশের বড়ো বড়ো কর্তারা ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে। জোর তদন্ত চলতে লাগল।

বাড়িওয়ালী সাফাই গাইলে, 'ওরা যে খুনে লোক আমি তা কেমন করে জানব বাপু? ঘরের ভিতরে কে কে ছিল তাও আমি জানি না।'

ব্রোডেরিক বললে, 'যারা ছাদে উঠে পালিয়ে গিয়েছে তাদের দিকে আমি নজর দেবার সময় পাইনি।'

ঘরের এক জায়গায় একজনের হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞেরা সেই ছাপের সঙ্গে পুলিশ-অফিসে রক্ষিত অপরাধীদের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখে বললে, 'এটা হচ্ছে ফ্যাটস ম্যাকার্থির হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ!'

এইবারে ঘটনাক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্যে মুর পেলেন আদেশপত্র। এবং তাঁর সহকারী হলেন গোয়েন্দা টমাস রিগ।

কমিশনার বললেন, 'ম্যাকার্থি যেন আমার আর কোনও গোয়েন্দার কেশস্পর্শও না করতে পারে। আজ থেকে তোমাদের আর কোনও কর্তব্য নেই। যেমন করেই হোক, তোমাদের ম্যাকার্থিকে ধরতেই হবে—এর জন্যে যদি তোমাদের বাকি জীবনটা কেটে যায়, তাও সই। ম্যাকার্থিকে আমি চাই-ই—হয় জীবিত, নয় মৃত!'

মুরকে নানা দিক দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত করা হল আরও শতশত গোয়েন্দা। আমেরিকার পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে এর চেয়ে বিখ্যাত মনুষ্য শিকারের কাহিনি আর পাওয়া যায় না।

এ খবরও শোনা গেল যে, পূর্বোক্ত ঘটনার সময়ে বাড়ির সেই ঘরের ভিতরে ছিল ম্যাকার্থি, তার স্ত্রী জিন এবং তার দলভুক্ত মাইক বেসিল, 'দাগিমুখ' চার্লি মুর ও নিহত ব্যাটাগলিয়া—এই পাঁচ জন। পুলিশের সাড়া পেয়েই নাকি দুই হাতে দুটো রিভলভার নিয়ে ম্যাকার্থি সদম্ভে বলে উঠেছিল, 'কোনও পুলিশেরই সাধ্য নেই আমাকে গ্রেপ্তার করে!'

মুর তোড়জোড় করে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন বটে, কিন্তু ম্যাকার্থি ও তার চিহ্ন তখন পৃথিবী থেকে যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

তাদের বদলে পাওয়া গেল 'দাগিমুখ' চার্লি মুরকে—গোয়েন্দা হত্যার দিন যে ছিল ম্যাকার্থির সঙ্গে।

সে কেবল একটুকু তথ্য প্রকাশ করলে যে, ডিটেকটিভ পেস্যাগ্নো মারা পড়েছে ম্যাকার্থিরই রিভলভারের গুলিতে। 'দাগিমুখ' চার্লিকে ছেড়ে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, মুর ভাবলেন যে, ছাড়া পেয়ে নিশ্চয়ই সে গোপনে তাদের সর্দার ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবে। তার গতিবিধির উপরে পুলিশের গুপ্তচররা কড়া নজর রাখলে। কিন্তু দাগিমুখ হাঁদা গঙ্গারাম নয়, নিজের বাসার ভিতরে সে 'নট নড়ন-চড়ন' হয়ে বসে রইল।

কল ও ম্যাকার্থিদের আত্মীয়স্বজনের উপরেও পুলিশ পাহারা রাখতে ভুললে না, তাদের টেলিফোনের সঙ্গেও পুলিশ গোপনে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করলে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ম্যাকার্থিদের কোনও পাত্তাই নেই।

আগেই বলা হয়েছে, ওলন্দাজ সালটজের দলের সঙ্গে কল ও ম্যাকার্থির দলের মারাত্মক ঝগড়া চলছিল। হঠাৎ একদিন খবর এল, সালটজের নিজস্ব গুণ্ডারা কল ও ম্যাকার্থির দলের উপরে হানা দিয়ে মেশিনগান চালিয়ে চারজন লোককে নিহত ও তিনজনকে আহত করে গিয়েছে। অল্পদিন পরেই ভিনসেন্ট কলও মারা পড়ল তাদের হাতে।

ম্যাকার্থির এখন অবস্থা 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ!' তার একদিকে গুণ্ডা বাহিনী আর একদিকে পুলিশ বাহিনী—যাকে বলে 'ঘরে পরে শত্রু' বা 'হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা।' সে আর অন্ধকার ছেড়ে আলোকে আসবার নামও করলে না।

মুর হাল ছাড়লেন না বটে, কিন্তু একে একে কেটে গেল ন-মাস—ম্যাকার্থি তখনও যবনিকার অন্তরালে।

কিন্তু তার পরেই যবনিকা উঠে গেল আচম্বিতে এবং যে-রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা হল এইবার সে কথাই বলছি।

॥ পঞ্চম ॥

খণ্ডযুদ্ধ

নয় মাস ধরে ছোটাছুটি ও খোঁজাখুঁজির ধাক্কা সামলেও মুর হাঁপিয়ে পড়েননি, আশা ছাড়েননি। তখনও তাঁর উৎসাহ এমন তরুণ যে, কাকে কান নিয়ে গেছে শুনলেও তিনি দৌড় মারতে রাজি।

একজন এসে ভাসা ভাসা খবর দিলে যে, আলবানি জেলায় অমুক জায়গায় তিনজন লোককে দেখে তার ফ্যাটস ম্যাকার্থি, তার স্ত্রী জিন ও স্যাঙাত মাইক বেসিল বলে সন্দেহ হয়েছে।

মুর অমনি জাগ্রত। তাদের তিনজনের ফোটো দেখাতেই সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এরাই তো তারা!'

মুর বললেন, 'ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলো।'

সে বললে, 'একখানা মদের দোকান থেকে বেরিয়ে তারা মোটরে উঠে বসে। তারপর গাড়িখানা একটা চৌমাথায় মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

খবরদারকে নিয়ে দলবলের সঙ্গে মুর আলবানিতে ছুটতে দেরি করলেন না। কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল প্রায় পর্বতের মুষিকপ্রসবের মতো।

বড়ো বড়ো চারটে জনবহুল রাস্তা এসে মিশেছে সেই চৌমাথায়। গাড়ির পর গাড়ির ভিড়। সেখানে বিশেষ কোনও গাড়ির দিকে লক্ষ কেউ রাখে না।

সামনেই মস্ত একখানা মণিহারীর দোকান। মুরের সঙ্গী সার্জেন্ট রিলি বললে, 'সম্প্রতি ওই দোকানে চুরি হয়ে গিয়েছে।'

মুর বললেন, 'চলো, দোকানির সঙ্গে একটু আলাপ করে আসা যাক।'

দোকানে ঢুকে তিনি বললেন, 'যেসব চোর দোকানে দোকানে চুরি করে বেড়ায়, তাদের খোঁজেই আমি এখানে এসেছি।'

দোকানদার ভারী খুশি। আলাপ জমে উঠল চটপট।

মুর দোকানের কাউন্টারের উপরে খানকয়েক ফটো সাজিয়ে রেখে শুধোলেন, 'এদের মধ্যে কারুকে আপনি চেনেন কি?'

দোকানের মালিক বললে, 'হুঁ, তিনজনকে চিনি!'

'কোন তিনজন?'

মালিক ম্যাকার্থি, তার স্ত্রী জিন ও তার বন্ধু বেসিলের ফটোগুলো দেখিয়ে দিলে।

'তারা কীরকম জিনিস কেনে?'

'ঘরসংসারের জিনিস। তবে একটা বিষয় লক্ষ করেছি। তারা সিগারেট কেনে তিন-রকম।'

মুর সঙ্গী-গোয়েন্দাদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। অর্থ হচ্ছে এই, একজন লোক তিনরকম সিগারেট ব্যবহার করে না। খুব সম্ভব দলে পুরুষ আছে তিনজন।

দোকান থেকে বেরিয়ে মুর বললেন, 'বোধহয় এইবারে মাছ জালে পড়বে।'

স্থানীয় পাহারাওয়ালার কাছ থেকে জানা গেল, বড়ো রাজপথ থেকে বেরিয়ে কতকগুলো মেটে রাস্তা এদিক ওদিকে ছড়ানো খানকয়েক বাগানবাড়ির দিকে চলে গিয়েছে।

পরামর্শের পর স্থির হল, গোয়েন্দারা চিত্রকরের ছদ্মবেশ পরে ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বাগানবাড়িগুলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়াবেন—যেন পল্লিদৃশ্যের চিত্রাঙ্কনের জন্যে।

দিন-কয় ঘোরাঘুরির পর অন্যান্য বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নির্জন স্থানে অবস্থিত কয়েকখানা বাংলোর দিকে আকৃষ্ট হল গোয়েন্দাদের দৃষ্টি। তার মধ্যে দু-খানা বাংলো ছিল এমন উঁচু জমিতে যে তাদের ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে নজর রাখা চলে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত।

মুর সঙ্গীদের ডেকে বললেন, 'তোমরা এইখানেই অপেক্ষা করো। আপাতত আমি একলাই ওই বাংলো দু-খানার দিকে যাব। যদি ম্যাকার্থির সন্ধান পাই, ফিরে এসে খবর দেব।'

ঝোপঝাপের ভিতরে হামাগুড়ি দিতে দিতে মুর এগুতে লাগলেন বাংলো দু-খানার দিকে। তাঁর সঙ্গে ছিল তিনটে রিভলবার।

প্রায় চারশো ফুট এইভাবে অগ্রসর হবার পর তিনি শুনতে পেলেন, একখানা বাংলোর ভিতর থেকে নারী কণ্ঠে 'পপ' বলে কে যেন কাকে ডাকলে।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। এ যে জিনের গলা! পপ হচ্ছে তার স্বামী ম্যাকার্থির ডাকনাম।

মন তাঁর দুলে উঠল আনন্দে। খুব সাবধানে তিনি হামাগুড়ি দিতে লাগলেন।

তারপরেই চমকে উঠল তাঁর চোখ ও বুক।

একখানা বাংলোর একটা জানলায় পাহারা দিচ্ছে একজন লোক, তার হাঁটুর উপরে একটা বন্দুক। সে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকেই।

কেটে গেল এক, দুই, তিন মুহূর্ত। তারপরেই তিনি বুঝলেন, লোকটা তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে, তাঁকে দেখতে পায়নি। তাঁর বুকের স্পন্দন থামল। আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি আবার পিছু হটে বাড়ির অন্যদিকে যেতে লাগলেন।

আবার তাঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হল। একখানা মোটর সশব্দে বাংলোর সামনে এসে থামল। একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। খানিক পরে পুরুষটা আবার বেরিয়ে যে ঝোপের মধ্যে মুর লুকিয়েছিলেন আসতে লাগল সেইদিকেই। মুর রিভলভার তুলে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। কিন্তু সে দেখতে পেলে না। তারপর স্ত্রীলোকটাও বাইরে এল। তারা দুজনে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

মুর স্থির করলেন সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবেন। কিন্তু তার আগেই আবার একখানা মোটরগাড়ি এসে হাজির। বাইরে নামল মাইক বেসিল। ইঞ্জিন বন্ধ না করেই সে গেল বাড়ির ভিতরে। তারপর বাইরে এল স্বয়ং ম্যাকার্থি। গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করলে। তারপর কেটে গেল প্রায় আধ ঘণ্টা। মুর ঝোপ ছেড়ে বেরুতে পারেন না, কারণ কখনও ম্যাকার্থি, কখনও জিন এবং কখনও বা বেসিল একবার বাড়ির ভিতরে যায়, আবার বেরিয়ে আসে।

দু-চারটে কথার টুকরো ভেসে আসে। বোঝা যায় ম্যাকার্থি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এ-বাসা ছেড়ে সরে পড়বে অনতিবিলম্বেই। মুরের সঙ্গীরা আছে সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। তাদের খবর দিতে গেলে হয়তো খাঁচার ভিতরে আর পাখি খুঁজে পাওয়া যাবে না!

আবার এক নতুন বিপদের সম্ভাবনা। দুটি খোকা একটি বল নিয়ে খেলা করতে করতে আসছে মুরের ঝোপের দিকেই। যদি তারা দেখতে পায় তাঁকে!

তাই-ই হল শেষটা। আবার ম্যাকার্থির আবির্ভাব—মুরের কাছ থেকে সে আছে প্রায় ষাট ফুট তফাতে। হঠাৎ একটি খোকা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে দেখ, ঝোপের ভিতরে একটা মানুষ লুকিয়ে!'

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে ফিরে দাঁড়াল ম্যাকার্থি—হাতে তার রিভলভার প্রস্তুত।

এক লাফে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ে তার দিকে ছুটে গেলেন মুর।

ম্যাকার্থি রিভলভার ছুড়লে উপর-উপরি দু-বার এবং অব্যর্থ তার লক্ষ! একটা গুলি লাগল মুরের বাম হাতে ও আর একটা বিদ্ধ করলে বাম স্কন্ধ।

মুরেরও দুই হাতের দুটো রিভলভার একসঙ্গে বহন করতে লাগল তপ্ত বুলেট।

মুর পরে বলেছিলেন, 'সেই মুহূর্তের কথা স্পষ্ট হয়ে আছে আমার মনের ভিতরে। ম্যাকার্থির উপর হস্তার্পণ করবার জন্যে অতি আগ্রহে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম যে প্রথমটা বুঝতেই পারিনি যে আমিও রিভলভার ছুড়েছি।'

একটা গুলি বিদ্ধ করলে ম্যাকার্থির কণ্ঠদেশ, দ্বিতীয় গুলি লাগল গিয়ে তার বক্ষদেশে হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে, তৃতীয় গুলি প্রবেশ করল তার কপালের ভিতরে এবং চতুর্থ গুলি ভেঙে দিল তার একখানা হাত।

ম্যাকার্থি হেলে পড়ে টলতে টলতে কোনও রকমে মোটরগাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

মুর ঝড়ের মতো ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাড়ির উপরে, ছুড়লেন রিভলভার এবং এবারকার গুলি ম্যাকার্থির মস্তক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তার দেহের আধখানা গাড়ির বাইরে ঝুলে পড়ল। শেষ হল এতদিনের খোজাখুঁজি। ম্যাকার্থি মৃত।

কিন্তু সেইসঙ্গেই হল না যবনিকাপাত। চরম মুহূর্তের পরেও দেখা গেল আরও রক্তাক্ত নাটকীয় দৃশ্য।

বাড়ির ভিতরে ছিল বেসিল এবং জর্জ কেলি নামে আলবানির এক গুণ্ডা—বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল সেই-ই। তারা দুজনেই মুরের দিকে প্রেরণ করতে লাগল গুলির পর গুলি।

বেসিল ছিল বাড়ির দোতলায়, তার হাতে বন্দুক। আর কেলি ছিল মোটরগাড়ির আড়ালে লুকিয়ে। মুর ধরা পড়লেন তাদের দু-জনের মাঝখানে, তিনি একটুও দমলেন না কিন্তু।

ম্যাকার্থির বউ জিন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে গেল মুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটা গুলির মুখে।

জিন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাকে গুলি মেরেছে!' সে আবার বাড়ির ভিতরে ছুটে গেল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। বলা বাহুল্য, মুর তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েননি।

শত্রুপক্ষের একটা গুলি এসে লাগল মুরের ডান পায়ের একটা স্নায়ুর উপরে, সে পা হয়ে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো। আর একটা গুলি বিদ্ধ করলে তাঁর হাতের কবজি। আর একটা গুলি তাঁর পকেটের একখানা ছবির উপরে লেগে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এল। দুই দিক হতে এই সাঙ্ঘাতিক ও প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে মুর মাটির উপরে গড়াতে গড়াতে মোটরগাড়ির পিছনে গিয়ে পড়লেন।

প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে চলল এই অসম যুদ্ধ।

দূরে আগ্নেয়াস্ত্রের ঘন ঘন গর্জনে চমকিত হয়ে অন্যান্য গোয়েন্দারা ছুটে আসতে লাগল ঘটনাস্থলের দিকে। কিন্তু বেসিল ও কেলির গুলির চোটে প্রথমটা তাদেরও তফাতে সরে দাঁড়াতে হল।

তারপর তারাও যখন একসঙ্গে বাড়ির দিকে অশ্রান্ত গুলিবৃষ্টি করতে লাগল, বেসিল তখন দায়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

কেলি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সে-ও ধরা পড়ল। কেলিও আহত হয়েছিল মুরের গুলিতে।

মুরকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো হল। গুলির আঘাত লেগেছিল তাঁর দেহের তেরো জায়গায়। তবু তিনি অজ্ঞান বা নিস্তেজ হয়ে পড়েননি, হাসপাতালে গিয়েই তিনি বললেন, 'আগে আমি আমার স্ত্রীকে ফোন করব, নইলে সে বেচারীর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না।' তাঁর স্ত্রী ফোন পেয়েই ছুটে এলেন হাসপাতালে, স্বামীকে সেবা করবার জন্যে। ডাক্তাররা বহু চেষ্টা করেও মুরের দেহের ভিতর থেকে তিনটে গুলি বার করতে পারলেন না। সেগুলো আজও বাস করছে তাঁর দেহের ভিতরে।

বাড়ির ভিতরটা খানাতল্লাশ করে বোঝা গেল, পুলিশের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে যাতে দীর্ঘকাল ধরে বাধা দিতে পারে, ম্যাকার্থির দল সেজন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই ছিল। বিভিন্ন ঘর থেকে পাওয়া গেল বহু বন্দুক, রিভলভার ও গুলিবারুদের বাক্স। আর এক জায়গায় লুকানো ছিল নগদ দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা।

মুরের বীরত্বকাহিনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মতো। হাসপাতালে তাঁকে অভিনন্দন দিয়ে গেলেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিসেস ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, তখনও তিনি প্রেসিডেন্ট-পত্নী হননি, তখন তিনি ছিলেন নিউ ইয়র্কের গভর্নরের সহধর্মিণী।

মুর এক মাস হাসপাতালে বাস করে বেরিয়ে এলেন। তিনি উন্নীত হলেন প্রথম শ্রেণির ডিটেকটিভের পদে এবং লাভ করলেন দুর্লভ 'Medal of Honour'—আমেরিকার পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ পদক।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গুণ্ডা দলপতি ওলন্দাজ সালটজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

সালটজ বলে, 'মাকার্থি আলবানি থেকে আসছিল আমাকেই হত্যা করবার জন্যে। তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন বলে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দি।'

মুর সংক্ষেপে জবাব দেন, 'তোমার মতন লোকের ধন্যবাদে আমার প্রয়োজন নেই।'

* * *

পরিশিষ্ট। একটি করুণ দৃশ্য প্রমাণিত করবে, অপরাধের পরিণাম কেবল অকাল-মৃত্যুই নয়, অসীম দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণা।

দশ বৎসর পরের ঘটনা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত সিং-সিং জেলখানা। মুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একজন বন্দি। দেহে তার অকালবার্ধক্য, দুর্ভাগ্যের ভারে সে থরথর কম্পমান।

তাকে দেখে মুরের চিনি চিনি বলে মনে হল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন। তার উত্তর শুনে জানা গেল, সে মাইক বেসিল ছাড়া আর কেউ নয়।

আজ তার আকৃতি-প্রকৃতির ভিতর থেকে কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না আগেকার সেই নরহন্তা ও মহা দাম্ভিক দস্যু মাইক বেসিলকে।

সর্বশেষে বলে রাখি, মাইক বেসিল ও জর্জ কেলির উপরে পঁয়ত্রিশ বৎসরের কারাবাসের হুকুম হয়েছিল।

প্রথম বাঙালি সম্রাট

'প্রথম বাঙালি সম্রাট' আখ্যানটি 'হে ইতিহাস গল্প বলো' গ্রন্থের প্রথম আখ্যান। গ্রন্থটির প্রকাশক ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রা. লি.।

॥ এক ॥

শিরোনামা পড়ে তোমাদের অনেকেই হয়তো অবাক হবে। বাঙালি সম্রাট আবার কে?

এমন বিস্ময় নয় অহেতুক। প্রাচীন আর্যাবর্ত বাঙালিদের আভিজাত্য স্বীকার তো করত না বটেই, উপরন্তু তাদের মনে করত অনেকটা হরিজনেরই সামিল। বলত, বাংলা হচ্ছে পাখির দেশ, ওখানে গেলে জাত যায়।

ইংরেজরা শিখিয়েছে, বাঙালি হচ্ছে ভীরু, কাপুরুষ; ইস্কুলের ছেলেদের পড়িয়েছে, পুরানো বাংলার বীরত্বের বড়াই করবার কিছুই নেই, প্রভৃতি।

হালের ভারতে অবাঙালিদের মুখেও শুনি ওই ধরনের বুলি। অল্পদিন আগেও ভারতের গুজরাটি উপপ্রধানমন্ত্রী মুখ ফুটে বলতে লজ্জা পাননি,—বাঙালি খালি কাঁদতেই জানে! ভদ্রলোক বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন যে, ভারতে মুসলমানদের দাসত্ব সর্বপ্রথমে স্বীকার করে সিন্ধুর সঙ্গে গুজরাটই এবং তাঁর জীবনকালেই বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছেন সুভাষ, বাঘা যতীন, কানাই ও ক্ষুদিরাম প্রমুখ আগুনের দূতের দল।

এইসব কুৎসার হট্টগোলে হঠাৎ বাঙালি সম্রাটের নাম করলে প্রথমটা চমকে যেতে হয় বই কি!

কিন্তু কেবল একজন নন, বাঙালি সম্রাট ছিলেন একাধিক। তবে আজ আমি যাঁর কথা বলব, লিখিত ইতিহাসে তিনিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম। তাঁর নাম শশাঙ্ক। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁকে সম্রাট বলেই পরিচিত করেছেন।

কিন্তু জনসাধারণ তাঁর কথা ভালো করে জানে না কেন?

এ জিজ্ঞাসার জবাব হচ্ছে, কোনও কবি বা প্রাচীন লেখক বিশেষ ভাবে তাঁর পক্ষ গ্রহণ করেননি বলে।

বিশাখ দত্ত লিখিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে ও গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় পাই ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের কাহিনি। প্রথম চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন লিখে রেখে গেছেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের কাহিনি।

বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' এবং চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাই সম্রাট হর্ষবর্ধনের কাহিনি।

কহলন প্রমুখ লেখকদের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে অমর হয়ে আছে কাশ্মীরের অনেক রাজার কাহিনি।

কতবড়ো দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত! তাঁরও জীবনি সেদিন পর্যন্ত ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দৈবগতিকে অল্প কিছু জানা গিয়েছে, তাও তাঁর সভাকবি হরিষেণের লিপি আবিষ্কারের পর।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্রাট শশাঙ্কদেব তেমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। নইলে তিনিও আজ ইতিহাসে কোণঠাসা না হয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধন ও ললিতাদিত্য প্রভৃতির মতোই প্রখ্যাত হতে পারতেন।

গৌণভাবে কেউ কেউ তাঁর উল্লেখ করে গিয়েছেন। কোথাও কোথাও তাঁর মুদ্রা বা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং এদিকে ওদিকে ছড়ানো ভাবে পাওয়া গেছে আরও কিছু টুকরো টুকরো নজির।

বিশেযজ্ঞ ঐতিহাসিকরা ওই অপ্রচুর মালমশলার ভিতর থেকেই শশাঙ্কের যে অসম্পূর্ণ আখ্যান আবিষ্কার করেছেন, তার সাহায্যেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর অপূর্ব মহাপুরুষত্ব। ওই আবিষ্কারকার্য এখনও চলছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা প্রায় পরিপূর্ণ শশাঙ্ককে দেখবার সুযোগ পাব।

আপাতত যেটুকু পেয়েছি তাই নিয়েই আমাদের তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু এর মধ্যেও গণ্ডগোল ও তর্কাতর্কির অভাব নেই। ভিনসেন্ট স্মিথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন চক্রবর্তী, রাধাগোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কে. পি. জসওয়াল ও ডি. সি. গাঙ্গুলি প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের সৃষ্ট তর্কজালের মধ্যে পড়ুয়াদের জড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা আমাদের নেই। তাঁদের কাছ থেকে সহজ বুদ্ধিতে যেটুকু গ্রহণযোগ্য সেইটুকু নিয়েই এই প্রথম বাঙালি সম্রাটকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে চাই।

॥ দুই ॥

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদ।

অধঃপতিত গুপ্তসাম্রাজ্য! ধুলায় লুণ্ঠিত সম্রাটের শাসনদণ্ড! ভারতবর্ষ তখন অরাজক নয়, 'সহস্ররাজক'! সাম্রাজ্যকে খান খান করে ফেলে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছেন ছোটো ছোটো রাজারা।

বাংলা দেশের যে-অংশ আগে গৌড় (এখনকার উত্তরবঙ্গ) বলে বিখ্যাত ছিল, সেখানে রাজত্ব করতেন শশাঙ্ক নামে এক নরপতি। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণপুর। আধুনিক মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় মাইল দূরে আছে রাঙামাটি নামে গ্রাম। সেইখানেই ছিল কর্ণসুবর্ণপুরের অবস্থান।

একখানি সেকেলে শিলালিপি (অর্থাৎ পাথরের উপরে খোদা লিখন) পাওয়া গিয়াছে। তার উপরে লেখা ছিল—'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য'। সামন্ত বলে অধীন রাজাকে। মহাসামন্ত অধিকতর বড়ো রাজা হলেও স্বাধীন নৃপতি নন।

অতএব বুঝতে পারি প্রথম জীবনে শশাঙ্কদেব স্বাধীন ছিলেন না। তাঁরও চেয়ে একজন বড়ো বা মহারাজার অধীনে রাজত্ব করতেন। কিন্তু তিনি কে?

ঐতিহাসিকদের অনুমান, তাঁর নাম মহাসেনগুপ্ত। বিক্রমাদিত্যের প্রথম পুত্র কুমারগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের সিংহাসন পেয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম গোবিন্দগুপ্ত। কালক্রমে গুপ্তসাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং কুমারগুপ্তের বংশধররা মগধ ও গৌড় প্রভৃতি দেশের মহারাজা নামে আখ্যাত হন। মহাসেনগুপ্ত সেই বংশেরই সন্তান। এসব কথা

এখনও যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়নি, কেবল এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাসেনগুপ্তই ছিলেন মগধের অধিপতি। সেই জন্যেই শশাঙ্ককে তাঁরই সামন্ত বলে আন্দাজ করা হয়েছে।

তারপর প্রশ্ন উঠে, শশাঙ্কদেব কে? কেমন করে তিনি গৌড়ের সিংহাসন পেলেন? তাঁর পিতৃপরিচয় কী?

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শশাঙ্কদেব ছিলেন ছোটো তরফের গুপ্তবংশীয়দেরই একজন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র। এটা মেনে নিলে শশাঙ্কের মগধাধিকারের পক্ষে একটা সযুক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা ওই মত মানতে রাজি নন। আসল কথা, শশাঙ্কের পূর্বপুরুষদের কথা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে প্রবাদে বলে, পুরুষ ধন্য হয় স্বনামেই, অতএব তাঁর বংশপরিচয় না পেলেও আমাদের চলবে।

ঐতিহাসিক বলেছেন, 'শশাঙ্ক কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিশ্বর ছিলেন।' উত্তর-পূর্ব ভারত বলতে সমগ্র বঙ্গ ও বিহার (বা মগধ) প্রদেশ বুঝায়। ওড়িশাতেও শশাঙ্কের সামন্তরাজা ছিলেন, তাঁর নাম মাধববর্মা।

সুতরাং শশাঙ্ককে হঠাৎ দেখি কেবল গৌড়ের সামন্তরাজা রূপে নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতব্যাপী বিশাল এক সাম্রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট রূপে। কেমন করে এটা সম্ভবপর হল?

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তর ভারতকে পড়তে হয়েছিল বিষম সব অশান্তির আবর্তে। তারই ফলে যে শশাঙ্কের ভাগ্যপরিবর্তন হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। দেখা যাক, সেই সব অশান্তির কারণ কী?

প্রথমত, মধ্যপ্রদেশের কালাচুরিবংশীয় এক রাজার হস্তে মগধ গৌড়ের অধিপতি মহাসেনগুপ্তের শোচনীয় পরাজয়। তারপর মহাসেনগুপ্তের আর কোনও কথা জানা যায় না, সম্ভবত তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, তিব্বতের শক্তিশালী রাজা স্রং সান-এর প্রবল আক্রমণে ছোটো তরফের গুপ্তদের রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়ত, দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজা কীর্তিবর্মণ দাবি করেন, তিনি নাকি যুদ্ধে জয়ী হয়ে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের উপর অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে যোগ্য নায়কের অভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল ভয়াবহ বিপ্লবের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

এমনি সব বিপ্লবের সময়েই উদ্যোগী পুরুষরা পান আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে ফরাসি বিপ্লবের কথা তুলতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ফরাসি দেশে তুমুল বিপ্লব না বাধলে পুরুষসিংহ হয়েও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্রাট হবার সুযোগ লাভ করতেন না।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, শশাঙ্কও ছিলেন পুরুষসিংহ। তিনি কেবল তেজী, সাহসী ও কর্মঠ নন, সেই সঙ্গে ছিলেন সুচতুর, সুকৌশলী ও সুবুদ্ধি এবং রাজনীতিতে পরম অভিজ্ঞ। উপরন্তু তরবারি ধারণ করতেন না দুর্বল অপটু হস্তে।

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন, 'বিদেশি শত্রুদের হানায় সোনার বাংলা ছারখারে যেতে বসেছে—

এ দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব! ক্ষুদ্র গৌড়ের পঙ্গু সামন্ত রাজার তুচ্ছ মুকুট পরে আর আমি তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না, আমি হব অদ্বিতীয়, আমি হব স্বাধীন—স্বদেশে স্থাপন করব স্বরাজ্য!'

শশাঙ্কের মুখে প্রেরণাবাণী শুনে জাগ্রত হল সমগ্র গৌড়বঙ্গদেশ, উদ্বোধিত হল বাঙালিজাতির আত্মা, কোষমুক্ত হল হাজার হাজার শাণিত করবাল!

তারপরেই দেখি অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে নেমে এসেছে এ দুর্ভেদ্য অন্ধ যবনিকা। সেই যবনিকা সরিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকরাও এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোনও দৃশ্য দেখতে পাননি—আমরা কিন্তু কান পেতে শুনতে পাই রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের গগনভেদি রণকোলাহল, বঙ্গবীরদের সিংহগর্জন, পলাতক শত্রুদের আর্তনাদ!

তারপর যবনিকার ফাঁক দিয়ে কোনওক্রমে দৃষ্টি চালিয়ে ঐতিহাসিকরা সবিস্ময়ে দেখলেন কোনও কোনও উজ্জ্বল দৃশ্য!

উত্তর-পূর্ব ভারতের সিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন সম্রাট শশাঙ্কদেব, চারণকবিরা রচনা করছেন তাঁর নামে কুলকীর্তিগীতি এবং নিখিল বঙ্গের বাসিন্দারা দেশ ও জাতির মুক্তিদাতা বলে তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করছে সশ্রদ্ধ প্রণতি!

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের উপরে সগর্বে উড়ছে তখন প্রথম বাঙালি সম্রাট শশাঙ্কের বিজয় পতাকা।

'এ নহে কাহিনি, এ নহে স্বপন', এ হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য।

॥ তিন ॥

কিন্তু শশাঙ্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইখানেই হল না পরিতৃপ্ত। সমগ্র উত্তরাপথে তিনি চালনা করতে চাইলেন নিজের বিজয়ী বাহিনীকে।

কেবল যে নিজের সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির জন্যেই শশাঙ্কদেব এই নতুন অভিযানে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এমন কথা মনে হয় না। তিনি কেবল যোদ্ধা নন, রাজনীতিবিদও ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব দিক—তাঁর সাম্রাজ্যের দুই দিকেই ছিল পরম শত্রু—তাঁকে আক্রমণ করবার জন্যে তারা ছিল সর্বদাই প্রস্তুত।

নিষ্কণ্টক হবার জন্যেই শশাঙ্কের এই নতুন যুদ্ধযাত্রা। আধুনিক যুদ্ধনীতি এবং রাজনীতিতেও বলে, শত্রুর স্বরাজ্যে গিয়েই শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। শশাঙ্কদেবও সেই নীতি অবলম্বন করতে চাইলেন।

এইখানে আরও কোনও কোনও পাত্র-পাত্রীর একটু একটু পরিচয় দিলে পরের ঘটনাগুলো বোঝবার সুবিধা হবে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে (আধুনিক পাঞ্জাব প্রদেশে) ছিল শক্তিশালী স্থানেশ্বর রাজ্য—তার রাজা ছিলেন প্রভাকরবর্ধন, তাঁর বড়োছেলের নাম রাজ্যবর্ধন এবং তাঁর ছোটোছেলে ও ছোটোমেয়ের নাম যথাক্রমে হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রী। কনোজের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়েছিল।

কনোজের গ্রহবর্মণ ছিলেন মৌখরি বংশের রাজা। ওই বংশের রাজারা বরাবর মগধ ও গৌড়ের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছেন। তাঁরা বার বার চেয়েছেন মগধ ও গৌড় অধিকার করতে। অতএব এই চিরশত্রুদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া, শশাঙ্কদেব একটি প্রধান কর্তব্য বলেই গণ্য করলেন। শত্রুকে আগে আক্রমণ করবার সুযোগ না দিয়ে তিনিই আগে আক্রমণ করতে চাইলেন শত্রুকে। এ হচ্ছে রণনীতি।

সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে ছিল কামরূপ (আধুনিক অসম প্রদেশ) রাজ্য। তার রাজার নাম ভাস্করবর্মণ। ঐতিহাসিকরা বলেন, খুব সম্ভব শশাঙ্ক সম্মুখ যুদ্ধে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বলে তিনিও মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে প্রতিশোধ নেবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন।

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে শশাঙ্কদেব সসৈন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁকে যে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হতে হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে-সব যুদ্ধের কোনও বর্ণনা আর পাওয়া যায় না।

তাঁর বিজয়যাত্রা বিস্তৃত হয়ে পড়ল কাশীধাম পর্যন্ত। মুর্শিদাবাদ থেকে বারাণসী, দূরত্বও যথেষ্ট এবং এতখানি জায়গা দখল করাও যা-তা শক্তির পরিচায়ক নয়। তারপর এই পর্যন্ত এসে তিনি নিজের ভূয়োদর্শনের আর একটা মস্ত প্রমাণ দিলেন।

তিনি বুঝলেন মৌখরি রাজা গ্রহবর্মণ হচ্ছেন থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের জামাই। সুতরাং তাঁকে আক্রমণ করলে তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে থানেশ্বরের সৈন্যগণও। নিজের রাজ্য ছেড়ে অত দূরে গিয়ে একসঙ্গে দুই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কার্য নয়।

মধ্যভারতে ছিল মালব প্রদেশ, সেখানকার রাজার নাম দেবগুপ্ত, তিনি গুপ্তবংশীয়। গুপ্তসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পাবার পরেও ভারতের এখানে ওখানে সেই বংশের কোনও কোনও প্রাদেশিক নৃপতি রাজত্ব করতেন। দেবগুপ্তও সেইরকম একজন রাজা এবং মৌখরিরা ছিল গুপ্তদের চিরশত্রু।

দেবগুপ্তকে শশাঙ্ক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে আহ্বান করলেন এবং দেবগুপ্তও সাগ্রহে দিলেন সেই আহ্বানে সাড়া।

তারপর খবর এল থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধন পরলোকে গমন করেছেন। এতবড় সুযোগ ছাড়া উচিত নয় বুঝে দেবগুপ্তের কাছে দূতমুখে শশাঙ্ক বলে পাঠালেন, 'আপনি মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করুন। আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে আমিও সদলবলে যাত্রা করছি।'

দেবগুপ্ত অবিলম্বে মৌখরিদের রাজ্য আক্রমণ করলেন।

॥ চার ॥

তারপর উপরি উপরি ঘটল ঘটনার পর ঘটনা।

মালবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হল মৌখরিরাজের এবং যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হলেন গ্রহবর্মণ।

দেবগুপ্ত মৌখরিরাজের সহধর্মিণী ও থানেশ্বরের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বন্দিনি করে শত্রুদের রাজধানী কনোজ অধিকার করিলেন।

যুবরাজ রাজ্যবর্ধন তখন রাজা হয়ে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহন করেছেন। নিজের ভগ্নীপতির মৃত্যু ও সহোদরার বন্দিদশার কথা শুনে তিনি একটুও সময় নষ্ট করলেন না। দেবগুপ্তের সঙ্গে শশাঙ্ক যোগ দেবার আগেই তাড়াতাড়ি দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করে ঝড়ের মতো কনোজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে-প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না দেবগুপ্ত।

থানেশ্বরের তরুণ রাজা যে এত শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে পারবেন, শশাঙ্ক নিশ্চয়ই সেটা আন্দাজ করেননি। তিনি যখন সসৈন্যে ঘটনাক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন, দেবগুপ্ত তখন পরাজিত ও নিহত।

সদ্য সদ্য যুদ্ধজয়ী হয়ে তখন রাজ্যবর্ধনের সাহস গিয়েছে বেড়ে। প্রাজ্ঞতার পরিবর্তে তিনি দেখালেন অজ্ঞতা। আরও সৈন্যবলের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি শশাঙ্কের মতো অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে আক্রমণ করতে ইতস্তত করলেন না, ফলে তিনিও যুদ্ধে হেরে বন্দি ও নিহত হলেন।

থানেশ্বরের রাজকন্যা ও কনোজের রানি রাজ্যশ্রী এই গোলযোগের সময়ে কেমন করে কারামুক্ত হলেন তা জানা যায় না। তিনি পালিয়ে গেলেন বিন্ধ্যারণ্যের দিকে। শশাঙ্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ—চূর্ণ হল চিরশত্রু মৌখরিদের দর্প! সুদূর গৌড় থেকে বেরিয়ে তিনি আর্যাবর্তের প্রায় প্রান্তদেশে এসে রোপণ করেছেন নিজের গৌরবনিশান!

ওদিক থেকে সংবাদ এল, থানেশ্বরের রাজপুত্র বা নতুন রাজা হর্ষবর্ধন বিপুল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।

এদিকে আবার কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণও শশাঙ্কদেবের অবর্তমানে সাহস পেয়ে হর্ষবর্ধনের পক্ষে যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে উপদ্রব আরম্ভ করেছেন।

দুই দিকে প্রবল শত্রু দেখে বিচক্ষণ নায়কের মতো শশাঙ্ক আবার স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তার আগে নিহত ও পরাজিত মৌখরিরাজের ছোটোভাই অবন্তীবর্মণকে কনোজের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন—নিশ্চয়ই নিজের সামন্তরাজা রূপে।

হর্ষবর্ধন প্রথমে বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা করলেন। কারণ তিনি খবর পেয়েছিলেন, তাঁর সহোদরা রাজ্যশ্রী নাকি সেখানকার আদিবাসীদের আশ্রয়ে বাস করছেন। তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্যশ্রী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে জীবন দেবার উদ্যোগ করছেন। ভগ্নীকে উদ্ধার করে তিনি ধাবিত হলেন শশাঙ্কের সন্ধানে। এসব হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদের ঘটনা।

তারপরের ঘটনা স্পষ্ট করে জানা যায় না। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের কোথাও সম্মুখযুদ্ধ হয়ে থাকলেও তার কোনও সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক, শশাঙ্কের গতি কেউ রোধ করতে পারেনি, তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শশাঙ্কদেব পলায়ন করেননি, সুব্যবস্থিতভাবে সমগ্র ফৌজ নিয়ে পশ্চাদবর্তী হয়েছিলেন। এই বিংশ

শতাব্দীতেও বৃহত্তর বাহিনীর সম্মুখীন হলে বড়ো বড়ো সেনাপতিরা ঠিক ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশিয়ানরা প্রথমে হটে গিয়েছিল বলেই পরে জার্মানদের একেবারে হারিয়ে দিতে পেরেছিল। শশাঙ্কদেবেরও এই চাতুর্যপূর্ণ যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ হয়নি, কারণ পরে তাঁর রাজ্যে গিয়ে হর্ষবর্ধন হয়তো অল্পবিস্তর উৎপাত করেছিলেন, কিন্তু মগধ ও বঙ্গদেশ জয় বা শশাঙ্ককে বন্দি না করেই সে যাত্রা তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল স্বদেশে।

নিজের সাম্রাজ্যে স্বাধীন সম্রাট শশাঙ্কদেব স্বয়ংপ্রভু হয়েই সগৌরবে বিরাজ করতে লাগলেন।

॥ পাঁচ ॥

হর্ষবর্ধন যখন 'মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ' বলে নিজের নাম সই করতেন, তখনও শশাঙ্কদেব মাথা নত করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেননি। শ্রীহর্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে বহু বৎসর পর্যন্ত তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপে নিজের রাজ্য পরিচালনা করে গিয়েছেন। একদিকে হর্ষবর্ধন এবং আর একদিকে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ, দুই দিকে দুই পরাক্রান্ত শত্রু, কিন্তু কেহই মগধ ও বাংলা দেশের সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি অধিকার বা শশাঙ্কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁদের কারুরই শশাঙ্কদেবকে দমন করবার শক্তি ছিল না।

হর্ষবর্ধন কবি বাণভট্টের পালক ও অন্নদাতা ছিলেন। তাঁর প্রতিপালকের শত্রু বলে বাণভট্টও শশাঙ্কদেবকে বাছাবাছা গালাগালি দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছেন। একটি অভিযোগ এই, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী।

পৃথিবীর সব দেশেই সেকালকার রাজনীতিতে বিধি ছিল, পরাজিত শত্রুকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা। অধিকাংশ স্থলেই সেই নীতি পালিত হত এবং আজও হয়। গত দ্বিতীয় মহাসমরে জয়ী হয়ে মিত্রপক্ষ বিচারের নামে জার্মানির বন্দি রণনায়কদের নিয়ে কী নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সে কথা সর্বজনবিদিত। শশাঙ্কদেব রাজনীতিই পালন করেছিলেন এবং রাজনীতি চিরদিনই নিষ্করুণ।

হর্ষবর্ধন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেননি, কিন্তু তিনি ছিলেন বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক এবং সেইজন্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ সর্বত্রই তাঁর গুণগান ও তাঁর শত্রুদের দোষকীর্তন করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, শৈব শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারী ও বৌদ্ধ কীর্তি ধ্বংসকারী। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন, এর কারণ শশাঙ্কের ধর্মদ্বেষিতা নয়, মগধে ও গৌড়ে যেসব বৌদ্ধ বাস করতেন, তাঁরা দেশের মহাশত্রু হর্ষবর্ধনের অনুগত ছিলেন বলেই শশাঙ্কের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের অভিযোগ অমূলক বা অতিরঞ্জিত বলেই গ্রহণ করা হয়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত যে সম্রাট শশাঙ্কের অপূর্ব প্রতিভায় ও প্রবল প্রতাপে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও তাঁর সম্বন্ধে আরও বেশি কিছু আবিষ্কৃত হয়নি।

তাঁর মৃত্যুর তারিখও সঠিকভাবে বলা চলে না। তবে তিনি যে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে। খুব সম্ভব ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

শশাঙ্কের বলিষ্ঠ মুষ্টি থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সাম্রাজ্যের মধ্যে হল বহিঃশত্রুর আবির্ভাব! পূর্ব দিক থেকে হানা দিলেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হানা দিয়ে আর্যাবর্তের সম্রাট হর্ষবর্ধন সমগ্র মগধ ও বঙ্গদেশ দখল করে বসলেন। শশাঙ্কদেব বর্তমান থাকতে এমন সাহস বা ক্ষমতা তাঁদের কারুরই হয়নি। শশাঙ্কের শক্তি ও বীরত্বের এও একটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

তখনকার মতো বাঙালির গৌরব বিলুপ্ত হল বটে, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে পুনর্বার বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল নবজাগ্রত বাঙালির অমিত বাহুবল—তবে সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনি।

সম্রাট শশাঙ্কের এক পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর নাম মানব। কিন্তু তিনি অযোগ্য পুত্র, পিতার মতো মহামানব হতে পারেননি, রাজ্যশাসন করতে পেরেছিলেন মাত্র আট মাস পাঁচ দিন।

চলো গল্প নিকেতনে

'চলো গল্প নিকেতনে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি থেকে। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অনুবিসের অভিশাপ' গল্পটি হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর ঊনবিংশ এবং 'জীবন্ত মৃত্যু' গল্পটি রচনাবলীর বিংশ খণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

পর্বত ও মূষিক

কেউ কেউ বলে, ভূতের গল্প ভালো নয়। কেন? ভূতের গল্পে নাকি থাকে ভূতের ভয় এবং ভয় ব্যাপারটা ভীতু করে তোলে তোমাকে-আমাকে।

তাহলে বলি দাদা, মানুষের ভয় কি খালি একটা? রাত হলেই অন্ধকারের ভয়, শীত পড়লেই সর্দি-কাশির ভয়, বসন্তকালে মারী-ভয়, জলপথে ডুবে যাবার, স্থলপথে গাড়ি চাপা পড়বার ও শূন্যপথে বিমান বিকল হবার ভয় এবং চুপ করে বাড়ির ভিতরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও হঠাৎ বজ্রপাত ভূমিকম্পের ভয়। এ-সবার উপরেও আছে অগুনতি ভয়, সঠিক ফর্দ দাখিল করা অসম্ভব। কোন দিক সামলাবে? ভয় আছে মানুষের হৃদয়ের পরতে পরতে গাঁথা, তাকে এড়াবার চেষ্টা বৃথা। মারা পড়বার ভয়ে সৈনিকরা কি যুদ্ধে যায় না?

ভয়কে দমন করে সাহস। যার সাহস নেই, ভূতের গল্প না শুনলেও সে হবে পয়লা নম্বরের ভীতু।

কী বলছ? আমার আসল বক্তব্য কী? আরে ভায়া, ভূতের গল্পের বিরুদ্ধে তোমাদের নজিরগুলো শুনতে শুনতে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার জীবনেই। আমি ভূত মানি না, কিন্তু সেই ভয়াবহ ঘটনায় আমার সমস্ত সাহস উপে গিয়েছিল।

ঘটনাটা শুনতে চাও? বেশ, শোনো তবে—

বাহান্ন বৎসর আগেকার কথা, অর্থাৎ আমার বয়স তখন আঠারো।

প্রেমলাল জাতে ছিল স্বর্ণবণিক কি গন্ধবণিক, ঠিক আমার মনে নেই। সে আমাদের পাড়ার কাছেই থাকত। তার সঙ্গে কিছুদিন পর্যন্ত আমার বেশ দহরম-মহরম ছিল, কিন্তু তারপর সে কোথায় হারিয়ে গেল এবং এখনও ইহলোকে টিকে আছে কি না, এসব খবর আমার জানা নেই।

যখন এই প্রেমলালের বিয়ে হয়ে গেল সতরো বছর বয়সে তখন আমরা কেউই অবাক হলুম না। সে সময়ে কোনও কোনও জাতের ছেলেদের খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়ে যেত। হেয়ার স্কুলে এক সুবর্ণবণিকদের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল, সে যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে, তখনই এক সন্তানের পিতা!

কিন্তু ও-সব কথা থাক! প্রেমলালের অকালবিবাহের কথাটাও এখানে উপলক্ষ মাত্র, তবু উল্লেখ করবার কারণ, সেই সূত্রেই পূর্বোক্ত ভয়াবহ ঘটনাটার উৎপত্তি।

প্রেমলালের বিবাহের জের শহরেই মিটল না, উৎসবটা ভালো করে জমিয়ে তোলবার জন্যে তার বাবা ও মা, ছেলে আর নতুন বউ নিয়ে কিছুদিনের জন্য দেশে রওনা হলেন।

প্রেমলাল আমাকেও নিমন্ত্রণ করে বললে, 'চলো না, দিন-তিনেক পাড়াগাঁয়ে ঘুরে আসবি, মন্দ লাগবে না!' আমিও রাজি হয়ে গেলুম।

প্রেমলালদের দেশ কলকাতার কাছেই। ছোটো গ্রাম, এতদিন পরে তার নাম আমার মনে পড়ছে না।

সেখানে গিয়ে আমি পড়লুম কিন্তু বিপদে। যত সব অচেনা লোকের ভিড় এবং বিরক্তিকর প্রশ্ন! তার উপরে সেকেলে গ্রাম্য ধুমধড়াক্কার চোটে প্রথম দিনেই প্রাণ আমার আইঢাই করতে লাগল। রাত্রে ঘুমের দফা প্রায় রফা হবার ব্যাপার।

প্রেমলাল চালাক ছেলে, সকালে দেখা হতেই বললে, 'ভাই, তোর মুখ দেখেই পেটের কথা বুঝতে পারছি। তোর কষ্ট হচ্ছে, নয়? তা তুই এক কাজ কর। মুখুজ্জেদের বাগানবাড়িতে থাকবি?'

—'সে আবার কোথায়?'

—'গাঁয়ের শেষে, মাঠের ধারে। তুই কবি মানুষ, তোর ভালো লাগবে।' (তখন থেকেই আমি গদে-পদ্যে হাতমক্স শুরু করেছি এবং ছোটো ছোটো মাসিকপত্রে আমার দুই-একটি লেখা বেরিয়েও গিয়েছে।)

আমি ইতস্তত করে বললুম, 'কিন্তু মুখুজ্জেদের তো আমি চিনি না!'

প্রেমলাল বললে, 'তারা ওখানে নেই। বাগানখানা আমাদেরই জিম্মায় আছে।'

সত্যসত্যই বাগানখানার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আমার ভালো লাগল। পশ্চিমে ও দক্ষিণে ধু ধু মাঠ। পূর্ব দিকে গ্রাম এবং উত্তর দিকে কলাইশুঁটি খেতের কোলে একটি ঝিলমিলে ঝিল। মেহেদীগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানের ভিতরে নানান ফলফুলের গাছ ও কানায় কানায় জল-ভরা পুকুর এবং একখানি ছোটো একতলা বাড়ি। আর এক প্রান্তে মালির জন্যে আর একখানা মেটেঘর। চারিদিক নির্জন ও নিরিবিলি। গ্রাম্য হট্টগোল থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সন্ধ্যার পর খাবারদাবার এল বিয়ে বাড়ি থেকে এবং একখানি দক্ষিণখোলা ঘরে তক্তাপোশের উপরে বিছানো হল আমার বিছানা। কিন্তু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হল না। প্রতিপদের চাঁদের আলোতে তেপান্তরের মাঠ হয়ে উঠেছিল স্বপ্নলোকের মতো, আমার শহুরে দৃষ্টিকে তা আকৃষ্ট করে রাখলে অনেকক্ষণ ধরে। গানের পাখিরাও কানে করছিল মধুবৃষ্টি।

ঘরের কোলে বারান্দায় বসে এই সব দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে বেশ একটু তন্দ্রার আবেশ এসেছিল, কিন্তু চটকা ভেঙে গেল শেয়ালদের হুক্কাহুয়া চিৎকারে! চাঁদ তখন বাড়ির ছাদের আড়ালে সরে গিয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লুম। জানালা দিয়ে আসছিল দখনে বাতাসের মেঠো উচ্ছ্বাস। ঘুমিয়ে পড়তে দেরি লাগল না।

আমার ঘুম বরাবরই সজাগ। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, আচম্বিতে অজানা কারণে ঘুম গেল ছুটে। বিছানায় উঠে বসে কারণটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করলুম।

ঝাঁ ঝাঁ রাতে ঝিঁঝিপোকাগুলো খালি ঝিঁ ঝিঁ করছে। গানের পাখিদের জলসা বন্ধ হয়েছে। বাতাসও আর গাছে গাছে সবুজ পাতার বীণা বাজাচ্ছে না।

কিন্তু একটা শব্দ—সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়। খস খস খস খস খস খস! বারান্দার উপরে কে পায়চারি করছে!

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। চোর-টোর নয়, চোর পায়ের শব্দে গৃহস্থকে জাগায় না। কোনও জন্তুর পায়ের শব্দ বলেও মনে হয় না। কিন্তু অজ-পাড়াগাঁয়ে এই নিশুতিতে মেঠো বাড়ির বারান্দায় বেড়াবার শখ হল কার?

আবার শব্দ—খস খস খস খস খস খস! তারপর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ!

একবার উঠে দেখতে হল তো! তখনও ভূতের কথা একবারও মনে জাগেনি। ছেলেবেলা থেকেই ভূতের গল্প পড়তে ভালোবাসি, কিন্তু ভূতের ভয় আমার ছিল না।

জানালা দিয়ে উঁকি মারলুম। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ধু ধু মাঠ জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে। মাথা-ঢাকা বারান্দায় রয়েছে আলোমাখা ছায়া কিংবা ছায়ামাখা আলো—সব দেখা যায় কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় না।

আচমকা আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল! সেই আবছায়ায় আমার দিকে পিছন ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন কালি জমিয়ে তৈরি একটা অতি শীর্ণ কঙ্কালসার নারীমূর্তি? এটুকু আন্দাজ করা গেল, তার দেহের উপরার্ধ নগ্ন এবং মাথায় জটপাকানো চুলগুলো সর্পশিশুদের মতো কাঁধের উপরে ঝুলছে!

সত্যই আমার গায়ে জাগল রোমাঞ্চ! যে-সব নিশীথ-প্রেতিনীর কথা শোনা যায়, এ কি তাদেরই কেউ? তবু ভয়ে ভয়ে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে কে ওখানে?'

তৎক্ষণাৎ এমন বিদ্যুৎবেগে সেই প্রস্তর স্থির মূর্তিটা ফিরে দাঁড়াল যে আমি সচমকে পিছু হটে জানালার কাছ থেকে সরে এলুম।

মূর্তিটা আবার মুহূর্তকাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ করলুম সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হল, অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো ক্ষুধিত চক্ষু যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে! যদিও আমি বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে আছি, তবু নিজেকে কী অসহায় বোধ হতে লাগল! বাইরে যে অমন মাঠভরা চাঁদের আলোর জোয়ার, তাও যেন আমার চোখের সামনে ডুবে গেল অমাবস্যার গহন আঁধারে!

তারপরেই যেন শিকার খুঁজে পেয়ে সেই বিভীষণ মূর্তিটা তীব্র স্বরে খিল খিল করে হেসে উঠল। এবং পায়ে পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি আর সহ্য করতে পারলুম না—বেগে দৌড়ে গিয়ে দড়াম করে জানালা বন্ধ করে দিলুম।

কিন্তু বাহির থেকে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না—না হাসির, না পায়ের শব্দ!

বাকি রাতটা জেগে জেগেই কেটে গেল। অবশেষে ভোরের পাখিদের বৈতালিকী শুনে আশ্বস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। সন্তর্পণে এদিক ওদিকে খুঁজে দেখলুম—কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে সেই নৈশ অপচ্ছায়া!

চিৎকার করে মালিকে ডাক দিলুম।

মালির কথা সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পর্বতের মূষিক প্রসব!

এই গাঁয়েরই এক বাগদি জাতের পাগলি ঘুরে বেড়ায় হাটে-মাঠে-ঘাটে এবং রাত্রে মাঝে মাঝে বাগানের বেড়া পেরিয়ে বারন্দায় উঠে শুয়ে থাকে।

গল্পটি শুনে তোমরা হয়তো বলবে, 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!' কিন্তু এ গল্পের 'মর‍্যাল' হচ্ছে ভূত নেই বললেই ভয় যায় না! আমার অবস্থায় পড়লে তোমরা কী করিতে, সেইটে একবার ভেবে দ্যাখো।

অট্টহাসক

সুখে ছিলুম উত্তর-বাংলায়। কিন্তু উত্তর-বাংলা হঠাৎ পরিণত হল পাকিস্তানে। সে আস্তানা ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম।

এলুম কলকাতায়। কিন্তু ভারতের রাজধানী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েও ভারতের সর্বপ্রধান নগরী বলে কীর্তিত কলকাতায় মাথা গোঁজবার জন্যে একটিমাত্র খালি গর্ত পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। অবশেষে—হ্যাঁ, বহু অন্বেষণা ও পদচালনার পর অবশেষে—হাওড়ার শেষ প্রান্তে ভাড়া পাওয়া গেল একখানা ছোট্ট, সেকেলে, নড়বড়ে বাড়ি।

বাড়ি তো ভারী! বুড়ো বাড়ি, বয়স তার ষাট-সত্তরের কম নয়। দোতলায় একখানা ঘর একটুখানি দালান। তিনখানা ঘর একতলায়। সব ঘরই ছোটো ছোটো। তিন-চার যুগের মধ্যে বাড়ির কোথাও যে রাজমিস্ত্রির হাত পড়েছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নেই। ভাঙা, রেলিংহীন সিঁড়ি, তার উপরে পদার্পণ করলে বুকও কাঁপে, সিঁড়িও কাঁপে। সর্বত্রই দেওয়ালের চুন-সুরকির প্রলেপ খসে পড়েছে কিংবা খসে পড়ি পড়ি করছে। কোনও কোনও জানালার গরাদ ভাঙা। একতালার রোয়াকে যে এক সময়ে সিমেন্টের আবরণ ছিল, তার কিছু কিছু পরিচয় আজও পাওয়া যায়। মেটে উঠান, বর্ষাকালে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় বসে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে বাড়ির পশ্চিম দিকে জমিটা। সেখানে আছে পানায় ভরতি ডোবার মতো একটা ছোটো পুকুর আর বেশ বড়ো বড়ো একটা জঙ্গল, তাকে নিবিড় অরণ্য বলা চলে। সেখানে রোজ রাত্রে নিয়মিতভাবে কণ্ঠসাধনা করতে আসে শৃগালরা। সেখানে যখন তখন আনাগোনা করে নানা জাতের সাপ ও সরীসৃপরা, তাদের কেউ কেউ বাড়ির ভিতরেও তদারক করতে আসে মাঝে মাঝে।

প্রথম যেদিন এখানে পদার্পণ করি, বাড়ি দেখেই গৃহিণী কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'ও মাগো এ বাড়িতে আমি থাকতে পারব না।'

আমি বললুম, 'থাকতে পারবে না কী সরলা, থাকতেই হবে। ভারত অঙ্গহীন হয়েছে বটে, আমরা বাস্তুহারা হয়েছি বটে, কিন্তু গান্ধিজি-নেহরু-প্যাটেলের কৃপায় আমরা যে এখন স্বাধীনতা পেয়েছি। সেই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হবে না?'

॥ দুই ॥

পরিবারের মধ্যে কেবল আমি, সরলা, কুত্তা টুনি ও বিল্লী মেনি। আমরা নিঃসন্তান, তাই শেষোক্ত দুটি চতুস্পদের সাহায্যে সরলা তার মাতৃহৃদয়ের অভাব কতটা পূরণ করবার চেষ্টা করত।

আমরা এখানে এসেছিলুম বর্ষার শেষে। একটু বেশি জোরে বৃষ্টি হলেই দোতলার ঘরের

ছাদ দিয়ে ঝরত অনর্গল জল। দিনের বেলায় একতালার ঘরে এসে আত্মরক্ষা করতুম, কিন্তু রাত্রে সরলা কিছুতেই একতলায় নামতে রাজি হত না।

বলত, 'পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি এখানা হানাবাড়ি। রাত্রে আমি নীচেয় নামতে পারব না।'

আমি বলতুম, 'গিন্নি, পাড়ার লোকরা ভ্রান্ত। ভূতেরা নির্বোধ নয়, হানা দেবার জন্যে তারা এমন একখানা যাচ্ছেতাই বাড়ি নির্বাচন করবে না।'

কিন্তু সরলা তবু নীচে নামবার নামও মুখে আনত না।

টুনি আর মেনি বৃষ্টি-সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিল খুব সহজেই। রাত্রে ছাদ ফুঁড়ে ধারাপাত হলেই তারা খাটের তলায় গিয়ে ঢুকতে একটুও দেরি করত না। খাটের বিছানা ভিজলেও তাদের দেহ ভিজত না। শেষটা আমরাও তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হতুম। সারমেয়-মার্জারের কাছেও মনুবংশীয়রা জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

বর্ষা কাটল, শীত এল, আমরাও অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

কিন্তু তারপর থেকে ঘটতে লাগল সব ভয়াবহ ঘটনা। সত্যই কি এখানা হানাবাড়ি?

॥ তিন ॥

একদিন সন্ধ্যার পর টুনি চাঁদের আলোয় বাগানে বেড়াতে গিয়েছে। শোনায় ভালো বলে জঙ্গলের নাম দিয়েছিলুম আমরা 'বাগান'।

টুনি অবশ্য চন্দ্রকিরণ উপভোগ করবার জন্যে বাগানে বেড়াতে যায়নি। ওখানে সে যেত ভেক শিকার করতে। হাওড়া অঞ্চলে ভেক শিকারে সে ছিল অদ্বিতীয়।

কিন্তু সেদিন টুনি বাগানে গিয়ে হঠাৎ আর্তস্বরে প্রাণপণে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর সব চুপচাপ। একটা লন্ঠন ও লাঠি নিয়ে বাগানে ছুটে গেলুম। কিন্তু টুনির কোনও চিহ্নই আর আবিষ্কার করতে পারলুম না। তারপর সে আর ফিরে আসেনি। সরলা কেঁদে কেঁদে অস্থির।

মেনি শিকার করত বাড়ির ভিতরেই। সে ছিল ইঁদুর ও আরশোলা মারতে ওস্তাদ। কিন্তু সে-ও রাত্রে উদ্যান-ভ্রমণ করতে ভালোবাসত। বোধহয় সে উদ্যানবিহারী অন্যান্য বিড়ালদের সঙ্গে আলাপ করতে যেত। কিন্তু একদিন রাত্রে সে-ও বাগানে গিয়ে বিকট চিৎকার করে কেঁদে উঠে একেবারে নিখোঁজ হল।

ব্যাপার ক্রমেই আরও সঙিন হয়ে উঠল। রাত্রি হলেই বাড়ির একতলায় কারা যেন আনাগোনা করে, এটা-ওটা-সেটা নিয়ে টানাটানি করে। শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি, সরলার নিষেধ না মেনেই নীচে নেমে যাই, কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখতে পাই না।

রান্নাঘরে খাবার থাকলেই কে খেয়ে যায়। ধরলুম ভাঙা জানালা দিয়ে বাড়ির ভিতরে চোর আসে। কিন্তু সে বাসন-কোসন চুরি না করে কেবল খাবার খেয়েই খুশি হয়ে সরে পড়ে কেন?

তারপর এক গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, বিছানার এক কোণে দুই হাতে দুই কান চেপে সরলা সভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

—'ব্যাপার কী সরলা? কী হয়েছে, তুমি অমন কাঁপছ কেন?'

শিউরোতে শিউরোতে সরলা বললে, 'বাগান থেকে কে হেসে হেসে উঠছে।'

তার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই শুনলুম, বাড়ির পশ্চিম দিকের জঙ্গলের ভিতরে উঠল হা হা হা হা হা হা অট্টহাস্যের ধ্বনি। তেমন ভয়ঙ্কর অট্টহাসি আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। সরলা তো ভীরু নারী মাত্র, সে হাসি শুনে আমারও সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ও কে হাসে? কোনও পাগল-টাগল? কিন্তু পাগলও তো মানুষ, আর ও হাসি যে একেবারেই অমানুষিক। ও অট্টহাসির মধ্যে রয়েছে যেন একটা অপার্থিব, অমঙ্গলকর, বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা। কোনও পাগলই অমন করে হাসতে পারে না।

সরলা সাশ্রুনেত্রে বললে, 'ওগো, এখনও কি তুমি বিশ্বাস করবে না? এখানে ভূত আছে। কালকেই এখান থেকে পালাই চলো।'

আমি বললুম, 'না। কাল সকালে উঠে আগে আমি একটা বন্দুক কিনে আনব। শেষ পর্যন্ত না দেখে কাপুরুষের মতো বাড়ি ছেড়ে পালাব না।'

॥ চার ॥

পরের দিন রাত্রেও আবার সেই ভীষণ হাস্যধ্বনি শুনলুম বটে, কিন্তু অনেক দূর থেকে।

বন্দুক হাতে নিয়ে দোতলার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কিন্তু হাস্যধ্বনি আর কাছে এগিয়ে এল না। নৈশ আকাশকে বিষাক্ত করে তুলে হাসি থামল এবং তার পরিবর্তে জেগে উঠল পথের কুকুরদের ভীত আর্তধ্বনি।

আর একটা বিষয় লক্ষ করছি। আজ কয়দিন ধরে পশ্চিমের জঙ্গলে শৃগাল-সভায় কোলাহল শোনা যাচ্ছে না। কোনও অজ্ঞাত বিভীষণ নিশাচরকে দেখে তারা এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে?

পরদিন আমাদের বাগানের পুকুরের কাছেই উঠল আবার সেই ভৈরব অট্টহাস্যধ্বনি! সে যেন খালি হাসিও নয়, কাশিও বটে। কে যেন একসঙ্গেই বিকট স্বরে কাশছে আর হাসছে, কাশছে আর হাসছে। কী তীব্র ধ্বনি, খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল যেন রাত্রির নিস্তব্ধতা।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, হাতে বন্দুক প্রস্তুত।

পাণ্ডু চাঁদ, ছায়ামাখা আলো। হাস্যধ্বনি মৌন। পুকুর-পাড়ের একটা ঝোপ নড়ছে। তারপর দেখা গেল দুটো আগুনের গুলি। কে যেন ঝোপের ভিতরে বসে বসে আমাকে নিরীক্ষণ করছে জ্বলন্ত চক্ষে।

সেই অগ্নিময় হিংসুক চোখদুটোর মাঝখান লক্ষ করে টিপলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল দীপ্ত চোখদুটো।

পরের দিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের ভিতরে ছুটে গেলুম। পুকুরপাড়ের সেই ঝোপের কাছে গিয়ে দেখি, একটা মস্তবড়ো হায়না সেখানে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।

চমৎকৃত হলুম, প্রথমটা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলুম না হায়নার হাসি বিশ্রী অট্টহাসির মতো বটে, কিন্তু হাওড়া শহরে হায়না! এও কি সম্ভবপর?

দু-দিন পরেই এ রহস্যেরও কিনারা হল। খবর পাওয়া গেল, হাওড়ার ময়দানে একটা সার্কাসের দল এসেছে, কয়েক দিন আগেই তার পশুগৃহ থেকে একটা হায়না কেমন করে পালিয়ে গিয়েছিল।

টেলিফোন

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!...

ঝট করে ভেঙে গেল ঘুম। টেলিফোনের ঘণ্টা!

—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা চিৎকার করছে ঢং, ঢং, ঢং, ঢং,...

একে একে গুনলুম রাত বারোটা—তন্দ্রাকাতর চোখ না খুলেই।

আরও দুটো শব্দ এল কানে—গড় গড় গড় গড় বজ্রের গর্জন এবং ঝুপ ঝুপ ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির পতন!

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং...

নিজের ডাক্তারি জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে ধড়মড় করে উঠে বসলুম বিছানার উপরে। এই সলিলাক্ত দুপুর রাত্রি, নিশ্চয় কোনও রোগী—

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং...

বিছানা ছেড়ে নেমে 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে সাড়া দিলুম—'হ্যালো!'

—'ডাক্তার?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার! শিগগির আসুন, শিগগির!'

—'কোথায়?'

—'আমার বাসায়। সাত নম্বর সাতকড়ি সেন স্ট্রিট।'

—'অসুখটা কী?'

—'আমি এখনই মারা যাব! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আমি আর কথা কইতে পারছি না! শিগগির এসো, শিগগির! ডাক্তার!'

আর কোনও সাড়া নেই! রিসিভারটা রেখে দিয়ে কী করব ভাবতে লাগলুম। জানালার উপরে শোনা গেল দমকা ঝোড়ো বাতাসের করাঘাত। কিন্তু শেষটা যাওয়াই স্থির করলুম।

গাড়ির ভিতর থেকেই 'টর্চে'র আলো ফেলে আবিষ্কার করলুম সাতকড়ি সেন স্ট্রিটের সাত নম্বরকে।

একখানি পুরানো ছোটোখাটো দোতলা বাড়ি। প্রত্যেক জানালা—এমন কি সদর দরজা পর্যন্ত ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা-জানালার ফাঁক-ফোক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না একটিমাত্র আলোকরেখাও।

এত রাত্রে ড্রাইভারের ঘুম ভাঙাইনি, নিজেই এসেছি গাড়ি চালিয়ে। ব্যাগটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলুম—

রাস্তায় গিয়ে নামলুম? একি রাস্তা, না বেগবতী স্রোতস্বতী? কল কল করে ছুটন্ত জল ধাক্কা মারছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত উঠে। যেদিকে তাকাই, চিহ্ন নেই জনপ্রাণীর—এ যেন মানুষের পৃথিবীই নয়। কেবল মানুষ কেন, পথচারী কুকুর-বিড়াল এবং রাত্রির পেচক-বাদুড়রাও যেন আজকে এই পৃথিবী ছেড়ে পলায়ন করেছে কোথায়, কেউ জানে না। কেবল

দীপ্তনেত্র গ্যাস-পোস্টগুলো পায়ের তলায় নিজেদের অভাবিত প্রতিবিম্ব দেখে দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভিতের মতো।

হু হু হু হু! কী কনকনে ভিজে বাতাস! ঝম ঝম ঝম ঝম! ও বৃষ্টি, না নৈশ প্রেতিনীদের পায়ের মলের শব্দ?

শীতে কাঁপতে কাঁপতে সাত নম্বর বাড়ির কাছে গিয়ে সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলুম সজোরে!

হঠাৎ খুলে গেল দরজাটা। বাড়ির ভিতরটাও অন্ধকার। কে দরজা খুললে দেখবার জন্যে 'টর্চ' ব্যবহার করলুম, কিন্তু কারুকেই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

ভাবলুম, বোধহয় কোনও অন্তঃপুরিকা এসে দরজা খুলে দিয়েই তাড়াতাড়ি আবার ভিতরে চলে গিয়েছেন।

কিন্তু কী মুশকিল, এরা ডাক্তারকে ডাক দিয়েছে অথচ বাড়ির ভিতরে একটা লণ্ঠন পর্যন্ত জ্বেলে রাখেনি।

অন্ধকারেই বাড়ির ভিতরে দুই-চার পা এগিয়ে গলা তুলে বিরক্তভাবে বললুম, 'মানুষের চোখ অন্ধকারে চলে না। একটা আলো দেখাবার ব্যবস্থা করুন।'

অত্যন্ত গম্ভীর এবং অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে কে বললে, 'আলো নেই। আলো দেখাবার লোকও নেই। 'টর্চ' জ্বেলে এগিয়ে আসুন। ডানদিকেই সিঁড়ি। দোতলায় উঠে বাঁ-দিকের প্রথম ঘরেই রোগীকে দেখতে পাবেন।'

কে কথা কইছে? কোথা থেকে কথা কইছে? চারিদিকে 'টর্চে'র আলো ফেলতে লাগলুম— সামনে দেখা গেল কেবল একটা সরু পথ—তার উপরে ছাদ, দুই পাশে দুই দেওয়াল। কোথাও মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই। যে কথা কইলে সে নিশ্চয় আমাকে দেখতে পেয়েছে, নইলে আমার 'টর্চে'র উল্লেখ করত ন'। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—'ডাক্তার, ডাক্তার! নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? উপরে এসো—উপরে এসো!' অপার্থিব কণ্ঠস্বর—আসছে যেন খুব কাছ থেকে, আসছে যেন বহু দূর থেকে!

বুকের কাছটা করতে লাগল ছমছম ছমছম! সদর দরজাকে সশব্দে নাড়া দিয়ে আচম্বিতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল বৃষ্টির কাদাজল-মাখানো খানিকটা দমকা হাওয়া।

আমি আর দাঁড়ালুম না। নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললুম। ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে লাগলুম এবং উঠতে উঠতে সবিস্ময়ে লক্ষ করলুম সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে জমে রয়েছে প্রায় আধ-ইঞ্চি পুরু ধুলো। সেই ধুলোর উপরে নেই একটিমাত্র পদচিহ্ন। যেন বহুকালের মধ্যে এই সিঁড়ির উপর দিয়ে কোনও মানুষই ওঠা-নামা করেনি!

আর একটা ব্যাপার অনুভব করলুম। আমার চারিদিক ঘিরে যেন কোনও মৃত বা জীবন্ত অদৃশ্য বিভীষিকার ধারণাতীত উপস্থিতি! যেন আমার প্রত্যেক পদক্ষেপ লক্ষ করছে তার জাগ্রত চক্ষুহীন দৃষ্টি!

থেকে থেকে আমার গা এমন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল যে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে লাগলুম, অতঃপর এই অস্বাভাবিক বাড়ি ত্যাগ করে আবার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া উচিত কি না?

আবার কে যেন ব্যঙ্গের স্বরেই বললে, 'ডাক্তার, কত মড়ার হাড় নেড়েচেড়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছ, কত পচা-গলা মড়ার দেহ কেটে কেটে ডাক্তারি পাস করেছ, তবু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

মনের ভাব লুকোবার জন্যে জোর করে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমি ভয় পাইনি।'

—'কিন্তু তুমি কাঁপছ!'

—'ঠান্ডা হাওয়ায় আমার শীত করছে।'

কানে এল একটা শুকনো ও চাপা বিশ্রী হাসির আওয়াজ।

দারুণ ক্রোধে জেগে উঠল আমার পুরুষত্ব। বেশ চেঁচিয়েই বললুম, 'কারুর হাসি শোনবার জন্যে আমি এখানে আসিনি, আমি এসেছি রোগী দেখতে।'

বাঁ-পাশের ঘরের ভিতর থেকে শোনা গেল, 'উত্তম। ভিতরে এসো দরজা খুলে।'

দরজায় ধাক্কা মারলুম, খুলল না।

—'দেখতে পাচ্ছ না, দরজায় বাহির থেকে শিকল-তোলা আছে?'

তাই বটে। শিকল নামিয়ে ঠেলা মেরে দরজা খুলতেই ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে এল যেন হিমালয়ের তুষার মাখানো বাতাসের একটা ঝটকা! ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আবার পিছিয়ে এলুম।

সেই ভয়াবহ কণ্ঠ ততোধিক ভয়াবহ যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বললে, 'এসো এসো, আর দেরি কোরো না! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—আমি আর কথা কইতে পারছি না—ডাক্তার, ডাক্তার!'

নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। নাকে লাগল গলিত শবের দুর্গন্ধ। সেটা আমলে না এনে 'টর্চ' জ্বালবার উপক্রম করতেই কে বললে, 'আলো জ্বেলো না ডাক্তার, আলো জ্বেলো না!'

—'কেন?'

—'আতঙ্কে আঁতকে উঠবে, মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে!'

এখানে কোনও পাগল কি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে কথা কইছে? না কেউ আমার সঙ্গে 'প্রাক্টিকাল জোক' করতে চায়? অধীরকণ্ঠে বললুম, 'কী আশ্চর্য, আলো না জ্বাললে আমি রোগীকে পরীক্ষা করব কেমন করে?'

—'তবে জ্বালো আলো!'

জ্বাললুম।

ময়লা চাদরে মোড়া বিছানার উপরে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে রয়েছে একটা সুদীর্ঘ দেহ। দেখলে বোঝা যায় সেটা অনেক দিনের পুরাতন মৃতদেহ—অথচ পচে বা গলে যায়নি! কিন্তু কী ভীষণ তার মুখমণ্ডল! ভুরু দুটো উঠে গিয়েছে কপালের অনেকটা উপরে এবং দুই কোটরের মধ্যে চক্ষু দুটো যে কত নীচে তলিয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাওয়া যায় না! এমনভাবে সে মুখ্যব্যাদান করে আছে যে দেখলেই বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে! এবং সবচেয়ে

ভয়ানক দৃশ্য হচ্ছে, তার মুখগহ্বরের ভিতর থেকে কিলবিল করতে করতে বেরিয়ে আসছে সার বেধে পোকার পর পোকা!

স্তম্ভিত নেত্রে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। হে ভগবান, এই কি আমার রোগী?

—'ডাক্তার, ডাক্তার! এ যমযন্ত্রণা আর সইতে পারছি না যে! শিগগির এসো—দেখতে পাচ্ছ না, আমাকে আক্রমণ করেছে দলে দলে নরকের কীট? এই পোকাগুলোকে তাড়িয়ে দাও, এই পোকাগুলোকে তাড়িয়ে দাও—উঃ!'

বেশ বুঝতে পারলুম, সেই রোমাঞ্চকর অমানুষিক কণ্ঠস্বরটা বেরিয়ে আসছে ওই হাঁ করা মুখ-বিবরের ভিতর থেকেই! এবং তারও চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, মুখের ভিতর থেকেই কণ্ঠস্বর নির্গত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটুও নড়ছে না মূর্তির ওষ্ঠাধর!

স্তম্ভিত ভাবের ভিতর দিয়ে কেটে যেতে লাগল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

তারপর চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম, মৃতদেহটা টলমল করতে করতে উঠে বসছে আস্তে, আস্তে, আস্তে! কিন্তু তার উঠে বসবার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, যে যেন নিজে উঠে বসছে না, কেউ যেন তাকে ধরে ধরে তুলে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে—তার মাথাটা পড়েছে কাঁধের উপর লুটিয়ে আর তার হাত দুটো করছে ঝল ঝল ঝল ঝল। কিন্তু যে তাকে তুলে বসাতে চায়—সে কোথায়, সে কোথায়? সে যে একেবারেই অদৃশ্য!

আচম্বিতে মৃতদেহটার কাঁধের উপরে লটকে পড়া মুণ্ডটা ধীরে ধীরে সিধে হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরেই আমার দিকে এবং তার দৃষ্টিহীন চক্ষু কোটরের অনেক তলা থেকে চক চক করতে লাগল যেন দুটো রাঙা আগুনের ফিনকি!

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহে কেটে গেল আমার সমস্ত আচ্ছন্নভাব! এক লাফে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ক্রমে উঠি কি পড়ি এমনি ভাবে সশব্দে নেমে এলুম নীচের দিকে—

—এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পিছনে ছুটে এল সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর—'ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার!'

দিন তিনেক পরে সাহস সঞ্চয় করে এক সকালে কৌতূহলী মনে আবার হাজির হলুম সাত নম্বর সাতকড়ি সেন স্ট্রিটে।

দেখলুম বাড়ির সদর দরজায় তালা দেওয়া এবং বাড়ির দেওয়ালে ঝুলছে ভাড়াপত্র: 'এই বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাইবে।'

অবাক হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে পিছন থেকে শুনলুম, 'ডাক্তারবাবু এখানে কেন?'

ফিরে দেখি আমারই পরিচিত লোক, এই অঞ্চলেই তাঁর বাসা। বললুম, 'দিন-তিনেক আগে এই বাড়িতে এক রোগী দেখতে এসেছিলুম। কিন্তু আজ দেখছি সদরে তালা দেওয়া।

তিনি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, বাড়ি ভুল করেছেন। এ বাড়ি আজ এক বৎসর ধরে খালি পড়ে আছে। বাড়িখানার ভারী বদনাম, কেউ নিতে চায় না।'

আসল কথা চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ বাড়ি শেষ ভাড়াটে কে?'

—'ভুবনেশ্বরবাবু।'

—'তিনি এখন কোথায়?'

—'পরলোকে।'

—'এই বাড়িতেই তিনি মারা যান?'

—'হ্যাঁ। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় হঠাৎ তিনি মারা পড়েন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না, পাড়ার লোকেরাই উদ্যোগী হয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করে।'

কিন্তু পরলোকেও কি টেলিফোন-যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে?

কারণ ভুবনেশ্বরবাবু তারপরেও বারকয়েক আমার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেছিলেন।

প্রতি শনিবারেই রাত-বারোটায় ফোনের ঘণ্টা বেজে ওঠে, আর সেই ভয়ানক কণ্ঠস্বরে শুনি 'ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার! শিগগির এসো, শিগগির!'

ভুবনেশ্বরবাবু আজও আমাকে ডাকাডাকি করেন কি না জানি না, কারণ এখন শনিবার রাত্রে টেলিফোনের ডাকে আমি আর সাড়া দিই না।

রাত আটটার চোর

[এখানে যে কাহিনিটি দেওয়া হল, এটি গল্প নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। ঘটনা-ক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকা। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।]

॥ প্রথম ॥

রাত সাড়ে তিনটে। রাস্তার এক পাশে একখানা মোটরগাড়ি। সামনের আসনে মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছে একটা লোক। কনস্টেবল লুইস শিলি নিজের ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল গাড়িখানার উপরে। এই ভাবে কেটে গেল ঘণ্টা খানেক। তারপর শিলি এগিয়ে এসে গাড়ির ভিতরে ফেললে নিজের টর্চের আলো। ড্রাইভারের আসনে বসে বসেই ঘুমোচ্ছে একটি ছোকরা। দুই চোখ মোদা। মাথাটি এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপরে। শিলির প্রথম ধাক্কায় ছোকরা নড়ে-চড়ে উঠল বটে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। দ্বিতীয় ধাক্কা দিয়ে শিলি হাঁকলে, 'এই! কে তুমি? উঠে পড়ো!'

ধড়মড় করে ছোকরা জেগে উঠল। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক! তারপর ভালো করে চেয়ে দেখে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বললে, 'তবু ভালো, পুলিশ। আমি ভেবেছিলুম ডাকাত! যা ভয় পেয়েছিলুম।'

শিলি শুধোলে, 'কে তুমি বাপু? এখানে কী করছিলে!'

—'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।'

—'নাম কী?'

—'ডেভিড টিঙ্গো।'

—'বয়স?'

—'সতেরো।'

—'বাড়ি কোথায়?'

—'ক্যামডেনে।'

—'এত রাতে বাড়িতে না গিয়ে রাস্তায় গাড়িতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে কেন?'

—'সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিলুম। হঠাৎ চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এল।'

ছোকরা জবাবগুলো দিচ্ছিল বেশ সপ্রতিভ মুখেই। তার ভাবভঙ্গিও সন্দেহজনক নয়। কিন্তু শিলি ভাবলে, তবু বলা তো যায় না, দিন-কাল যা খারাপ! চারিদিকেই চুরির পর চুরি হচ্ছে, ছোকরাকে আর একটু বাজিয়ে দেখা যাক।'

—'টিঙ্গো, তোমার গাড়ির লাইসেন্স দেখি।'

—'একটা চামড়ার ব্যাগে পুরে লাইসেন্সখানা পকেটে রেখে দিয়েছিলুম। আজ দু-দিন হল ব্যাগটা হারিয়ে গিয়েছে।'

—'বটে, বটে! তাহলে আমার সঙ্গে একবার থানায় চলো তো বাপু।'

টিঙ্গো কোনওরকম ইতস্তত না করেই শিলিকে অনুসরণ করলে।

থানায় এসে টিঙ্গো বললে, 'মা-বাবা আমার জন্যে ভাবছেন। একবার বাড়িতে ফোন করতে পারি?'

—'নিশ্চয়। ওই ঘরে ফোন আছে।'

টিঙ্গো চলে গেল। শিলি থানার 'ফাইল' ঘেঁটে দেখতে লাগল, ডেভিড টিঙ্গো নামে কোনও ছোকরা আসামির নাম খুঁজে পাওয়া যায় কি না? খোঁজা-খুঁজি ব্যর্থ হল, টিঙ্গোর নাম নেই।

টিঙ্গো বলেছে তার বাসা ক্যামডেনে। শিলি অন্য একটা ফোনের সাহায্যে সেই এলাকার থানার কর্মচারীকে ডাকলে। ডিটেকটিভ মর্গ্যান শিলির কাহিনি শুনে ক্যামডেন থানার 'ফাইল' খুঁজে বললেন, 'ডেভিড টিঙ্গো নামে কোনও ছোকরা কোনও দিন এ এলাকায় ধরা পড়েনি।' তখন শিলির বিশ্বাস হল যে টিঙ্গো তাহলে দুষ্ট ছোকরা নয়।

সে টিঙ্গোর কাছে গিয়ে বললে, 'তোমার গাড়ি আপাতত থানাতেই থাক। প্রায় ভোর হয়েছে। তুমি বাসে চড়ে বাড়ি যেতে পারবে?'

—'অনায়াসেই।'

—'বেশ। বাড়িতে গিয়ে তোমার বাবাকে একবার এখানে ডেকে আনো।'

টিঙ্গো চমকে উঠল। প্রস্তাবটা তার পছন্দ হল না। বললে, 'বাবাকে কেন? মাকে ডেকে আনলে চলবে না?'

—'বাবার নাম শুনেই তুমি চমকে উঠলে কেন?'

টিঙ্গো বললে, 'এত ভোরে বাবাকে ডাকাডাকি করলে তিনি চটে যেতে পারেন।'

—'বেশ, তাহলে যে কেউ এলেই চলবে। তোমার বাবা কি মা এসে যদি লাইসেন্সের কথা স্বীকার করেন, তবে গাড়ি ছেড়ে দিতে আমি কোনও আপত্তি করব না।'

টিঙ্গোর প্রস্থান। শিলি বসে বসে ভাবতে লাগল, সাবধানের মার নেই বলেই এত হাঙ্গামা করলুম। ছোকরা অপরাধী নয়। দেখা যাক ওর মা এসে কী বলে।

আধ ঘণ্টা পরে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। শিলি রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে 'হ্যালো!'

—'আমি ক্যামডেন থানার ডিটেকটিভ মর্গ্যান। একটু আগেই তুমি না বলছিলে, ডেভিড টিঙ্গো নামে কে এক ছোকরা তার চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে?'

—'হ্যাঁ, তাই।'

—'উত্তম। সেই ব্যাগটা আমরা পেয়েছি। ছোকরা এখন কোথায়?'

—'বাড়ি থেকে মাকে ডেকে আনতে গিয়েছে।'

—'সে ফিরে এলে থানায় বসিয়ে রেখো। আমরা এখনই যাচ্ছি।' —মর্গ্যানের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।

শিলি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ আবার কী ব্যাপার? টিঙ্গোর ব্যাগ ক্যামডেন থানায় হাজির হল কেমন করে? আর ওটা যে টিঙ্গোর ব্যাগ, তাই বা মর্গ্যান জানতে পারলে কেমন করে?

এখন সময়ে টিঙ্গোর পুনরাবির্ভাব—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন মর্গ্যান ও কেনলি দুই ডিটেকটিভ।

শিলি জিজ্ঞাসা করলে, 'টিঙ্গো, তোমার মা কই?'

—'এত সকালে মাকে টানাটানি করতে ভালো লাগল না। তাঁকে আর আনবারও দরকার নেই।'

—'কেন?'

—'আমি ভুল করেছিলুম। ব্যাগে নয়, লাইসেন্সখানা ছিল আমার বাড়ির ভিতরেই। এই নিন।'

লাইসেন্সের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিলি বললেন, 'দেখছি সব ঠিকঠাক আছে। ভালো কথা। টিঙ্গো, ক্যামডেন থানা থেকে এই দুজন ডিটেকটিভ এসেছেন তোমার সন্ধানে।'

॥ দ্বিতীয় ॥

ক্যামডেনেই তার বাসা, সেখানকার দু-দুজন ডিটেকটিভ তাকে খুঁজতে এসেছে শুনে টিঙ্গোর মুখ কেমন শুকিয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন? ব্যাপার কী?'

মর্গ্যান বললেন, 'ব্যাপার কিছুই নয় বাপু। তবে তোমার কাছ থেকে হয়তো আমরা কিছু সাহায্য পেতে পারি। দ্যাখো তো, এই চামড়ার ব্যাগটা তোমার কি না?' তিনি টেবিলের উপরে একটি ছোট্ট ব্যাগ স্থাপন করলেন।

ব্যাগটা নকল চামড়ায় তৈরি। তার উপরে মুদ্রিত আছে এক অশ্বারোহী 'কাউ-বয়ে'র ছবি। বালকরাই এরকম ব্যাগ ব্যবহার করতে ভালোবাসে।

টিঙ্গো একগাল হাসি হেসে বললে, 'বাঃ, এ তো আমারই ব্যাগ! আপনারা এটা কোথায় পেয়েছেন?'

তীক্ষ্ণ চোখে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে মর্গ্যান বললেন, 'টিঙ্গো, তুমি ওই চেয়ারে বোসো।'

টিঙ্গো বসল। চেয়ার টেনে তাকে ঘিরে বসলেন গোয়েন্দারাও।

মর্গ্যান বললেন, 'শোনো টিঙ্গো। আজই রাশি রাশি চোরাই মাল আমাদের হস্তগত হয়েছে। কেমন করে তা বলতে চাই না, কারণ সে হচ্ছে অনেক কথা। একটুকু খালি জেনে রেখো, সেইসব চোরাই মালের ভিতরে ছিল তোমার এই ব্যাগটাও। ফাউন্টেন পেন, বন্দুক, রিভলভার, জড়োয়া গয়না প্রভৃতি আরও অনেক কিছু দামি দামি জিনিসের সঙ্গে এই তুচ্ছ ব্যাগটা ছিল কেন, আমরা তা বুঝতে পারছি না। এখন তুমি যদি বলতে পারো ব্যাগটা কোথায়, কেমন করে হারিয়ে ফেলেছিলে, তাহলে হয়তো চোরের সন্ধান পেতে দেরি হবে না।'

ডেভিড টিঙ্গোর মুখ দেখে মনে হল, সে যেন দস্তুরমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। তারপর সে মাথা নেড়ে বললে, 'ব্যাগটা আমার কাছ থেকে চুরি যায়নি, ওটা আমি নিজেই কোথাও হারিয়ে ফেলেছিলুম। তবু চোরাই মালের সঙ্গে পাওয়া গেল আমার ব্যাগ, ভারী আজব ব্যাপার তো!'

মর্গ্যান বললেন, 'ব্যাগটাও হয়তো তোমার কাছ থেকেই চুরি গিয়েছে।'

—'অথচ আমি টের পাইনি!'

—'আশ্চর্য কী, হয়তো চোর তোমার পকেট মেরে সরে পড়েছিল।'

টিঙ্গো আবার মাথা নেড়ে জানাল, না।

মর্গ্যান শুধোলেন, 'তোমার ব্যাগটা কবে হারিয়ে গিয়েছে?'

—'দিন তিনেক আগে।'

—'তোমার ঠিক মনে আছে?'

—'অন্তত গেল দু-দিন থেকে ব্যাগটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না'

মর্গ্যান পকেট থেকে একখানা 'ট্রলি' হস্তান্তরপত্র বার করে বললেন, 'এ খানা কি তোমার?'

—'নিশ্চয়! যদিও ও কাগজখানা এখনও আমি ব্যবহার করিনি।'

মর্গ্যান বললেন, 'কাগজখানা তোমার ওই ব্যাগের ভিতরেই ছিল।'

আচম্বিতে টিঙ্গোর মুখ হয়ে গেল রক্তশূন্য। সে বলে উঠল, 'না, না, ও কাগজখানা আমার নয়! আমি কী বলতে কী বলে ফেলেছি। আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।'

—'হ্যাঁ, তাই দিয়েছি বটে!'

—'ও কাগজ আমার হতে পারে না। আমি বলছি, ও কাগজ আমার নয়!'

মর্গ্যান গাত্রোত্থান করে বললেন, 'টিঙ্গো, তোমাকে এখন আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। দেখছি, আমরা কোনও সাধারণ চুরির মামলা হাতে পাইনি, এর ভিতরে আছে গভীর রহস্য।'

মর্গ্যানের কথাই পরে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ডেভিড টিঙ্গো বালক মাত্র, কৈশোর অতিক্রম করে সবে যৌবনে পা দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তার মুখের উপরে আছে বালকতার সুস্পষ্ট ছাপ। অথচ তারই চারিদিক ঘিরে রচিত হয়েছিল যে জটিল ও অদ্ভুত রহস্যের জাল, তা যেমন অসাধারণ, তেমনি অভাবিত ও অতুলনীয়। আপাতত আমরাও টিঙ্গোকে পুলিশের জিম্মায় রেখে গোয়েন্দাদের সঙ্গে রহস্যজালের খেই খোঁজবার চেষ্টা করব।

চুরির হিড়িক শুরু হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে। চোরেরা হানা দেয় কলিংস রোডের মিঃ ওটো টপারকারের বাড়িতে। তারা একটা জানালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। চুরির আগে ভারী ভারী আসবাবগুলো টেনে এনে এমনভাবে সদর দরজার উপরে চাপিয়ে রেখেছিল যে, বাড়ির মালিক ভিতরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করলেই তারা সরে পড়বার সুযোগ পাবে। চুরির পর তারা বেরিয়ে গিয়েছিল খিড়কির দরজা দিয়ে।

তারপর থেকে শুরু হল চুরির পর চুরি—ক্যামডেন, কলিংস্‌উড, গ্লসেস্টার, পেনসকেন, ওকলিন, অডুবন ও হ্যাডন হাইটস প্রভৃতি সাউথ ডারসির শহরে শহরে। সর্বত্রই তাদের একই পদ্ধতি। তারা জানালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে, সদর দরজার উপরে আসবাবগুলো চাপিয়ে রাখে এবং খিড়কির দরজা দিয়ে পলায়ন করে।

এবং প্রত্যেক বারেই তাদের আবির্ভাব হয় রাত আটটার কাছাকাছি কোনও একটা সময়ে। সেইজন্যে তাদের নাম রাখা হল 'রাত আটটার চোরের দল'। তারা যে সন্ধানী চোর, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কারণ প্রত্যেক বারেই চুরির সময়ে বাড়ির লোক থেকেছে অনুপস্থিত।

অনেক দিন পর্যন্ত জনপ্রাণী চোরেদের মুখদর্শন করবার সুযোগ পায়নি। একবার মাত্র জনৈক ব্যক্তি একটি ঘটনা-ক্ষেত্রে দুই জন লোককে চলে যেতে দেখেছিল, কিন্তু সে-ও তাদের পিছন দিক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি।

অবশেষে মিঃ জ্যাফার্টির বাড়িতে তাদের একজনের খানিকটা বর্ণনা পাওয়া গেল।

ডিটেকটিভ মর্গ্যান ও কিনলির কাছে জ্যাফার্টি বললেন, 'বাড়ির অন্যান্য লোকরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আমি সব আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। রাত যখন আটটা পনেরো, তখন একতলায় কী একটা শব্দ হয়, আমারও ঘুম ভেঙে যায়। আমি বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে গিয়ে সিঁড়ির আলো জ্বেলে দিয়ে দেখি নীচেয় একটা লোক দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে আছে আমার পানে। সে আমাকে শাসিয়ে বললে, 'খবরদার, টুঁ শব্দটি কোরো না।' পর-মুহূর্তে সে সাঁৎ করে নিজের পকেটে হাত চালিয়ে দিলে—আমি ভাবলুম, এই রে, এইবারে বার করে বুঝি রিভলভার! তারপর সে রিভলভার বার করলে না বটে, কিন্তু পকেট থেকে নিজের হাত বার করে আমার দিকে একটা অঙ্গুলিনির্দেশ করে তালুতে জিভ লাগিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করলে। তার পরেই খিলখিল করে হেসে উঠে এক ছুটে বাড়ির বাইরে পালিয়ে গেল। আমি নীচেয় নেমে গিয়ে দেখি, আমার আসবাবগুলো স্থানচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু চোর সেগুলো সদর দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাবার সময় পায়নি। একটা জানালাও ভাঙা!'

গোয়েন্দারা চোরের চেহারার বর্ণনা জানতে চাইলেন।

জ্যাফার্টি বললেন, 'তার বয়স উনিশ-বিশের মধ্যেই। মাথার উচ্চতা হবে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, দেহের ওজন দুই মনের বেশি হবে না। তার মাথায় লম্বা-লম্বা চুল, সরুঙ্গে নাক, দুই গালের হাড় উঁচু উঁচু। তার চোখ দুটো ছোটো ছোটো।'

সব থানাতেই জেল খাটা বিখ্যাত বা অবিখ্যাত আসামিদের অসংখ্য ফটো সংগ্রহ করে রাখা হয়।

গোয়েন্দারা বললেন, 'লোকটার ছবি দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?'

—'পারব।'

জ্যাফার্টিকে ছবির বইগুলোর সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল—গাদা গাদা বই। কয়েক ঘণ্টা পরে ছবি দেখা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার বাড়িতে যে অনাহূত অতিথি এসেছিল, এর মধ্যে তার ছবি নেই।'

॥ তৃতীয় ॥

গেল পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরের দিনের কথা। গ্লসেস্টারের একখানা বাড়িতে গিয়ে হানা দিলে রাত আটটার চোরের দল। তার পরের দিনেই কলিংসউডে হল আবার তাদের আবির্ভাব। এ পর্যন্ত তারা যে-সব নগদ টাকা, জড়োয়া গয়না, রেডিয়ো ও ঘড়ি প্রভৃতি সরিয়ে ফেলিতে পেরেছে তার মোট দাম হবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার চেয়েও বেশি।

পুলিশের অবস্থা অত্যন্ত অসহায়। তারা উদভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে, প্রাণপণ চেষ্টার ও তদন্তের কিছুই বাকি রাখছে না, তবু নিয়মিত ভাবেই চুরি হচ্ছে আজ এখানে, কাল ওখানে—যেখানে-সেখানে। পুলিশ অতঃপর কী করবে যেন তা জানতে পেরেই চোরের দল পুলিশের আগে-আগেই গিয়ে আবির্ভূত হয় যে কোনও ঘটনা-ক্ষেত্রে।

পুলিশের খাতায় ছাড়া-পাওয়া যত দাগী চোরের নাম আছে, তাদের ভিতর থেকে প্রত্যেক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আবার ধরে এনে খোঁজ-খবর নেওয়া হল—ফল কিন্তু অষ্টরম্ভা! রাত্রে পথে পথে চৌকিদারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল। যে-সব দোকানে লোকে জিনিসপত্তর বাঁধা রাখে বা বিক্রি করে, সেখানে খানাতল্লাশ করেও একটিমাত্রও চোরাই মাল পাওয়া গেল না।

কেনলি একদিন মর্গ্যানকে ডেকে বললেন, ' চোরেরা যদি না চুরির পদ্ধতি বদলায় আর রাত আটটায় চুরি করার অভ্যাস না ছাড়ে, তবে একদিন-না একদিন আমাদের হাতের মুঠোর ভিতরে তাদের আসতে হবেই।'

তারপর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি তারিখে সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ জর্জ ব্রাউন রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে আক্রান্ত হলেন দুই জন গুণ্ডার দ্বারা।

একটা গুণ্ডা রিভলভার দেখিয়ে টাকার দাবি করে। ব্রাউন প্রতিবাদ করাতে সে রিভলভারের বাড়ি মেরে তাঁর মাথা ও মুখ ক্ষত বিক্ষত করে দেয় এবং তিনি মাটির উপরে পড়ে যান প্রায় অচৈতন্যের মতো।

পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ব্রাউনের কাছ থেকে আততায়ীর যে বর্ণনা সংগ্রহ করলে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল গত পরিচ্ছেদে জ্যাফার্টির দ্বারা বর্ণিত চোরের চেহারা।

অধিকতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় রাত আটটার সময়েই।

মর্গ্যান বললে, 'একই লোকের কীর্তি বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

কেনলি মাথা নেড়ে বললেন, 'কিন্তু আচমকা এই নতুন পদ্ধতিটা আমার ভালো লাগছে না। কোথায় বাড়িতে বাড়িতে চুরি, আর কোথায় রাজপথে রাহাজানি! চোরেরা সাধারণত নিজেদের এক-এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে, সহসা তারা নিজেদের পদ্ধতি বদলায় না। তবু বর্তমান-ক্ষেত্রে সময় আর চেহারার যে মিল দেখছি, তাও উপেক্ষা করা চলে না।'

চুরির পর চুরি চলতে লাগল, একটানা চলতে লাগল চুরির পর চুরি। চোরেদের হাত যেন দম দেওয়া ঘড়ির কাঁটা, নির্দিষ্ট সময়ে করে নির্দিষ্ট কর্তব্যপালন!

হ্যাডন হাইটের একখানা বাড়ি থেকে রাত আটটার চোরেরা নিয়ে গেল সাত লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা!

মর্গ্যান ও কেনলি থানায় বসে চোরেদের নব-নব কীর্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, হঠাৎ এল টেলিফোনের আহ্বান।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। সে মার্কেট স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁর পরিবেশিকা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'শিগগির আসুন, শিগগির! এখানে একটা লোক এসেছে—'

—'কে লোক? কী বলছ তুমি?'

—'এখানে একটা লোক কোথায় রাহাজানি করে এসে বন্ধুদের কাছে সেই গল্প বলছে। শিগগির আসুন, নইলে সে চলে যাবে।'

তখনই দুই গোয়েন্দা মোটর ছুটিয়ে দিলেন সেই রেস্তোরাঁর দিকে।

পরিবেশিকা রেস্তোরাঁর দরজাতেই দাঁড়িয়ে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল। এক ব্যক্তিকে সে দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলিনির্দেশে। সে তখন বাইরে বেরিয়ে পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছে।

তার পথরোধ করলেন গোয়েন্দারা।

সচমকে সে বললে, 'কী চান আপনারা?'

—'আমরা পুলিশ।'

সে ভয়ে ভয়ে বললে, 'তাই নাকি?'

মর্গ্যান বললেন, 'তুমি কোথায় গিয়ে রাহাজানি করেছ, এতক্ষণ সেই গল্প বলছিলে। আমরাও গল্পটা শুনতে চাই।'

—'রাহাজানি!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাহাজানি। এতক্ষণ তাই নিয়ে যে খুব মুখশাবাশি করছিলে!'

—'মুখশাবাশি? হ্যাঁ মশাই, ঠিক তাই! বন্ধু-বান্ধবের কাছে অনেকেই মুখের কথায় রাজা-উজির মারতে চায়, তা কি আপনারা জানেন না? আমি যা বলছিলুম সব বাজে বানানো কথা!'

—'তোমার নাম?'

—'অ্যান্ডি ক্লিং।'

—'আমাদের সঙ্গে থানায় চলো।'

ব্যান্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধ জর্জ ব্রাউনকেও থানায় ডেকে আনা হল।

ক্লিংকে আরও কয়েক জন লোকের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিঃ ব্রাউন, দোসরা জানুয়ারিতে যে লোকটা আপনাকে রিভলভার দিয়ে মেরে আহত করেছিল, সে কি এই দলের মধ্যে আছে?'

ব্রাউন মিনিট কয়েক ভালো করে লক্ষ করে দেখিয়ে দিলেন অ্যান্ডি ক্লিংকে!

ক্লিং যেন একেবারেই স্তম্ভিত! তারপর সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'না, না, এ সত্য নয়! উনি ভুল করেছেন!'

ব্রাউন বললেন, 'অসম্ভব! আমি যদি আরও দশ লক্ষ বৎসর বাঁচি, তাহলেও তোমার মুখ এ জীবনে ভুলতে পারব না!'

কেনলির জামার হাতা চেপে ধরে ক্লিং বললে, 'আমার কথায় বিশ্বাস করুন। এ ভদ্রলোক কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কেনলি বললেন, 'উনি তোমাকে শনাক্ত করেছেন। তবু তুমি দোষ স্বীকার করছ না কেন?'

ক্লিং বললে, 'যে দোষ করিনি তাই আমাকে স্বীকার করতে হবে?'

—'সেদিন তোমার সঙ্গে আর একজন লোক ছিল। কে সে?'

—' কেউ নয়। আমিই যখন ঘটনাস্থলে হাজির ছিলুম না, তখন আমার সঙ্গে আবার থাকবে কে?'

—'এই যে সব রাত আটটার চুরি, এর সম্বন্ধে তুমি কী জানো?'

—'আপনি কী বলতে চান? আমার বিরুদ্ধে আরও সব চুরির মামলা আছে না কি?'

গোয়েন্দারা এমনি সব প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু ক্লিংয়ের কাছ থেকে কোনও স্বীকার-উক্তিই আদায় করতে পারলেন না। তার এক কথা—সে ব্রাউনকে আক্রমণ করেনি, রাত আটটার চুরি সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানে না।

গোয়েন্দারা বুঝলেন, ব্রাউনের মামলায় ক্লিংকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু রাত আটটার চুরির মামলায় তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তখন জ্যাফার্টিকে ডেকে আনা হল, সর্বপ্রথমে যাঁর সঙ্গে রাত আটটার চোরেদের একজনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল।

তিনিও কয়েকজন লোকের ভিতর থেকে ক্লিংকে বেছে নিয়ে বললেন, 'এই লোকটিকে সেই চোরটার মতন দেখতে বটে, কিন্তু এ ভিন্ন লোকও হতে পারে।'

—'তাহলে আপনি ঠিক শনাক্ত করতে পারছেন না?'

—'প্রায় তাই-ই বটে। চোরের চেহারার সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে, এর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারব না।'

ক্লিংকে রাহাজানির মামলায় বিনা জামিনে ধরে রাখা হল।

মর্গ্যান বললে, 'ক্লিং বন্দি, এখন দেখা যাক এর পরেও রাত আটটার চুরি বন্ধ হয় কি না! তা যদি হয়, তবে বুঝতে হবে, ক্লিং সত্য-সত্যই ওই চুরিগুলোর সঙ্গে জড়িত আছে!'

॥ চতুর্থ ॥

এপারে ক্যামডেন, ওপারে ফিলাডেলফিয়া এবং দুই শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যায় ডেলিওয়ার নদী। নদী পার হয় অপরাধীরা দুই শহরে গিয়েই উৎপাত করে এবং নদী পার হয়ে গোয়েন্দাদেরও দুই শহরে গিয়েই কাজ করতে হয়।

কিন্তু ফিলাডেলফিয়ায় এ পর্যন্ত রাত আটটার চোরদের কোনও উপদ্রব হয়নি। তার বদলে ঘটতে লাগল অন্যরকম ঘটনা।

আদালতে যেদিন অ্যান্ডি ক্লিংয়ের মামলা, ঠিক সেই তারিখেই ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার গ্রুয়েস যখন নিজের ডিসপেন্সারিতে বসে আছেন, তখন দুজন লোক এসে তাঁর কাছে সর্দি-কাশির ঔষধ চাইলে।

ডাক্তার গ্রুয়েস তার সঙ্গে কথা কইছেন, হঠাৎ একটা লোক রিভলভার বার করে বললে, 'তোমার কাছে টাকাকড়ি কী আছে দাও।'

ডাক্তার বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ব্যাগটা (তার ভিতরে দুই শো টাকা ছিল) বার করে দিলেন। তবু অকারণেই তারা তাঁকে রিভলভারের দ্বারা নির্দয় ভাবে প্রহার না করে অদৃশ্য হল না।

পুলিশ ভাবলে, স্থানীয় অপরাধীর কীর্তি।

আরও দুই হপ্তা পরে ঠিক ওই ভাবেই নিজের ডিসপেন্সারিতে বসেই আক্রান্ত ও প্রহৃত হলেন ডাক্তার আর্ভিং রোসেনবার্গ। চোরেরা তাঁর কাছ থেকে হস্তগত করলে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা।

গোয়েন্দারা বললেন, 'একই দলের কীর্তি।'

দুই হপ্তা পরে স্থানান্তরে আবার সেই কাণ্ড। এবারে স্টানলি বক নামে আর এক ডাক্তারের পালা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হয়েছিল দুজন করে লোক এবং প্রত্যেক ডাক্তারের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল তাদের চেহারার বর্ণনা। কিন্তু পুলিশ তবু কোনও অপরাধীরই নাগাল পেল না।

এদিকে অ্যান্ডি ক্লিং যখন বাস করছে ক্যামডেনের জেলখানায়, তখনও বন্ধ হল না রাত আটটার চুরিগুলো।

সত্যি কথা বলতে কী, আদালতে যেদিন উঠল অ্যান্ডি ক্লিংয়ের মামলা, ঠিক সেইদিনই রাত আটটার সময়ে চোরের দল হানা দিলে কলিংসউডের একখানা বাড়িতে এবং যাবার সময়ে পিছনে রেখে গেল নিজেদের বিখ্যাত 'ট্রেডমার্ক': সেই ভাঙা জানালা, সেই সদর দরজায় চাপানো ভারী ভারী আসবাব, সেই খোলা খিড়কির দরজা।

কেনলি বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মর্গ্যান বললেন, 'ক্লিংয়ের রাহাজানির সঙ্গে এই রাত আটটার চুরির কোনও সম্পর্ক নেই।'

কেনলি বললেন, 'ক্লিং ধরা পড়বার পরও তার জুড়িদার রাত আটটার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, এও হতে পারে তো?'

মর্গ্যান বললেন, 'তাতে আর আমাদের কী সুরাহা হবে? ক্লিং তো তার জুড়িদারের নাম আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবে না?'

এদিকে চুরির পর চুরি, ওদিকে ডাক্তারের পর ডাক্তারের উপরে আক্রমণ। দুই কাণ্ডই চলতে লাগল একসঙ্গে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যে কোনও যোগাযোগ আছে, এমন সন্দেহ পুলিশের মনে ঠাঁই পেলে না। কাগজওয়ালারা খাপ্পা হয়ে উঠল। কিন্তু পুলিশ নাচার।

ডাক্তার হোরেসিয়ো ক্যাম্পবেল ডিসপেন্সারিতে উপবিষ্ট। বাহির থেকে দরজায় করাঘাত

হল। তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখলেন, তিনজন লোক বাইরের বেঞ্চির উপরে পাশাপাশি বসে আছে।

একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বড়োই ঠান্ডা লেগেছে ডাক্তার! ওষুধ-টষুধ দিতে পারেন?'

ডাক্তার ক্যাম্পবেলের বুকটা ধড়াস করে উঠল। ডাক্তারদের উপরে আক্রমণের কাহিনি তাঁর জানতে বাকি নেই। আততায়ীদের চেহারার বর্ণনাও তিনি খবরের কাগজে পাঠ করেছেন। তিনজনের মধ্যে দুই জনের চেহারা সেই বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়!

কোনও রকমে বুকের কাঁপুনি থামিয়ে শান্তভাবেই তিনি বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ঘরের ভিতরে ফিরে এসেই তিনি ধারণ করলেন টেলিফোন-যন্ত্র। তার পরেই থানার লোক পেলে তাঁর বিপদের খবর।

তারপর কাটল এক মিনিট...দুই মিনিট...তিন মিনিট। প্রত্যেকটা মিনিট কী সুদীর্ঘ! প্রত্যেক মিনিটেই ডাক্তারের ভয় হয়, এই বুঝি ডাকাতের দল হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে রিভলভার হাতে করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে! চার মিনিট.....পাঁচ মিনিট!

অবশেষে ঘরের বাইরে শোনা গেল কাদের কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। ডাক্তার বাইরে এসে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুই জন পুলিশ কর্মচারী।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তিনজন সন্দেহজনক আগন্তুকের মধ্যে দুইজন হচ্ছে সহোদর—নাম ওয়াল্টার ও ডানিয়েল গ্লেনন। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে তাদের শ্যালক, নাম ওয়াল্টার স্যামসন।

গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এখানে কী করতে এসেছ?'

—'স্যামসনের ঠান্ডা লেগেছে। আমরা ওষুধ নিতে এসেছি।

গোয়েন্দারা বললেন, 'স্যামসনের ঠান্ডা লাগার কোনও লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

স্যামসন বললে, 'ঠান্ডা লেগেছে আমার বুকের ভিতরে। আপনারা তা যদি দেখতে না পান সেজন্যে তো আমি দায়ী নই।'

—'বেশ, থানায় চলো।'

যে তিনজন ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুইজনের পাত্তা পাওয়া গেল। ডাক্তার বক কিছুক্ষণ লোক তিনজনের দিকে তাকিয়ে ওয়াল্টার গ্লেননকে শনাক্ত করলেন। এবং ওয়াল্টার স্যামসন সম্বন্ধে বললেন, ওকেও দ্বিতীয় ব্যক্তির মতো দেখতে বটে, কিন্তু আমি হলপ করে কিছু বলতে পারব না।'

ডাক্তার রোসেনবার্গও ওয়াল্টার গ্লেননকে শনাক্ত করলেন; এবং ডানিয়েল গ্লেনন সম্বন্ধে বললেন, 'ওর সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির মিল আছে বলেই মনে হচ্ছে।'

তিনজন আসামিই প্রবল প্রতিবাদ করে জানালে, তারা সম্পূর্ণরূপেই নিরপরাধ এবং ওই দুইজন ডাক্তারকে জীবনে তারা কখনও চোখেও দেখেনি।

তাদের উপরে বিনা জামিনে হাজতবাসের হুকুম হল।

॥ পঞ্চম ॥

ফিলাডেলফিয়ার ওয়াল্টার গ্লেনন ক্রমাগত প্রতিবাদ করছে—'আমি নিরপরাধ! ডাক্তারদের আমি আক্রমণ করিনি!'

ক্যামডেনের অ্যান্ডি ক্লিংয়ের মুখেও ওই একই কথা, 'আমি নিরপরাধ! মিঃ ব্রাউনের উপরে আমি হানা দিইনি!'

অথচ আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের দুজনকেই নিশ্চিতরূপে শনাক্ত করতে পেরেছেন।

এদিকে সাড়ে আটটার চোরের দল নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে পরিপূর্ণ উৎসাহে!

অবশেষে!

অবশেষে ক্যামডেনের মিসেস ক্যাথারাইন অ্যান্টনের কাছ থেকে টেলিফোনে থানায় খবর এল, তাঁর প্রতিবেশীর এক শিশুপুত্র একটি বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছে, তার মধ্যে আছে বন্দুক, জড়োয়া গয়না, ঘড়ি ও আরও হরেক রকম দামি জিনিস।

কেনলি তখনই যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে দেরি করলেন না। শিশুর নাম ফ্রেডি ডম, বয়স সাত বৎসর। সে একটা নয়, পেয়েছে তিন-তিনটে বাক্স।

একটা বাক্স খুলে দেখা গেল, তার ভিতরে রয়েছে অনেক ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, রুপোর বাসন, আংটি, হীরকখচিত সোনার গয়না, একটা রিভলভার ও কতকগুলো কার্তুজ—

কেনলির বুকের ভিতরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রক্তস্রোত! বিপুল আগ্রহে অন্য বাক্স দুটোও তিনি খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি। সে দুটো বাক্সও ওই রকম সব দামি জিনিসে ঠাসা!

এ যে রাজার ঐশ্বর্য!

দু-এক খানা গয়না পরীক্ষা করেই বোঝা গেল, সেগুলো হয়েছিল রাত আটটার চোরের দলের করতলগত!

এ যে স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য!

শিশুর দিকে ফিরে কেনলি শুধোলেন, 'খোকাবাবু, এগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ?'

—'নদীর ধারে খুব ভোরবেলায় খেলা করতে গিয়েছিলুম। সেইখানে ছুটোছুটি খেলা করতে করতে আমি আর একটু হলেই বাক্সগুলোর উপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম আর কী!'

—'তুমি বাক্সগুলো খুলে দেখেছিলে?'

—'তা আবার দেখিনি? আমি ভেবেছিলুম এগুলো হচ্ছে বোম্বেটেদের গুপ্তধন!'

—'তারপরই তুমি সোজা বাড়িতে ফিরে এলে বুঝি?'

—'উঁহু। আমার যে-সব বন্ধু বাক্সগুলোকে বাড়িতে তুলে আনবার জন্যে সাহায্য করতে চাইলে, বাক্সের কোনও কোনও জিনিস নিয়ে আগে তাদের কিছু কিছু উপহার দিয়েছিলুম।

—'কী কী জিনিস বাছা?'

—'অত কি ছাই আমার মনে আছে? যে যা চাইলে তাই!'

ফ্রেডি ডমের মায়ের দিকে ফিরে কেনলি বললেন, 'আপনি পেয়েছেন এক আশ্চর্য সৎপুত্র। বেশির ভাগ ছেলেই এ-রকম কিছু পেলে আর কারুর কাছে সে কথা প্রকাশ করত না।'

থানায় যখন বাক্স তিনটে নিয়ে আসা হল, সবাই তখন চরম বিস্ময়ে একেবারে হতবাক!

মর্গ্যান বললেন, 'এত ঐশ্বর্য নদীর ধারে পরিত্যক্ত হল কেন? যে এমন কাণ্ড করেছে, তাকে আমরা খুঁজে বার করব কোন উপায়ে?'

কেনলি বললেন, 'আমিও ও-কথা ভেবে দেখেছি। আমার কী সন্দেহ হয় জানো? ক্লিং ধরা পড়াতে তার জুড়িদার ভয় পেয়ে এই কার্য করেছে।'

—'জিনিসগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা যাক, নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।'

রাত আটটার চোরের দল যেখান থেকে যে-সব জিনিস চুরি করেছিল, পুলিশের কাছেই ছিল তার সুদীর্ঘ তালিকা।

পরীক্ষা-কার্য যখন চলছে, সেই সময়ে মর্গ্যান বাক্স হাতড়ে বার করলেন একটা নকল চামড়ার ব্যাগ। একখানা 'ট্রলি' হস্তান্তরপত্র ছাড়া তার ভিতরে আর কিছুই ছিল না।

মর্গ্যান বললেন, 'এই ব্যাগের উপরে সম্ভবত কারুর নামের দুটো আদ্য অক্ষর লেখা আছে—ডি. এল। এরকম ব্যাগ তো ছোকরারাই ব্যবহার করে। এর মানে কী?'

—'হ্যাঁ, এ ছোকরাদের উপযোগী ব্যাগই বটে।'

—'এমন এক ছোকরা, যার নামের দুটো আদ্য অক্ষর হচ্ছে ডি. এল। যদিও তা হয়তো সম্ভবপর নয়, তবু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।'

—'কী কথা?'

—'একটু আগেই গ্লসেস্টারের থানা থেকে ফোন এসেছিল, ডেভিড টিঙ্গো নামে এক ছোকরার খবরাখবর নেবার জন্যে। সে-ও নাকি তার একটা চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। ডি. এল তো ডেভিড টিঙ্গোরও নামের আদ্য অক্ষর হতে পারে।'

কেনলি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হয়ে বললেন, 'চলো, সেখানেই যাই।'

তার আধ ঘণ্টা পরেই গ্লসেস্টারের থানায় গিয়ে মর্গ্যান ও কেনলির সঙ্গে ডেভিড টিঙ্গোর যে-সব কথাবার্তা হল, আমরা তা বর্ণনা করেছি এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই।

তবু এখানে একটু খেই ধরিয়ে দেওয়া দরকার।

টিঙ্গো স্বীকার করলে ব্যাগটা তারই। তিন দিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল।

গোয়েন্দারা তাকে সেই ব্যাগের ভিতরে 'ট্রলি'-হস্তান্তরপত্রখানাও দেখালেন। প্রথমটা সেখানাও সে নিজের বলে মেনে নিলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই রক্তহীন হয়ে গেল তার মুখ। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, ওখানা আমার নয়! আমি কী বলতে কী বলে ফেলেছি! আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।'

হস্তান্তর-পত্রের উপরে ছিল গতকল্যকার তারিখ। অথচ টিঙ্গো বলে তার ব্যাগ খোয়া গেছে তিন দিন আগে! তার মানে, গতকল্যও এই ব্যাগটা ছিল তার কাছেই!

কেন সে এই মিথ্যা কথাটা বললে? পুলিশের সন্দেহ হল জাগ্রত। ডেভিড টিঙ্গোকে নিয়ে গোয়েন্দারা গেলেন তার বাড়িতে। তার বাবা তখন কর্মস্থলে গিয়েছেন। বাড়িতে ছিলেন কেবল তার মা।

তাদের বাসা খানাতল্লাশ করে সন্দেহজনক বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল একটা রিভলভার ছাড়া। সেটা বেলজিয়ামে প্রস্তুত এবং লুকানো ছিল ডেভিড টিঙ্গোর শোবার ঘরের বিছানার তলায়।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, রিভলভারটা কোথা থেকে সে পেয়েছে?

সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে, 'রাস্তায় একখানা আরোহীহীন মোটরগাড়ি দাঁড় করানো ছিল, ওটা পড়েছিল তারই পিছনের আসনে। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে একটা রিভলভার পাবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। তাই লোভ সামলাতে পারলুম না। রিভলভারটা চুপি-চুপি তুলে নিয়ে সরে পড়লুম। তার আগে জীবনে আর কোনও দিন আমি চুরি করিনি।'

তার কাছ থেকে আর কোনও তথ্য উদ্ধার করা গেল না।

রাত আটটার চোরের দল এ-পর্যন্ত যাঁদের বাড়ির উপরে হানা দিয়েছিল তাঁদের প্রত্যেককেই থানায় আহ্বান করা হল, তিনটে বাক্সে পাওয়া চোরাই মালগুলো শনাক্ত করবার জন্যে।

সেই বেলজিয়মে প্রস্তুত রিভলভারটা দেখেই জনৈক মহিলা বললেন, 'ওটা আমাদের সম্পত্তি। চোরেরা আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রিভলভারের 'ক্লিপ'টা তাড়াতাড়িতে বা ভুল করে নিয়ে যেতে পারেনি, এখনও আমাদের বাড়িতেই পড়ে আছে।'

তৎক্ষণাৎ 'ক্লিপ'টা আনিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, রিভলভারের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যায় যথাযথ ভাবেই।

কেনলি বললেন, 'টিঙ্গো, রিভলভারটা তাহলে তুমি কোনও মোটরগাড়ি থেকে চুরি করনি। তুমি যে রাত আটটার চোরেদেরই একজন, এইবারে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তুমি কি এখনও মিথ্যা কথা বলতে চাও?'

না, ডেভিড টিঙ্গো আর মিথ্যা কথা বলতে চায় না। কিন্তু সে যে-সব আজব কথা বললে, তা শ্রবণ করে গোয়েন্দাদের চিত্ত একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেল।

রাত আটটার চুরিতে তার জুড়িদার ছিল না অ্যান্ডি ক্লিং।

টিঙ্গোর একমাত্র জুড়িদার হচ্ছে তার পিতা স্বয়ং!

সে বললে, 'বাবা রোজ রাত্রে চুরি করবার জন্যে আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে হত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। তাই রাত্রে প্রায়ই আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতুম। যেদিন আপনারা প্রথম আমাকে থানায় নিয়ে আসেন, সেদিনও আমি বাবার ভয়ে রাত্রে রাস্তায় মোটরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম।'

সেই রাত্রেই ডেভিড টিঙ্গোর বাবা ধরা পড়ল। তার নাম বেঞ্জামিন টিঙ্গো। ধরা পড়েই সে অপরাধ স্বীকার করতে একটুও ইতস্তত করলে না। সে এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক—সত্যিকার ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড। দিনের বেলায় ভালো চাকরি করে, মাহিনা পায় হপ্তায় পাঁচশো টাকা। সকলেই তাকে অত্যন্ত সাধু, ভদ্র ও নম্র প্রকৃতির মানুষ বলে জানে। সে যার-পর-নাই ধর্মভীরু, নিজের বাড়ির প্রত্যেক ঘরে রাখে এক-একখানা করে বাইবেল!

সে নিজের বাড়ির একটা গুপ্তস্থান থেকে আরও চল্লিশ হাজার টাকার চোরাই মাল বার করে দিয়ে বললে, 'পুলিশ চারিদিকে ধরপাকড় করছে বলে ভয় পেয়ে আমি তিন বাক্স

চোরাই মাল নদীর ধারে ফেলে দিয়ে এসেছিলুম। সেই সঙ্গে ভ্রমক্রমে গিয়েছিল আমার ছেলের চামড়ার ব্যাগটাও।'

কিন্তু এখনও গোয়েন্দাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে নতুন নতুন বিস্ময়!

বেঞ্জামিন টিঙ্গো নিজেই বললে, 'ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তারদের উপরে হানা দিয়েছিলুম আমরাই।'

ডেভিড টিঙ্গো বললে, 'অ্যান্ডি ক্লিংকে বিনা দোষে ধরা হয়েছে। বুড়ো জর্জ ব্রাউনকে রিভলভারের দ্বারা আঘাত করেছিলুম আমিই।

তাদের কথা যে মিথ্যা নয়, সে প্রমাণ পেতেও বিলম্ব হল না। নির্দোষ ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করলে। আসামিরা গেল কারাগারে।

আর সেই ছোট্ট জর্জ ফ্রেডি ডম—যে আবিষ্কার করেছিল চোরাই মালের বাক্স তিনটে। সে উপহার লাভ করলে একখানি বাইসিকেল।

নবাবগঞ্জের সমাধি

হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলুম হাজারিবাগে।

হাওয়া নিশ্চয়ই বদলাল, মন কিন্তু বদলাল না। বাসা পেয়েছিলুম শহরের ভিতরে। সেখানে কিছু কিছু গাছপালা থাকলে কী হয়, সেই ধুলো ভরা রাজপথের পর রাজপথ, দুইধারে বাড়ির পর বাড়ি, আপিস-আদালত, হাট-বাজার, পানের দোকান, মোটর-বাস, রিকশা, লোকের ভিড়, হট্টগোল। যেন কলকাতার ক্ষুদ্র সংস্করণ! কাজের খাতিরে সব করা যায়, কিন্তু শখ করে এক শহর ছেড়ে আর এক শহরে আসার মানে হয় না।

বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র হাজারিবাগের ভক্ত। এখানে আগেও বারদুয়েক ঢুঁ মেরে গিয়েছে। বললে, 'মা ভৈঃ! এখনই হাল ছাড়বার দরকার নেই। বৈকালে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ো।'

'ধুলো ভক্ষণের জন্যে?'

—'উঁহু।'

—'তবে?'

—'সত্যিকার হাজারিবাগ দেখবার জন্যে।'

—'দশ-বারো বাইল পথ হাঁটলে অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে জানি। কিন্তু আমি অতখানি কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নই।'

—'মাইল তিন হাঁটতে পারবে?'

—'খুব পারব। সে তো কলকাতার এপাড়া ওপাড়া!'

—'তবে প্রস্তুত থেকো। আমি ঠিক সময়ে আসব।'

বৈকালে বিপিনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। সে মিথ্যা বলেনি। মাইল খানেক অগ্রসর হবার পরেই দৃশ্য পরিবর্তন আরম্ভ হল। তারপর যত এগুই তত বেশি মুগ্ধ হয়ে যাই।

আরও কিছুদূর পদ-চালনা করে দাঁড়িয়ে পড়ে বিপিন প্রশ্ন করলে, 'এখন কেমন লাগছে?'

—'চমৎকার! অপূর্ব!'

অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। দিকে দিকে নতোন্নত প্রান্তর, তার উপর দিয়ে কোথায় হারিয়ে যায় বিহ্বল দৃষ্টি। মাঝে মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে অরণ্যের শ্যামল ছন্দ। কল্পনার রহস্যবিচিত্র দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়। অনাদৃত নীলাকাশের সমগ্রতা এসে প্রবেশ করে দুই নয়নের অন্তঃপুরে। যেন ছবির জগৎ।

একখানা বড়ো পাথরের উপরে বসে পড়ে বললুম, 'হ্যাঁ, এই হচ্ছে সত্যিকার হাজারিবাগ! আজ প্রতিপদ। অন্ধকারের ভয় নেই, এইখানে কিছুক্ষণ বসে থাকলে ক্ষতি হবে না।'

—'ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।'

—'মানে?'

—'এটা হচ্ছে আষাঢ় মাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

তাকিয়ে দেখলুম। আকাশের এক প্রান্ত জুড়ে দেখা যাচ্ছে কাজলকালো মেঘ।

বিপিন বললে, 'কালো মেঘ। ওর সাথী বোধ হয় ঝড়।'

—'মেঘ তো এখনও অনেক দূরে!'

'আমাদের বাসাও তো পাশে নয়। আর একদিন এখানে এলে চলবে। আজ উঠে পড়ো।'

বিপিনের অনুমান ঠিক। খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা যখন শহরের প্রান্তে এসে পড়লুম, প্রায় গোটা আকাশই তখন মেঘাচ্ছন্ন এবং গাছে গাছে ঝোড়ো হাওয়ার একটানা চিৎকার। গায়ে পড়ল জলের কয়েকটা বড়ো বড়ো ফোঁটা। বাসা তখনও বেশ-খানিকটা দূরে।

কিন্তু বৃষ্টিকে বোধ হয় ফাঁকি দিতে পারব না—জলের ফোঁটা বেড়ে উঠল।

হঠাৎ মোড় ফিরে একটা গলির ভিতরে ঢুকে বিপিন ছুটতে ছুটতে বললে, 'এদিকে এসো।'

একটা প্রশস্ত, জীর্ণ দ্বারপথের পর খানিকটা জঙ্গলময় জমি। আলো-আঁধারের মধ্যে দেখা গেল, চারিদিকে কতকগুলো দোদুল্যমান বড়ো বড়ো গাছ এবং তাদেরই মাঝখানে সার-গাঁথা খিলানওয়ালা বাড়ি এবং তারই উপরে মস্ত একটা সুডৌল গম্বুজ।

ভাঙা সিঁড়ির ধাপ। একটা খিলানের তলা দিয়ে দালানে গিয়ে উঠলুম।

শুধালুম, 'কী এটা? মসজিদ নাকি? শেষটা বিপদে পড়ব না তো?'

—'ভয় নেই। এ হচ্ছে নবাবগঞ্জের সমাধি-ভবন। কার সমাধি জানি না, কিন্তু এখানে কেউ থাকে না।'

কৌতূহলী হয়ে টর্চের এবং তখনও যেটুকু দিনের আলোর আভাস ছিল তার সাহায্যে দেখলুম, এ হচ্ছে বহুকালের প্রাচীন সমাধিপুরী। মলিন দেওয়ালগুলো যত্নের অভাবে কালের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হলেও এখনও এখানে-ওখানে রয়েছে সূক্ষ্ম ও সুন্দর নকশার চিহ্ন। প্রচুর অর্থব্যয় করে সব দিকের মাপজোক ও ছন্দ বজায় রেখে শ্রেষ্ঠ কারিকর দিয়ে যে এই সমাধি মন্দির গড়ানো হয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আর এ সমাধি যে কোনও নবাব বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির, তাও আন্দাজ করা কঠিন নয়।

দালানের পরে দেওয়ালের গায়ে একটা কুলুপ দেওয়া দরজা—মূল সমাধি কক্ষের ভিতরে যাবার পথ। চারিধারে বোধকরি জাফরি-কাটা শ্বেতপাথরেরই পর্দা বা জানালা। পর্দায় জাফরির ছিদ্রগুলো কে বা কারা কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে—যেন বাইরের কৌতূহলী চক্ষুকে বাধা দেবার জন্যেই।

কোনও কোনও পর্দার উপর থেকে কাদামাটির প্রলেপ আবার খসে পড়েছে। একটা পর্দার ছিদ্রের উপরে টর্চ রেখে ভিতরে দৃষ্টিচালনা করলুম। ভালো করে দেখতে না পেলেও খানিকটা আন্দাজ করতে পারলুম।

মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে কক্ষতলে একটি সমাধি-বেদি। বাকি সবটা জুড়ে শূন্যতা যেন থমথম করছে। কেবল এখানে-ওখানে নীচে অন্ধকার ফুঁড়ে কতকগুলো আলোর ফিনকি জ্বলছে আর নিবছে! ঠিক যেন জোনাকি। পর্দার ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে কতকগুলো জোনাকি কি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে?

সেই মৃত্যুপুরীর অন্ধকারে জীবনের এই দীপ্তি অস্বাভাবিক বলে মনে হল।

বাইরে আকাশ যেন বলছে, ভেঙে পড়ি!

দিনান্তের শেষ আলোটুকু করেছে নিবিড় তিমিরের কোলে আত্মসমর্পণ। থেকে থেকে জেগে উঠছে কেবল লকলকে বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী জ্যোতির্ময় জিহ্বা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ বজ্রের জগৎ-জাগানো যুদ্ধ-ধ্রুপদ। হু-হু-হু-হু ঝড়ের প্রচণ্ড তাড়নায় সমাধি ভবনের আশপাশকার মস্ত মস্ত পুরানো গাছগুলো ঠিক যেন উন্মত্ত অতিকায় জীবের মতো ছটফট করতে করতে কোলাহল করছে, ভয়াবহ কোলাহল!

আর ঝরছে হুড়হুড় করে অবিশ্রান্ত জল ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম—সৃষ্টি ভাসাতে চায় যেন প্রলয়-প্লাবনে। এমন বিষম বৃষ্টি জীবনে দেখিনি—এ হচ্ছে একেবারে অভাবিত!

এক ঘণ্টা কেটে গেল, দু-ঘণ্টা যায় যায়। তবু বৃষ্টি থামল না, তার জোরও কমল না। শব্দ শুনেই বুঝলুম, নীচেকার জমি ডুবিয়ে কল-কল করে ছুটছে যেন বন্যার প্রবাহ! বড়ো রাস্তা খুব কাছেই। কিন্তু সেখানে মানুষের একটুও সাড়া নেই। কিংবা আমরা যেন মানুষের পৃথিবীর বাইরে এসে পড়েছি!

দুজনে দুই খিলানের মাঝখানকার দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছি, তবু কনকনে দমকা বাতাসের সঙ্গে বরফের মতো ঠান্ডা জলের ঝাপটা এসে হাড়ের ভিতরটা পর্যন্ত অসাড় করে দিচ্ছে।

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'বিপিন, এমন করে আর কতক্ষণ কাটবে?'

কোনও সাড়া পেলুম না। বিপিন ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? জোরে ডাকলুম, 'বিপিন!'

—'উঁ?'

—'রাস্তা এখন নদী। বাড়ি যাবে কেমন করে?'

—'হুঁ।'

—'হুঁ কী হে? যা বলছি শুনছ?'

—'আমি এখন কিছুই শুনছি না। আমি এখন ভাবছি।'

—'ভাবছ? কী ভাবছ?'

—'জাফরি কাটা পর্দার ফাঁকগুলো কাদামাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে কেন?'

—'এই নিয়ে আবার ভাবনা কীসের? এর তো সোজা উত্তর হচ্ছে, বাইরের লোকের ঘরের ভিতরে তাকানো নিষেধ।'

বিপিন উত্তেজিত স্বরে বললে, 'কেন নিষেধ? আর কেই-বা নিষেধ করে? এ হচ্ছে পোড়ো সমাধি। এর মালিক নেই। আর থাকলেও নিষেধ করবে কেন? ঘরের ভিতরে আছে তো খালি একটা গোর। ভারতের কত দেশে কত বড়ো বড়ো নবাব-বাদশার গোর দেখে এসেছি, কোথাও কেউ নিষেধ করেনি, আর এই বেওয়ারিশ সমাধি-বাড়িতেই বা নিষেধ থাকবে কেন? ভেবে দ্যাখো, যখন এই জাফরিকাটা পর্দাগুলো বসানো হয়েছিল, তখন এই নিষেধ ছিল না, কিন্তু এখন—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কী পাগলের মতো বকছ?'

—'না, আমি পাগলের মতো বকছি না।'
—'তবে তুমি কী বলতে চাও?'
—'এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে।'
—'কী রহস্য?'
—'অপার্থিক রহস্য!'
—'বিপিন, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?'
—'মোটেই নয়।'
—'তবে তোমার কথার মানে কী?'
—'মানে-টানের কথা এখন রেখে দাও। কিন্তু এইমাত্র এখান দিয়ে কে চলে গেল!'
—'কেউ চলে যায়নি।'
—'আলবত গিয়েছে। অন্ধকারে তুমি দেখতে পাওনি।'
—'তুমি দেখলে কেমন করে?'
—'আমিও দেখিনি। আমি পায়ের শব্দ শুনেছি।'
—'পায়ের শব্দ আমিও শুনতে পেলুম না কেন?'
—'তুমি অন্যমনস্ক ছিলে।'
—'যাও যাও, বাজে বোকো না।'

বিপিন তার টর্চটা জ্বেলে দালানের মেঝের উপরে উপুড় করে ধরলে। প্রায় এক ইঞ্চি পুরু ধুলোর উপরে রয়েছে একটা পদচিহ্ন।

বিপিন বললে, 'দ্যাখো'।

আমি হেসে উঠে বললুম, 'দেখব আবার কী? তুমি নিজেই বলছ এটা বেওয়ারিশ বাড়ি। বাইরের কত লোক এখানে আনাগোনা করে, কে তার হিসাব রাখে? আমরা আসবার আগেই ওই পদচিহ্নটা যে ওখানে ছিল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

বিপিন মাথা নেড়ে বললে, 'না, না, এ হচ্ছে একেবারে টাটকা পায়ের দাগ। ওই দ্যাখো একটা একটা করে আরও কতগুলো পায়ের দাগ সোজা চলে গিয়েছে। সব দাগ টাটকা। আরও কোনও কোনও বিশেষত্ব লক্ষ করেছ কি?'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'মাপ করো ভাই, আমি তোমার মতো পদচিহ্ন বিশারদ নই, কোনও বিশেষত্বই লক্ষ করিনি।'

বিপিন নিজের মনেই বলে চলল, 'প্রত্যেকটাই হচ্ছে ডান পায়ের দাগ। মানুষ তো এক পায়ে হাঁটে না! কিন্তু এখানে বাঁ পায়ের দাগ একটাও নেই। এ থেকে কী বুঝতে হবে? যে এখান দিয়ে গিয়েছে তার পা আছে একটিমাত্র! কিন্তু এই একঠেঙো লোকটা কেনই বা এখানে এসেছিল, আর গেলই বা কোথায়? আর কেই বা সে? মানুষ? না আর কিছু?'

বিপিনটা বলে কী? তার কল্পনাশক্তি যে এতটা প্রবল, আগে তা জানতুম না।

আচম্বিতে খুব জোরে একটা শব্দ হল। কে যেন কোথায় সবলে একটা দরজার উপরে ধাক্কা মারলে!

বিপিন আঁতকে উঠে বললে, 'ওই শোনো! কে ভিতরকার ঘরের দরজা খুলছে!'

ঝড়ের গর্জন কমেছে বটে, কিন্তু বড়ো বড়ো গাছগুলোর পাতায় পাতায় তখনও শোনা যাচ্ছে তার শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস। ঝুপঝুপ ঝুপঝুপ করে তখনও ঝরছে বৃষ্টি এবং গড়গড় গড়গড় করে বাজ তখনও ধমক দিচ্ছে মেঘলোকের কোনও অদৃশ্য শত্রুকে।

জাফরি-কাটা পাথুরে পর্দার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল সন্দেহজনক আলোর চঞ্চলতা!

ও আবার কী? বিস্মিত হয়ে উঠলুম। পর্দার ছিদ্রে চক্ষু সংলগ্ন করে দেখলুম, ঘরের ভিতরে অসম্ভব রকম বেড়ে উঠেছে জোনাকির ঝাঁক! পুঞ্জে পুঞ্জে তারা ঘুরছে ফিরছে উঠছে নামছে—সারা ঘরখানা জুড়ে চলেছে আশ্চর্য এক আগুন-জ্বালানোর এবং আগুন-নেবানোর খেলা! জোনাকিরা সংখ্যায় কত হবে? হাজার হাজার? না তারও চেয়ে বেশি? এত জোনাকি বাহির ছেড়ে ভিতরে এসে জুটল কেন? ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে?

ওপাশের দালানে হঠাৎ আর একটা শব্দ শুনলুম—ধুপধুপ ধুপধুপ.....পদধ্বনি?

শব্দ হচ্ছে তালে তালে তালে। কিন্তু প্রত্যেক তালের দুই মাত্রার মধ্যে একটা করে মাত্রা যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে! দুই পা ফেলে চললে প্রত্যেক শব্দের মাঝখানে আর একটা করে শব্দ শোনা যেত! এ যেন কেউ এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে!

বিপিন প্রায় কান্না ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে আসে? ও কে আসে?'

ভয় বড়ো সংক্রামক। এতক্ষণ পরে আমারও বুক ঢিপ ঢিপ না করে পারলে না। কোনও একপদ লোকের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না—এই পোড়ো সমাধি-বাড়িতে, এই ভীষণ দুর্যোগের রাত্রে!

তড়াক করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিপিন উদভ্রান্ত স্বরে বললে, 'ওই সে আসছে—এদিকেই আসছে—আমাদের দিকেই আসছে!'

ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ......

যে আসছে তাকে দেখতে কেমনধারা? তার চেহারা কি আমাদেরই মতো?

হঠাৎ দালানের ভিতরে উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি! উপরে নীচে ডাইনে বামে ঘুরে ঘুরে জ্বলে আর নিবে, জ্বলে আর নিবে উড়তে লাগল—যেন জীবন্ত অন্ধকারের হাজার হাজার চক্ষু একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে!

ধুপ ধুপ.....শব্দ খুব কাছে!

'বাবা গো!' বলে চিৎকার করে উঠেই বিপিন দালানের উপর থেকে বাইরের দিকে লাফ মারলে!

যেদিকে পদশব্দ হচ্ছিল সেইদিকের নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে সভয়ে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আমিও বিপিনের পন্থা অনুসরণ করলুম।

তখনও শান্ত হয়নি বৃষ্টিস্নাত কালো রাত্রি! তখনও মৌন হয়নি বজ্রের কণ্ঠ।

কেমন করে বাসায় ফিরলুম সে কথা না বলাই ভালো।

বৃষ্টি থেমেছে। মেঘ ভেদ করে রোদের একটি সোনালি রেখা এসে পড়েছে আমাদের সকালের চায়ের টেবিলে।

বললুম, 'বিপিন, কাল মিছেই আমরা ভয় পেয়েছিলুম।'

—'তাই নাকি? বেশ, পায়ের দাগ সম্বন্ধে তোমার মতই না হয় মানলুম। কিন্তু অমন সময়ে গোরস্থানের দরজা খুললে কে?'

—'দরজা কেউ খোলেনি, দরজার কেউ ধাক্কা মেরেছিল। হয়তো তোমার আমার মতোই কোনও অসহায় পথিক দুর্যোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ওখানে আশ্রয় নিতে এসেছিল। ধাক্কা মেরে দরজাটা বন্ধ দেখে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছিল।'

বিপিন ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'তারও কি একটা পা নেই।'

—'স্থান-কালের মহিমায় আমাদের মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। হয়তো কারুর হাতের মোটা লাঠির শব্দকেই আমরা পায়ের শব্দ বলে ভুল করেছিলুম।'

—'তাই যদি তোমার বিশ্বাস, তাহলে আজকের রাতটা তুমি আবার ওখানে গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারো?'

—'পাগল? গোরস্থান কি জ্যান্ত ভদ্রলোকের রাত কাটাবার জায়গা?'

বিপিন ঠোঁট টিপে একটুখানি হাসলে, আর কিছু বললে না।

ভূত আর ভূতনাথ

সে-বছরে আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সবে কলেজি লেখাপড়া শুরু করেছি। আমি, অখিল ও ভূতনাথ।

সাঁওতাল পরগণায় অখিলদের একখানা ছোটো বাংলো ছিল। স্থির করলুম অখিলের সঙ্গে সেখানে গিয়ে গোটাকয়েক দিন আনন্দে কাটিয়ে আসব।

ভূতনাথ খবর পেয়ে আমার কাছে এসে শুধোলে, 'তোমরা নাকি বেড়াতে যাচ্ছ?'

—'খালি বেড়াতে নয়, ভ্রমণের সঙ্গে উদরপোষণ করতে।'

—'কলকাতা ছেড়ে সাঁওতাল পরগণায় গিয়ে উদরপোষণ! খাবে কী? পাথর, বালি, গাছের পাতা?'

—'উঁহু, ওখানে এখনও জলের দরে মুরগি পাওয়া যায়।'

এতক্ষণ ভূতনাথ ছিল উদাসীন। কিন্তু এইবারে তার আগ্রহ জাগ্রত হল। বললে, 'ও, তাই নাকি? প্রতিদিন প্রত্যেকের ভাগ্যে একটা করে রামপাখি জুটবে নাকি?'

—'অনায়াসে। দরকার হলে দুটো করেও জুটতে পারে।'

সে যে তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করে ফেলবে আমরা তা জানতুম। সে ছিল পয়লা নম্বরের উদরপিশাচ, তাই আমরা তার নাম দিয়েছিলুম 'পেটুক ভূতনাথ।' পরিপূর্ণ মাত্রায় উদরপূজা করবার সুযোগ পেলে সে হয়ে উঠত দস্তুরমতো দুর্দমনীয়।

ভূতনাথ দৃঢ়স্বরে বললে, 'তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

প্রতিবাদ নিস্ফল হবে বুঝে আমরা আর উচ্চবাচ্য করলুম না।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে একটা রাত কাটিয়েই পরদিন সকালে হাটের পথে নরেশ ও তার বন্ধু পরেশের সঙ্গে দেখা। আগে তারাও আমাদের সহপাঠী ছিল, কিন্তু গতবারের পরীক্ষায় ফেল করে আমাদের নাগাল ধরতে পারেনি। নরেশ ধনীর সন্তান, পরেশও গরিবের ছেলে নয়।

আমি বললুম, 'আরে, তোমরাও এখানে! কোথায় উঠেছ হে?'

নরেশ বললে, 'কেন, এখানে যে আমাদেরও একখানা বাড়ি আছে। অখিল তো সে কথা জানে।'

অখিল বললে, 'হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু সে-বাড়ি তো ভাড়া দেওয়া হয়, এই পুজোর সময়ও সেখানা কি খালি পড়ে আছে?'

নরেশ বললে, 'হ্যাঁ, এবারে সে-বাড়ির ভাড়াটে জোটেনি। তাই দুটো দিন কাটিয়ে দিতে এসেছি।'

—'মাত্র দুটো দিন!'

—'হ্যাঁ। বাড়িখানার একটা ব্যবস্থা করেই ফিরে যাব। গুরুজনের আদেশ। তবে সেই ফাঁকে আর একটা কাজও সারতে চাই। এখানে নদীর ধারে পাওয়া যায় বালিহাঁস আর বন্য কুক্কুট। আমরা দুজনে দুটো বন্দুক নিয়ে তাদের সঙ্গেও মুলাকাত করতে যাব।'

আমি বললুম, 'আমরাও যদি তোমাদের সঙ্গী হই, আপত্তি করবে না তো!'

—'আরে, সে তো সুসংবাদ! পার্টি জমবে ভালো।'...

অখিল বললে, 'তোমাদের বাড়ি আমি চিনি। বৈকালেই আবার দেখা হবে।'

ভূতনাথ রীতিমতো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা?'

ভূতনাথের উদরপরায়ণতার কথা কারুর কাছেই অবিদিত ছিল না। ফিক করে হেসে ফেলে নরেশ বললে, 'মাভৈঃ! সে ভারও আমরা নেব।'

আমি বললুম, 'আমরাও তোমাদের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে যাব।'

—'যথা?'

—'রামপাখির 'স্যান্ডউইচ' আর একটি 'এয়ার-টাইট' টিনে ভরা রসগোল্লা।'

—'আহা, সে তো হবে সোনায় সোহাগা!'

যথাসময়ে নরেশদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ি! অবস্থান সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়, মাঠ ও বন। কাছেই নদীর তীর। কানে আসে খালি নদীর জলতান আর পাখির কলগান।

ভূতনাথ উৎসুক হয়ে বললে, 'এইবারে চা-চক্রের আয়োজন হবে তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'সেই সঙ্গে আমাদের 'স্যান্ডউইচ' প্রভৃতি?'

নরেশ মাথা নেড়ে বললে, 'না, এখন খালি চা, আমাদের তাড়াতাড়ি আছে। নদীর ধারে গিয়ে শিকারের জায়গাটা একবার তদারক করে অন্ধকার নামবার আগেই আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। তারপর 'স্যান্ডউইচ' আর রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করলে কোনই ক্ষতি হবে না।'

—'আজ তো জ্যোৎস্না আছে। অন্ধকার এলেও ভয়টা কীসের?'

—'যে দারোয়ান আর মালির উপরে বাড়ি দেখবার ভার আছে, আর অন্ধকার হবার আগেই তাদের ছুটি দিতে হবে। একটা ঠিকে চাকরও রেখেছি, সে-ও রাত্রে এখানে থাকতে নারাজ।'

—'কী আশ্চর্য! কেন?'

নরেশ বাধো-বাধো গলায় বললে, 'নিতান্তই শুনবে তাহলে?'

—'নিশ্চয়ই! রাত্রে এখানে কেউ থাকতে চায় না, এর মানে কী?'

—'শোনো তবে। আমাদের বাড়ির শেষ ভাড়াটিয়া গেল বছরে এখানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই বাড়িখানার বদনাম হয়ে গেছে, কেউ আর ভাড়া নিতে চায় না। সবাই বলে, প্রতি রাত্রেই এখানে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। সেইজন্যেই তো একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

ভূতনাথ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে দুইচক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'কচুপোড়া কী ব্যবস্থা করবে শুনি? রোজা ডাকবে? ভূতকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে থানায় খবর দেবে?'

নরেশ বললে, 'ও-সব কিছুই করব না। আমি এখানে দুটো রাত্রি বাস করে প্রমাণিত করব, এ বাড়িতে ভূতের ভয়টয় কিছুই নেই—ওসব হচ্ছে দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা মাত্র।'

ভূতনাথ হনহনিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'বেশ তাই কোরো। কিন্তু আমি এই চললুম।'

আমি বললুম, 'ওহে ভূতনাথ, যাও কোথায়?'

—'অখিলের বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি।

—'সে কী, রাত্রে পেটের খোরাকের ব্যবস্থা না করেই?'

—'আলবত! পেটের খোরাক জোগাতে গিয়ে আমি ভূতের খোরাক হতে রাজি নই।'

অখিল ডাকলে, 'ওহে ভূতনাথ! শোনো, শোনো! অন্তত খানকয় 'স্যান্ডউইচ' আর গোটাকয় রসগোল্লা নিয়ে যাও!'

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! লম্বা লম্বা পা ফেলে ভূতনাথ হল অদৃশ্য।

নরেশ বললে, 'ভূতনাথটা খালি পেটুক চূড়ামণি নয়, কাপুরুষদের মধ্যেও অধমাধম। চুলোয় যাক, এসো আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

নদীর ধার থেকে সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে এলুম।

প্রথমেই ভূতনাথ, তারপর এখন আবার দারোয়ান, বেয়ারা ও মালিরও দ্রুতপদে পলায়ন দেখে আমরাও বুকটা ছাঁৎ ছাঁৎ করতে লাগল। অখিল, নরেশ ও পরেশেরও শুকনো মুখ দেখে বুঝলুম, কারুর অবস্থাই ভালো নয়। ভয় হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতো।

তার উপরে আর এক অভাবনীয় ব্যাপার—যাক এলে একেবারেই আক্কেলগুড়ুম!

একটা বাস্কেটের ভিতর ছিল দুই ডজন ফাউল স্যান্ডউইচ ও এক টিন রসগোল্লা, কিন্তু আতিপাঁতি করে খোঁজবার পরও তার আর কোনও চিহ্নই আবিষ্কার করা গেল না।

আমি বললুম, 'তবে কি—'

অখিল বাধা দিয়ে বললে, 'যেতে দাও,—যা হবার তা হয়ে গেছে!'

আহারাদি সারবার পর প্রায় সারা রাতটাই কী অস্বস্তি ও হৃৎকম্পের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে যে কেটে গেল, তা আর বর্ণনায় বোঝানো যাবে না। খোলা মাঠের দমকা বাতাস এসে জানালায় শব্দ তুললেই নরেশ ও পরেশ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি বন্দুক বাগিয়ে ধরে!

আমি বলি, 'ও কিছু নয়।'

অখিল বলে, 'বন্দুক ছুড়ে অশরীরীকে শিকার করা যায় না!'

নরেশ বলে, 'আবার অশরীরী কথা তোলো কেন? লোকের মুখে কি গল্প শোননি? অশরীরীরাও মাঝে মাঝে শরীরী হয়, আর মানুষের হাত থেকে ইলিশমাছ ছিনিয়ে নেয়? আজকেই কি এখান থেকে খাবারের বাস্কেটটা অদৃশ্য হয়নি?'

পরেশ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'উঃ, রাতটা কাটলে বাঁচি!'

ভূতনাথ সময় থাকতে সরে পড়ে যথার্থ বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে বলে মনে হল। কেবল একটু মাথা খাটিয়ে কিছু মিষ্টি আর 'স্যান্ডউইচ' নিয়ে গেলেই তাকে আজ আর উপোস করতে হত না।

অবশেষে পূর্বাকাশ সামান্য ফরসা হতেই আমরা চটপট বাইরে বেরিয়ে পড়ে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

চুলোয় যাক ভূত-টুত, আর আমাদের পাত্তা পায় কে? মস্ত মস্ত বীরের মতো ছুটলুম সবাই নদীর দিকে।

শিকার রীতিমতো সফল। লাভ হল পাঁচটা বন্য কুক্কুট ও চারটে বালিহাঁস।

অরণ্য ও ধু ধু মাঠ রোদে সোনালি—কোথাও নেই ভৌতিক প্রতিবেশ। যেখান থেকে সভয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলুম, বুক ফুলিয়ে ফিরে এলুম সেইখানেই।

বিস্মিত চোখে দেখলুম, বাগানের খাসজমিতে পদচারণ করছে প্রশান্ত মুখে ভূতনাথ!

একগাল হেসে বললে, 'দিনের বেলায় আমার ভূতের ভয় থাকে না। তাই নরেশের নিমন্ত্রণ রাখতে এলুম।'

বললুম, 'তা বেশ করেছ! কিন্তু কাল রাতটা মিছে উপোস করে মরলে কেন? কিছু মিষ্টি আর 'স্যান্ডউইচ' নিয়ে গেলেই তো পারতে!'

মুচকে হেসে ভূতনাথ বললে, 'কে বলে আমি উপোস করেছি—আমি কি সেই ছেলে ব্রাদার? তোমার কি খাবারের 'বাস্কেট'টা খুঁজে পেয়েছ?'

সচমকে বললুম, 'তবে কি ভূত নয়, ভূতনাথই 'বাস্কেট'টা নিয়ে উধাও হয়েছে?'

ভূতনাথ বেশ সপ্রতিভ মুখেই বললে, 'তা ছাড়া আর কে? খাবারের কথা আমিও তাড়াতাড়িতে ভুলেই গিয়েছিলুম, যথাসময়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে অখিলকে ধন্যবাদ! খানিক দূর গিয়েই ভেবেই দেখলুম—তাই তো, তোমরা তো নরেশের এখানে মজা করে 'ডিনার' খাবে, আর আমিই বা খামকা উপোস করে মরি কেন? আবার এখানে ফিরে এসে দেখলুম তোমরা সবাই বেরিয়ে গিয়েছ। অতএব—'

সবিস্ময়ে বললুম, 'অতএব তুমি সেই দুই ডজন 'স্যান্ডউইচ' আর একটিন রসগোল্লা একাই নিজের উদরগহ্বরের নিক্ষেপ করেছ?'

—'আরে, ও হচ্ছে আমার কাছে নস্য ভাই, নস্য! দরকার হলে আমি অনায়াসেই পাঁচ ডজন 'স্যান্ডউইচ' আর দু-টিন রসগোল্লা উড়িয়ে দিতে পারি!'

নরেশ চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, 'ভূতনাথ, তোমারই জয়জয়কার!'

নিশাচরী বিভীষিকা

'নিশাচরী বিভীষিকা' গ্রন্থটি দেবসাহিত্য কুটীরের বিচিত্রা সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ। এই সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ 'গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন', 'বাঘরাজের অভিযান', 'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর' হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর যথাক্রমে ঊনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ খণ্ডভুক্ত হয়েছে।

॥ প্রথম ॥

পরিবীক্ষণের ম্যাজিক

আমরা প্রভাতি চা পান করি প্রতিদিন বেলা আটটার সময়। আমরা মানে ভারতভূষণ এবং আমি।

ভারত সেদিন এক পেয়ালার উপরে চড়ালে আর এক পেয়ালা চা। আমি এক পেয়ালাতেই তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে উঠে অন্য এক টেবিলের ধারে গিয়ে বসলুম। এইখানে বসে খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে আমার দৈনন্দিন অভ্যাস। কিন্তু কাগজের উপরে হস্তক্ষেপ করবার আগেই আর একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি সেইদিকেই অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম।

আমি ছিলুম ভারতের পিছন দিকে। সে কিন্তু চা পান করতে করতে হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ ভাই ভাস্কর, ও জিনিসটা এখানে কেমন করে এল আমিও তাই ভাবছি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, 'তোমার পিছনেও চোখ আছে নাকি হে? আমি কী ভাবছি তুমি কেমন করে জানলে?'

ভারত বললে, 'যার পর নাই সহজ উপায়ে। ঘরের ওই দিকটায় তেপায়ার উপরে একখানা কামাবার আয়না রয়েছে, তার ভিতরেই তোমার মুখ আর মনের কথা ছবির মতো ফুটে উঠেছে যে।'

আমি হেসে উঠে বললুম, 'বোঝা গেল। কিন্তু বলতে পারো, ঘরের কোণে ওই লাঠিগাছা কেমন করে এল? ওটা তো আমাদের কারুরই লাঠি নয়!'

ভারত বললে, 'কেমন করে যে এসেছে তা আমি বুঝতে পারছি।' তারপর গলা তুলে ডাকলে, 'মাধু, ও মাধু!'

ভৃত্য মাধবের প্রবেশ।

—'মাধু, কাল সন্ধের পর কে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

মাধব বললে, 'একটি ভদ্দরলোক। অনেকক্ষণ বসে বসে দেখা না পেয়ে তিনি চলে গেলেন।'

—'আচ্ছা মাধু, তুমি যাও। ভাস্কর, লাঠিগাছা আমার দিকে এগিয়ে দাও তো দেখি।'

লাঠিগাছা হাতে করে নিয়ে ভারত কিছুক্ষণ তা পরীক্ষা করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'রুপো বাঁধানো বেশ মোটা আর ভারী লাঠি। শৌখিন লাঠি নয়, মালিক এর উপরে যথেষ্ট নির্ভর করেন। বাবুয়ানা দেখাবার জন্যে তিনি লাঠি নিয়ে বাইরে বেরোন না।

লাঠির রুপোর পাতে তিনটে হরফ খোদা আছে—এফ. এন. জি। এই আদ্য অক্ষর তিনটে দেখে আন্দাজ করছি ভদ্রলোকের নাম ফণীন্দ্রনাথ, কারণ এফ আর এন দিয়ে যে সব বাঙালির নামের আদ্য অক্ষর হয়, তার নাম ফণীন্দ্রনাথ হওয়াই সম্ভব। উপাধির কথা জোর করে বলতে পারি না—ঘোষ বা গাঙ্গুলি বা আর কিছুও হতে পারে। ফণীন্দ্রবাবু

বয়সে প্রবীণ। তিনি কলকাতার লোক নন, পল্লিগ্রামে থাকেন, প্রায়ই তাঁকে বাড়ির বাইরে অনেকটা করে সময় কাটিয়ে দিতে হয়। তাঁর কুকুরেরও শখ আছে। কুকুরটা ফক্সটেরিয়ারের মতো ছোটো বা মাস্টিফের মতো আকারে বড়ো নয়, তবে ওই দুয়েরই মাঝামাঝি, স্পানিয়্যালও হতে পারে।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'লাঠি দেখেই ওসব কী তুমি বলছ!'

ভারত বললে, 'শখের খাতিরে যিনি লাঠি ব্যবহার করেন না, বয়সে তাঁর প্রবীণ হওয়াই উচিত। লাঠির তলার দিকটা কীরকম ক্ষয়ে গেছে দ্যাখো। এখেকে প্রমাণিত হয় ভদ্রলোক লাঠির উপরে ভর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেন যথেষ্ট। নিশ্চয় তাঁর পেশাও হচ্ছে এমন কিছু, যার জন্যে তাঁর বাড়ির ভিতরে বসে থাকা চলে না। তিনি ডাক্তারি করেন শুনলেও আমি অবাক হব না। লাঠির তলায় কাঁচামাটির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ঘাসের টুকরোও লেগে রয়েছে। যে মানুষ কলকাতার রাস্তায় হাঁটে, তার লাঠির তলায় এসব থাকবার কথা নয়। তারপর লাঠির মাঝখানটা ভালো করে দ্যাখো। কতকগুলো দাগ দেখতে পাচ্ছ? এসব হচ্ছে কুকুরের দাঁতের দাগ। ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর থাকে, সে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মাঝে মাঝে এই লাঠিটা বহন করে। আমরা অনেকেই খেলাচ্ছলে কুকুরকে এইরকম সব ছোটো ছোটো জিনিস বহন করতে শেখাই। লাঠির উপরে দাঁতগুলোর ফাঁক আর চিহ্নগুলোর আকার দেখে অনুমান করা চলে, কুকুরটা খুব ছোটো বা খুব বড়ো নয় আকারে মাঝারি। আরে, ওই শোনো, রাস্তায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল না? এইবারে ঘরের বাইরেও কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। বোধহয় অবিলম্বে হবে লাঠির মালিকের আবির্ভাব।' তারপর ঘরের ভিতরে একটি মূর্তি প্রবেশ করতেই সে আবার বলে উঠল, 'নমস্কার ফণীবাবু, আসুন, আসনে আসীন হোন, কিন্তু আপনার কুকুরটা কোথায় গেল?'

আগন্তুক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই ভারতের কথা শুনে আসন গ্রহণ করবেন কী, সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর হতভম্বের মতো বললেন, 'আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে? আর আমার সঙ্গে যে একটা কুকুর আছে সে কথাই বা কে আপনাকে বলে দিলে?'

ভারত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'বলে দিলে আপনার এই লাঠি। সেসব কথা পরে শুনবেন। আপাতত, আপনার কুকুরটা কোথায় গেল বলুন দেখি? এইমাত্র যে তার আওয়াজ শুনলুম। ও, বুঝেছি। পাছে ভদ্রসমাজে এসে সারমেয়সুলভ ব্যবহার করে, সেই ভয়ে আপনি তাকে বাইরেই বেঁধে রেখে এসেছেন?'

ভদ্রলোকের হতভম্ব ভাব তখনও দূর হল না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে তিনি বললেন, 'সবই যখন জানেন, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

—'অনুগ্রহ করে এইবারে আপনি আসন গ্রহণ করুন।'

আসনস্থ ভদ্রলোকের বয়স হবে ষাটের কাছাকাছি। তাঁর পকেটের কোণ থেকে স্টেথস্কোপ উঁকি মারছে দেখেই বুঝলুম, তিনিও আমারই মতন ডাক্তার। তাঁর পরনে কোট ও ধুতি।

জুতোর তলাতে শুকনো কাদার দাগ—এখন বর্ষাকাল নয়, কলকাতার পথিকদের জুতোয় এ রকম দাগ লেগে থাকে না।

ভারত বললে, 'আপনার নাম তো ফণীবাবুই?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ফণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।'

—'লাঠিগাছা কাল ফেলে গিয়েছিলেন, তাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন বুঝি? এই নিন।'

হাত বাড়িয়ে নিজের লাঠিটা গ্রহণ করে ফণীবাবু বললেন, 'কিন্তু কেবল লাঠি নিতেই আমি এখানে আসিনি। আমার আসার আসল উদ্দেশ্য আপনার সঙ্গে দেখা করা।'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'কোনও গুরুতর বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি পরামর্শ করতে এসেছি।'

—'উত্তম। কিন্তু আপনি তো দেখছি সিগারেটের একটি গোঁড়া ভক্ত। আপনার সামনেই টেবিলের উপরে আমার সিগারেট কেসটা পড়ে রয়েছে, আগে অনুগ্রহ করে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ফেলুন।'

—'দেখছি আমার সব কথাই আপনি এর মধ্যেই জেনে ফেলেছেন। আপনি কি গণৎকার?'

ভারত খিলখিল করে হেসে বললে, 'মোটেই নয়, মোটেই নয়। আপনার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার দিকে তাকালে যে-কোনও লোক বলে দিতে পারে, আপনি ধূমপানে মশগুল হয়ে থাকতে ভালোবাসেন। আপনার ও-দুটি আঙুলের উপরে নিকোটিনের হলদে রং যে পাকা হয়ে বসে গিয়েছে!'

একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ফণীবাবু বললেন, 'কুসুমপুরের বিখ্যাত জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরির নাম শুনেছেন কি?'

ভারত বললে, 'শুনেছি বই কি! আর মাস তিনেক আগে কাগজেও পড়েছি যে, অভাবিত আর আকস্মিক ভাবে বীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাঁর কথাই বলছি। বীরেন্দ্রবাবু ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু।'

—'খালি তাই নয়, বোধহয় আপনিও ছিলেন তাঁর বিশেষ চিকিৎসক!'

ফণীবাবুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপরেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন, 'না মশাই, এবারে কিন্তু আপনি আর আমাকে বিস্মিত করতে পারলেন না। আমার পকেটে স্টেথস্কোপ দেখেই আপনি এ কথা বলছেন তো?'

—'না ফণীবাবু, আপনি আসবার আগেই আমি অনুমান করতে পেরেছিলুম যে আপনি হচ্ছেন চিকিৎসক। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপাতত কুসুমপুরের জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণের কথাই বলুন।'

ফণীবাবু পকেট থেকে একখানা খবরের কাগজ বার করে বললেন, 'বীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর একখানি সংবাদপত্রে একটা বিবরণ প্রকাশিত হয়। নিজের কথা বলবার আগে আমি সেই কাগজের বিবরণটাই পাঠ করে আপনাদের শোনাতে চাই।'

॥ দ্বিতীয় ॥

সংবাদপত্রের সন্দেশ

'গত সপ্তাহে কুসুমপুরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরির আকস্মিক পরলোক গমনের কথা আমরা প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার এই মৃত্যু স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা নিজেদের কোনও মতপ্রকাশ করিতে চাই না। কিন্তু কুসুমপুরের জমিদার বংশের সহিত একটি যে অদ্ভুত কিংবদন্তি জড়িত হইয়া আছে, এইখানে আমরা তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

কুসুমপুরের জমিদার বংশ অতিশয় প্রাচীন। বীরেন্দ্রনারায়ণের উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের অতীতের মধ্যে অতদূর পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না, কারণ উপরোক্ত কিংবদন্তির উৎপত্তি হইয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে—অর্থাৎ আনুমানিক দেড় শতাব্দী পূর্বে। বলা বাহুল্য, সে-সময়টাকেও আধুনিক কাল বলা যাইতে পারে না।

বীরেন্দ্রনারায়ণের পিতার নাম ছিল ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং পিতামহের নাম হীরেন্দ্রনারায়ণ।

হীরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন অতিশয় আমোদপ্রিয় ও বিলাসী যুবক। তাঁহার বিলাসিতার ও খামখেয়ালির খোরাক সরবরাহ করিতে গিয়া কুসুমপুরের সুবৃহৎ জমিদারির অনেক অংশই জমিদার বংশের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল। সেকালের লোকের মতে, হীরেন্দ্রবাবু কেবল আমোদপ্রিয় ও বিলাসীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন ভীষণ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল। ভগবান বা শয়তান কাহারও তোয়াক্কা মানিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। যে-কোনওরূপ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য যে-কোনও অন্যায় কার্য করিতে তিনি ছিলেন সর্বদাই প্রস্তুত। তাহার উপরে সুরা ও নারী নহিলে তাঁহার একেবারেই চলিত না।

কুসুমপুর হইতে পনেরো মাইল দূরবর্তী হইলেও সোনারগঞ্জ গ্রাম ছিল হীরেন্দ্রবাবুরই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। সেই গ্রামে এক দরিদ্র বালবিধবা বাস করিত, তাহার নাম সরোজিনী। সে ছিল উদ্ভিন্নযৌবনা এবং পরমাসুন্দরী। হীরেন্দ্রবাবুর লুব্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তাহারই দিকে।

কুপ্রস্তাব লইয়া হীরেন্দ্রবাবুর এক অনুচর যায় সরোজিনীর নিকটে। সরোজিনী ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তাহার পর তাহাকে অনেক টাকার প্রলোভন দেখানো হয়। তথাপি সে হীরেন্দ্রবাবুর উপপত্নী হইতে সম্মত হয় নাই। ফলে হীরেন্দ্রবাবুর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

সে এক অমাবস্যার রাত্রি। চন্দ্রহারা পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছিল যেন নিবিড় তিমিরসাগরের অতলজলে। সমস্ত কুসুমপুর যখন নিশীথরাত্রে গভীর নিদ্রায় অচেতন, সেই সময় জমিদারবাবুদের আলোকোজ্জ্বল বৈঠকখানার মধ্যে চলিতেছিল বীভৎস হই-হল্লোড় ও প্রমোদোৎসব। ওস্তাদের আদিরসাত্মক সংগীতে, নর্তকীর নূপুরনিক্কণে এবং পানোন্মত্ত শ্রোতাগণের বিকট ও বেতালা চিৎকারে নৈশ অন্ধকার পর্যন্ত যেন মুখরিত ও শিহরিত হইয়া উঠিতেছিল।

হীরেন্দ্রবাবুর নেশা তখন চরমে চড়িয়াছিল। উৎসবের মাঝখানে অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তিনি সঙ্গী-বন্ধুদের সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'সরোজিনীকে না পেলে আমার শান্তি নেই! যেমন করে পারি, আজই তাকে আমি এইখানে নিয়ে আসব। বেশি লোক নিয়ে গোলমাল করা নয়, তোমাদের ভেতর থেকে কেবল দুজন আমার সঙ্গে চলে এসো! দেখা যাক তারপর কী হয়!'

আস্তাবলের ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া আনা হইল তিনটি বেগবান ও তেজীয়ান অশ্ব। তাহার পর অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনজনে মিলিয়া অগ্রসর হইল সোনারগঞ্জ গ্রামের দিকে।

কুসুমপুরের জমিদারবাড়ির উত্তরে আছে প্রকাণ্ড এক জলাভূমি। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তাহার বিস্তার কোথাও পাঁচ, কোথাও বা সাত মাইল। এই সমস্ত জায়গাটা অবশ্য জলাভূমির মতো সম্পূর্ণরূপে জলে পরিপূর্ণ নহে। মাঝে মাঝে আছে ঝোপঝাপ, অরণ্য। এক জায়গায় আছে বিরাট একটা স্তূপের মতো উচ্চভূমি এবং তাহারই মধ্যে পাওয়া যায় একটি অতি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। সেখানে ছোটো ছোটো কয়েকখানি ঘর এখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই; সময়ে সময়ে ভবঘুরে বেদিয়ার দল সেইসব ঘরের ভিতরে আসিয়া কয়েকদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে বাস করিয়া যায়। কিন্তু কুসুমপুরের কোনও বাসিন্দা সহজে সেইদিকে অগ্রসর হইতে চায় না। কারণ জলাভূমির ভিতর দিয়া কোনও কোনও পথের রেখা দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সুপথ কি কুপথ বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কোনও কোনও পথ গিয়া পড়িয়াছে বিপদসংকুল চোরাবালিরর ভিতরে; উপর হইতে সেসব জায়গা দেখিলেও কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে গেলেই হস্তীর মতো প্রকাণ্ড জীবও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, একেবারে পাতালের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পথ চিনিয়া সেখান দিয়া আনাগোনা করিতে পারে বটে, কিন্তু অন্যান্য সকলেরই পক্ষে জলাভূমির সেইসব দুর্গম পথে পদচারণা করা হইতেছে আত্মহত্যারই নামান্তর।

জলাভূমির সেই ভগ্নস্তূপ নাকি মধ্যযুগের কোনও বিক্রমশালী রাজার প্রাসাদেরই ধ্বংসাবশেষ এবং চলতি প্রবাদে শোনা যায়, তাহার ভিতর সন্ধান করিলে গুপ্তধনও আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু প্রাণের চেয়ে গুপ্তধন অধিকতর লোভনীয় নয়। কাজেই আজও জনসাধারণের মধ্যে সেদিকে অগ্রসর হইবার সাহস একেবারেই জাগ্রত হয় নাই। বহুকাল পূর্বে দুই-এক জন দুঃসাহসিক ব্যক্তি নাকি সেই বিপজ্জনক চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কুসুমপুর হইতে সোনারগঞ্জে যাইতে গেলে পথের পাশে পড়ে এই ভয়াবহ জলাভূমির খানিক অংশ। হীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁহার অন্য দুই অশ্বারোহী বন্ধু যখন জলাভূমির পাশ দিয়া সোনারগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়া যান, তখন কোথাও কোনও বিপদের সংকেত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দূরে, আরও দূরে নিরেট অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া মাঝে মাঝে আলেয়ার আলো ফুটিয়া উঠিতেছিল, সকলে যাহা অপার্থিব ও ভয়াবহ বলিয়া মনে করে।

কিন্তু হীরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি তখন ছিলেন অতিরিক্ত মদ্যপানে বিহ্বল, আলেয়ার আলো দেখিয়াও তাঁহাদের চিত্তে কোনওই ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। অম্লানবদনে বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া যথাসময়ে তাঁহারা সোনারগঞ্জে গিয়া পৌঁছিলেন এবং কেমন করিয়া অভাগিনী সরোজিনীকে তাঁহারা হরণ করিয়া আবার কুসুমপুরের দিকে ফিরিয়া আসিলেন, এখন সেসব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সরোজিনী ছিল অশ্বের উপরে হীরেন্দ্রবাবুরই বাহুবন্ধনে বন্দিনী।

অশ্বারোহীরা আবার কুসুমপুরের নিকটস্থ হইল। প্রথম কিছুক্ষণ ধরিয়া সরোজিনী প্রাণপণে তারস্বরে আর্তনাদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোনও ব্যক্তিই আগাইয়া আসে নাই। তাহার পর সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

পথের পার্শ্বদেশে দেখা গেল সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই জলাভূমির উপরে আলেয়ার আলোর ভীতিকর লীলা। তাহারা জ্বলে আর নিবিয়া যায়; আবার জ্বলে এবং ব্যস্তভাবে দিকে দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। সে রাত্রে আকাশেও জাগিয়াছিল নাকি ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ঘেরাটোপের ভিতর হইতে অদৃশ্য বনস্পতিরাও হাহাকারের মতো কাতর চিৎকার করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অশ্বারোহীর দল সেসব দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিল না।

সেই সময় হঠাৎ জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া সরোজিনী আবার উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—'রক্ষা করো, রক্ষা করো, কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা করো!'

সেই তীব্র আর্তধ্বনি ঝটিকার কোলাহলেরও ভিতর দিয়া ছড়াইয়া পড়িল জলাভূমির দিকে দিকে—বহুদূর পর্যন্ত!

হীরেন্দ্রনারায়ণ সকৌতুকে হাহারবে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'চিৎকার করে তুই কাকে ডাকছিস কুহকিনী? তোকে রক্ষা করিবার জন্যে দেবতা দানব যক্ষ বা রক্ষ কেউ আর আসবে না, বুঝেছিস? তোকে এখন বাঁচাতে বা মারতে পারি কেবল আমি—হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কেউ নয়!'

কিংবদন্তি বলে, ঠিক সেই সময় জলাভূমির মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনির মতো অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর শব্দ। শঙ্খের তেমন ভীষণ আওয়াজ কেউ কোনও দিন শ্রবণ করে নাই।

অশ্বারোহীদের বুকের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। হীরেন্দ্রবাবুর অশ্ব ভয় পাইয়া সচমকে শূন্যে লাফাইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরোজিনীকে লইয়া অশ্বের পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

তাঁহার দুই বন্ধু সজোরে রাশ চাপিয়া ধরিয়া কোনওরকমে আপন আপন অশ্বকে সংযত করিয়া রাখিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সকলের চোখের সম্মুখে দেখা গেল একটা সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত ও অলৌকিক দৃশ্য। অন্ধকার ফুঁড়িয়া ফুটিয়া উঠিল দুটো ভয়ঙ্কর হিংস্র ও জ্বলন্ত চক্ষু এবং কয়েকটি ক্ষুধিত ও করাল দন্ত! তাহার পরই আকাশ, বাতাস ও দিগ্বিদিক কম্পিত হইয়া উঠিল আবার এক তীব্র শঙ্খরবে এবং পরমুহূর্তেই পল্লিপথের সূচিভেদ্য অন্ধকারের

মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল সে এক অসম্ভব, অপার্থিব এবং বিভীষণ ও অতিকায় মূর্তি—কেবল তার ক্রুদ্ধ চক্ষু দুইটাই বুভুক্ষু অগ্নিকণা বৃষ্টি করিতেছিল না, তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলই দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল উল্কার মতো! দেখিলেই মনে হয় এই বীভৎস ও বিশালকায় মূর্তিটা এইমাত্র যেন কোনও দুঃস্বপ্নের নরক ছাড়িয়া নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। চোখের সামনে এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখিয়া হীরেন্দ্রবাবুর বন্ধুদের দুই অশ্বই বেগে উন্মত্তের মতো পলায়ন করিল।

পরদিন প্রভাতে সেইখানেই পাওয়া যায় হীরেন্দ্রবাবুর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মৃতদেহ। কাহার নিষ্ঠুর দংশনে তাঁহার কণ্ঠনালি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!

তাহার পর সরোজিনীর আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকে বলে, সে সোনারগঞ্জ ছাড়িয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছিল।

হীরেন্দ্রবাবুর এক বন্ধু সেই রাত্রেই অতিরিক্ত আতঙ্কে মারা পড়ে এবং আর একজনও তাহার পর একেবারে পাগল হইয়া যায়।

তাহার পর জমিদারির মালিক হন ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি। তিনি তাঁর পিতার মতো অত্যাচারী, অমিতব্যয়ী ও চরিত্রহীন ছিলেন না। মনুষ্যোচিত বিবিধ সদগুণের জন্য তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। যদিও পিতার অমিতব্যয়িতার ফলে জমিদারির আয় অনেক কমিয়া গিয়াছিল, তবু দান-ধ্যান এবং অন্যান্য সৎকার্যের জন্য তিনি ছিলেন সর্বদাই মুক্তহস্ত। কিন্তু জমিদারির পক্ষে পরিণামে ব্যাপারটা বড়ো শুভকর হয় নাই। একজনের অসৎ স্বভাব এবং আর একজনের সৎ স্বভাবের জন্য জমিদারির আয়তন ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিয়াছিল। এবং সেই অবস্থাতেই সাধু ধীরেন্দ্রনারায়ণও অতিশয় রহস্যময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হন। তাঁহারও মৃতদেহ পাওয়া যায় পূর্বকথিত জলাভূমির একপ্রান্তে। সেদিনও ছিল চন্দ্রালোকশূন্য অন্ধকার রাত্রি। সে-সময় তিনি যে কেন প্রাসাদ ছাড়িয়া ওই জলাভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও সঠিক হদিস পাওয়া যায় নাই এবং তাঁহার মৃত্যুরও যথার্থ কারণ প্রকাশ পায় নাই। কেবল ডাক্তাররা সন্দেহ করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তবে লোকের মুখে একটা কথা শুনা যায় : ধীরেন্দ্রনারায়ণের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার দুই উন্মীলিত চক্ষু ছিল বিষম আতঙ্কে স্তম্ভিতের মতো।

এই দ্বিতীয় মৃত্যুর পর হইতেই এ অঞ্চলে সকলের মুখে মুখে ফেরে বিশেষ এক কুসংস্কারের কথা। সকলেই বলে, হীরেন্দ্রনারায়ণের মহাপাপের জন্য কুসুমপুরের জমিদারবংশ অভিশপ্ত হইয়াছে। এবং বংশ পরম্পরাক্রমে অব্যাহত থাকিবে এই অভিশাপের ধারা। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এসব কথা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে আর একটা ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য বটে। রায়চৌধুরি বংশের আরও কয়েকটি সন্তান জলাভূমির মধ্যে না গিয়াও অপঘাতে মারা পড়িয়াছে।

গত সপ্তাহে আমরা কেবল বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরির মৃত্যুসংবাদই প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেও নাকি এক ভীতিকর রহস্য জড়িত আছে।

বীরেনবাবুর একটি বহুকালের অভ্যাস ছিল। রাত্রি নয়টার পর আহারাদি শেষ করিয়া শয়নের পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিজের উদ্যানের মধ্যে পাদচারণ করিতেন। জমিদার-বাড়ির উদ্যানের পশ্চিম প্রান্তেই আছে পূর্বকথিত জলাভূমি। সেদিকে উদ্যানের প্রাচীরের গায়ে একটি ছোটো ফটক আছে, তাহা খুলিয়া জলাভূমির ভিতরে পদার্পণ করা যায়। রাত্রিকালে সেই ফটক খুলিয়া জমিদারবাড়ির কেউ কোনওদিনই ওই জলাভূমির মধ্যে প্রবেশ করে না। অথচ বীরেন্দ্রবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে সেই ফটক হইতে খানিক তফাতে জলাভূমির ভিতরেই। তাঁহার মৃত্যুর দিনও নিস্তব্ধ রাত্রি ছিল নিশ্চন্দ্র, এবং চারিদিক ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আবরণে অদৃশ্য। সেই অসময়েও বীরেন্দ্রবাবু ফটক খুলিয়া জলাভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন কেন? ডাক্তারের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুনই বীরেনবাবুও মৃত্যুমুখে পড়িয়াছেন। পূর্ব হইতেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা নাকি দুর্বল ছিল। কিন্তু তাঁহারও মৃতদেহের মুখের উপরে ছিল ভীষণ এক আতঙ্কের ছাপ। সকলেরই মনে মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেই চোখের সামনে দেখিয়াছিলেন তিনি কোন ভয়াবহ বিস্ময়?

আবার কুসুমপুরের কোনও কোনও নিদ্রিত লোক নাকি সেই রাত্রে এক অদ্ভুত, গগনবিদারী শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সচমকে জাগিয়া শয্যার উপরে সভয়ে উঠিয়া বসিয়াছিল!'

॥ তৃতীয় ॥

উল্কামুখী শঙ্খচূর্ণী

সংবাদপত্রের কাহিনি শুনে ভারত নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। আমি একেলে সভ্যতার যুগে ওই সেকেলে রূপকথাটা যে কতখানি হাস্যকর, তাই নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। তারপর বলে উঠলুম, 'বংশানুক্রমিক অভিশাপ! অগ্নিময়, অতিকায় মূর্তি! গগনবিদারী শঙ্খধ্বনি! এসব গালগল্পে আড্ডা বেশ জমে ওঠে বটে, কিন্তু সুস্থচিত্তে হজম করা অসম্ভব! ফণীবাবু, আপনি কি এইসব গুজব বিশ্বাস করেন?'

ফণীবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার বিশ্বাস করা না করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। খবরের কাগজও দিয়েছে একটা চলতি কিংবদন্তির বর্ণনা। তবে আমার বন্ধু বীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু সম্পর্কীয় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। সেই সম্বন্ধেই আমি ভারতবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।'

ভারত সিগারেট কেসের উপরে একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'এতক্ষণ পর্যন্ত যা শুনলুম তা হচ্ছে কতকগুলো অসম্ভব আর আজগুবি ঘটনার খিচুড়ি। ওসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু কোনও বিষয়ে কোনও মত প্রকাশ করার আগে আমি জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণের পরিচয় আরও ভালো করে জানতে চাই। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, বীরেনবাবুর আর্থিক অবস্থা ছিল কী রকম?'

ফণীবাবু বললেন, 'শুনলেন তো, বীরেনবাবুর পিতামহ আর পিতা দুইজনে মিলেই জমিদারির অবস্থা বেশ কাহিল করে এনেছিলেন। কিন্তু বীরেনবাবু, কেবল শিক্ষিত নন, বিশেষ বুদ্ধিমানও ছিলেন। জমিদার হিসাবে তাঁর অবস্থা খুব সচ্ছল হবে না বুঝেই নানা ভাবে তিনি নিজের আয় বাড়াবার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘকাল ধরে বোম্বাই প্রদেশেই ছিল তাঁর কার্যস্থল। সেখানকার ফাটকার বাজারে অত্যন্ত পয়মন্ত বলে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৎসরের পর বৎসর ধরে দুই হাতে তিনি রাশি রাশি টাকা রোজগার করে গিয়েছিলেন। লোকে বলত, তাঁর হাতে ধুলোমুঠোও সোনামুঠো হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আগেই বলেছি তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ভালো করেই জানতেন যে, ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই সময় থাকতেই সাবধান হয়ে জাল গুটিয়ে যখন নিজের দেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁর অর্থসৌভাগ্য হয়েছিল রাজরাজড়ারও পক্ষে হিংসাজনক। সুতরাং জমিদারির আয় কমে গিয়েছিল বলে তাঁকে কোনও দিনই দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়নি।'

ভারত বললে, 'বীরেনবাবু কি কুসুমপুরে স্থায়ীভাবে বাস করতেন, না কলকাতা থেকে সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন?'

—'ঠিক উলটো ব্যাপার। বীরেনবাবু মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কুসুমপুরেই ছিল তাঁর নিজস্ব আস্তানা। তাঁর মতন পল্লিপ্রীতি সচরাচর দেখা যায় না। দশ বৎসর আগেও কুসুমপুর ছিল প্রায় অজ পাড়াগাঁয়ের মতো। কিন্তু বীরেনবাবুরই প্রাণপণ চেষ্টায় আর অর্থব্যয়ে কুসুমপুর আজ হয়ে উঠেছে মফস্বলের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটো শহরের মতো। ওখানকার বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, আর লাইব্রেরি প্রভৃতির মূলে আছে তাঁরই বদান্যতা। স্বগ্রামের উন্নতির জন্যে আরও কতদিকে তিনি যে কত অর্থব্যয় করেছেন, তার আর কোনও হিসাব নেই। বলতে গেলে তাঁর ধ্যান জ্ঞান প্রাণ ছিল কুসুমপুরেরই সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান। এইসব কারণে স্থানীয় বাসিন্দারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করত দেবতার মতো। তাঁর একটি বিশেষ মত ছিল যে, দিনে দিনে পল্লিগ্রামকে বেশি অসভ্য করে তোলবার জন্যেই বাঙালিরা শহরে গিয়ে সভ্য নাম কিনতে চায়। যেসব জমিদার স্বগ্রামে ফিরে এসে নিজেদের প্রবাসী বলে মনে করে, তাদের প্রতি তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। এইজন্যে নিজের উইলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যবস্থা করে গিয়েছেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারী কুসুমপুরের স্থায়ী বাসিন্দা না হলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন।'

ভারত শুধোলে, 'তাঁর উত্তরাধিকারী কে?'

—'হিতেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি। বীরেন্দ্রবাবু ছিলেন নিঃসন্তান। হিতেন্দ্র হচ্ছেন তাঁর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। কুসুমপুরের রায়চৌধুরি পরিবারের একটিমাত্র বংশপ্রদীপ বলতে এখন ওই হিতেন্দ্রকেই বোঝায়।'

—'হিতেন্দ্রবাবুর কোনও সন্তান নেই?'

—'হিতেন্দ্র এখনও বিবাহই করেননি। গত চার বৎসর ধরে তিনি বিলাতে বাস করছিলেন, এইবার দেশে ফিরে এসেছেন। বীরেনবাবুর যেদিন মৃত্যু হয় তার পরদিনই হিতেনের কলকাতায় পৌঁছবার কথা ছিল। সেইজন্যে বীরেনবাবুও নিশ্চয়ই কলকাতায় এসে

উপস্থিত হতেন, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে তা সম্ভবপর হল না। তার বদলে আসতে হয়েছে আমাকেই।'

—'তাহলে হিতেন্দ্রবাবু ছাড়া এখন আর কেউ বীরেন্দ্রবাবুর সম্পত্তির উপরে দাবি করতে পারবে না?'

—'না।'

—'বীরেনবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কী, এইবারে আমি সেই কথাই জানতে চাই। আপনি যখন কেবল তাঁর বন্ধু নন—চিকিৎসকও ছিলেন, তখন এ সম্বন্ধে কোনও নতুন কথা বলতে পারবেন কী?'

—'নতুন কথা বলতে কী বোঝেন?'

—'বীরেনবাবুর বুকের অবস্থা সত্যই কি ভালো ছিল না?"

—'না।'

—'সেইজন্যেই কি তিনি হঠাৎ মারা পড়েছেন?'

ফণীবাবুর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'আমি যে কী বলব, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

—'কেন?'

—'এমন কিছু কিছু জিনিস আমি লক্ষ করেছি, মনে মনে যার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি।'

—'কারণগুলো একে একে বলুন।'

—'প্রথমত আমি জানি আহারের পর নৈশভ্রমণের সময় বীরেনবাবু কোনওদিনই বাগানের বাইরে পা বাড়াতেন না। তবে মৃত্যুর রাত্রে তিনি পাঁচিলের ওপারে জলাভূমির ভিতরে গিয়েছিলেন কেন? কোনও দৃশ্য কি তাঁর কৌতূহল জাগ্রত করেছিল? সেইজন্যেই কি তিনি অন্ধকারকেও আমলে না এনে জলাভূমির ভিতরে তদারক করতে গিয়েছিলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর কী?'

ভারত বললে, 'আপনি কতদিন ধরে কুসুমপুরে বাস করছেন?'

—'আজ প্রায় দশ বৎসর। বীরেনবাবুর সাদর আহ্বানে আর বন্ধুত্বের টানেই কুসুমপুরে আমার আগমন।'

—'তাহলে কুসুমপুরের ওই জলাভূমির সঙ্গে আপনিও বিশেষভাবে পরিচিত?'

—'নিশ্চয়ই। কিন্তু ওখানে নতুন করে কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে এমন কোনও কিছুই আমি কল্পনা করতে পারছি না।' ফণীবাবু একটু থেমে আবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু—, কিন্তু—', বলতে বলতে তিনি আবার থেমে পড়লেন।

—'কিন্তু বলে থামলেন কেন?'

—'একদিনের একটা ঘটনার কথা স্মরণ হচ্ছে। ঘটনাটা হয়তো বিশেষ কিছুই নয়, তবু উল্লেখ করলেও ক্ষতি নেই। একদিন রাত্রে বীরেনবাবুর ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আহারের পর তাঁর সঙ্গে বাইরে এসে আমিও বাগানে পায়চারি করতে লাগলুম। বীরেনবাবুর মুখে ছিল

একটি চুরোট। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চুরোটটা মুখ থেকে নামিয়ে এক দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নজর ছিল জলাভূমির দিকেই। আমিও তাঁর দৃষ্টির অনুসরণে খিড়কির ফটকের ফাঁক দিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে দেখলুম। তখন আকাশে ছিল মরা চাঁদের একটুখানি আলো। ভালো করে কিছুই দেখতে পেলুম না, কেবল মনে হল আবছায়ার মতো কী একটা যেন সোঁ করে জলাভূমির উপর দিয়ে কোথায় চলে গেল।'

ভারত আগ্রহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'কীসের আবছায়া?'

—'তা ঠিক করে বলতে পারব না। কিন্তু সেটাকে আবছায়া না বলে অপচ্ছায়া বলাই উচিত। সেটা কোনও বড়ো জীবও হতে পারে, আর তার গায়ের রং ছিল মিশমিশে কালো।'

—'সেটা কালো রঙের কোনও গোরু নয়তো?'

—'হতেও পারে। তবে কেন জানি না, তাকে দেখেই আমার বুকটা কেমন ছ্যাঁক করে উঠল!'

—'তারপর?'

—'বীরেনবাবুর দিকে ফিরে দেখলুম, কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর মুখ চোখও অত্যন্ত ভয়বিহ্বল বলে মনে হল। মুখে তিনি কিছু বললেন না, হঠাৎ হনহন করে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।'

ভারত অল্পক্ষণ চুপচাপ বসে বসে সিগারেটে টানের পর টান মারতে লাগল। তার এই নীরবে ধূমপানের কারণ আমি জানি। তামাকখোররা তামাক টানবার সময় ঠাট্টা করে বলে, 'এখন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছি'। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিক আর না দিক, ভারত কিন্তু ঠিক তাই-ই করে। অর্থাৎ ভাবতে ভাবতে সিগারেট টানে এবং সিগারেট টানতে টানতে ভাবতে থাকে।

একটু পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভারত বললে, 'খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে বীরেনবাবুর মৃত্যু রহস্যটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। তিনি মারা গিয়েছেন বোঝা গেল, কিন্তু তার মধ্যে রহস্যের ঠাঁই কোথায়? আপনি তাঁর মৃত্যুর খবর কতক্ষণ পরে পান?'

—'আধ ঘণ্টার মধ্যে। তারপরেই আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম।'

—'সেইদিনের কথা আমার কাছে ভালো করে গুছিয়ে বলুন।'

—'তাহলে আগেই বীরেনবাবুর গৃহস্থালির কথা কিছু কিছু বলতে হয়। বীরেনবাবু শুধু নিঃসন্তান নন, বিপত্নীকও ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল বহুকাল পূর্বেই। সংসারে তাঁর আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ ছিল না। ওই বাড়িতেই বাস করত তাঁর পুরাতন কর্মচারী রসময় দাস আর তার স্ত্রী মঙ্গলা দাসী। রসময় ছিল একাধারে সরকার, গোমস্তা আর ম্যানেজার। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেছিল, তা নিয়ে বীরেনবাবুকে কোনওদিন কিছু মাথা ঘামাতে হয়নি। ঘটনার দিন রাত্রে আহারাদির পর বীরেনবাবু যথাসময়েই উদ্যানে ভ্রমণ করতে যান। সাধারণত তিনি আবার বাড়ির ভিতরে ফিরে আসতেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই। কিন্তু সেদিন রাত বারোটার পরেও বীরেনবাবু ফিরলেন না দেখে রসময় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তারপর বাড়ির বাইরে এসে বাগানের কোথাও তাঁকে

দেখতে পায় না। কিন্তু খিড়কির ফটক খোলা দেখে লোকজন নিয়ে সে-ও বাইরে বেরিয়ে যায়। তারপর খানিকদূর এগিয়েই জলাভূমির উপরে আবিষ্কার করে বীরেনবাবুর মৃতদেহ। আমিও সেইখানে সেই অবস্থাতেই বীরেনবাবুর মৃতদেহ দেখেছি। তিনি উপুড় হয়ে জমির উপরে পড়েছিলেন। আতঙ্ক বা অন্য যে-কারণেই হোক তাঁর মুখের ভাব এমন বিকৃত হয়েছিল যে, প্রথমটা আমি পর্যন্ত তাঁকে চিনতে পারিনি। তাঁর দেহের উপরে কোনও আঘাতের চিহ্নই ছিল না। কাজেই বাধ্য হয়েই আমাকে অনুমান করতে হল, তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছেন তাঁর পুরাতন বুকের অসুখের জন্যেই। আমি সেখানকার জমিও কিছুদূর পর্যন্ত পরিদর্শন করেছি। বীরেনবাবুর মৃতদেহ থেকে অল্পদূরেই জলাভূমির স্যাঁতসেঁতে মাটির উপরে দেখেছি অদ্ভুত কয়েকটি পদচিহ্ন!'

ভারত হাতের সিগারেটটা ছাইদানের উপর নিক্ষেপ করে উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'পদচিহ্ন? কীরকম পদচিহ্ন?'

—'আকারে তা প্রায় মানুষের পায়ের মতনই বড়ো। কিন্তু সেগুলো যে মানুষের পদচিহ্ন নয় এ বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই।'

—'তবে কি তা কোনও জন্তু-জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন?'

—'কোনও জন্তুরই অত বড়ো পায়ের চিহ্ন এ অঞ্চলে আমি দেখিনি।'

—'মানে?'

—'এ হচ্ছে বাংলা দেশের পল্লিগ্রাম। আমাদের এ অঞ্চলে বড়ো জাতের হিংস্র বন্যজন্তুর কথা কোনওদিনই শোনা যায়নি। একবার এখানে কিছুদিনের জন্যে চিতেবাঘের উপদ্রব হয়েছিল বটে। কিন্তু বীরেনবাবুই তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন। সেও কয়েক বছর আগেকার কথা। বড়ো বাঘ বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের স্বপ্ন পর্যন্ত কেউ এখানে দেখে না। জলাভূমিতে চরতে পারে বড়ো জোর ঘোড়া, মহিষ, গোরু, গাধা বা কুকুর, শিয়াল প্রভৃতির মতো জন্তু। সে পদচিহ্নগুলো তাদের কারুরই মতো নয়। আরও কিছু কিছু ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি।'

—'সব আমাকে খুলে বলুন।'

—'খিড়কির ফটক থেকে বেরিয়েই জলার নরম মাটির উপরে ছিল বীরেনবাবুর একটানা পায়ের দাগ। সেগুলো দেখলেই বোঝা যায়, তিনি জলার উপর দিয়ে একদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আরও বুঝেছি যে, একবার তিনি মিনিট পাঁচ-সাতের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।'

—'কী করে বুঝলেন?'

—'বীরেনবাবু সিগারের ধূমপান করতে করতেই বেড়াতেন। জলার উপরে একস্থানে দু-জায়গায় ছিল সিগারেটের ছাই। সিগারেট থেকে দু-বার ছাই ঝাড়বার জন্যে দরকার হয় অন্তত চার-পাঁচ মিনিট সময়। তাই দেখেই এ আন্দাজটা করতে পেরেছি!'

ভারত প্রশংসা ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'ভাস্কর হে, একেই বলে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি। সাধু ফণীবাবু, সাধু!'

—'আর একটা বিষয় আমি লক্ষ করেছি। বীরেনবাবু পায়ে পায়ে খানিকদূর পর্যন্ত এগিয়েই যখন ফিরে আসেন, তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে রীতিমতো ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন। কিন্তু ফেরার মুখের সেই পায়ের চিহ্নগুলো থেমে গিয়েছিল তাঁর মৃতদেহের কাছে। অর্থাৎ তিনি আর বাগান পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেননি।'

ভারত আসন ত্যাগ করে ঘরের ভিতরে একপাক ঘুরে এল। তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, 'ফণীবাবু, ঘটনার ঠিক পরদিনই যদি আমাকে খবরটা দিতে পারতেন, তাহলে আমার কী সুবিধেই যে হত—কত-না নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে পারতুম! জলার সেই নরম মাটির উপরে তারপর কত লোকজন চলাচল করেছে, যা কিছু চিহ্ন এখন একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে।'

ফণীবাবু বললেন, 'ভারতবাবু, এই ব্যাপারটার সঙ্গে অতি প্রাকৃত ঘটনারও সম্পর্ক রয়েছে। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিন, কিন্তু গ্রামের প্রত্যেক লোকেরই তাই বিশ্বাস। অতি প্রাকৃত ঘটনার জন্যে পুলিশে খবর দিয়ে লাভ কী? পুলিশ তো আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দেবে।'

—'গ্রামের লোকে কী বলে?'

—'বাজে লোকের কথায় আমি কান পাতিনি। কিন্তু চার-পাঁচ জন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লোকের মুখে আমি যা শুনেছি, মুখের কথায় তা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বিভিন্ন সময়ে তারা দেখেছে, রাত্রের নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আগুনের দীপ্তি ছড়িয়ে জলার উপর দিয়ে বেগে ছুটে যাচ্ছে কী এক উদ্ভট আর অলৌকিক জীব। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মৌখিক অগ্নিময় রেখাগুলো! সেই সঙ্গে দূর থেকে ভেসে ভেসে আসে গগনভেদী শঙ্খের মতো শব্দ! আরও একটা উল্লেখ্য কথা এই যে, জলার উপরে চাঁদের আলো থাকলে সেই অগ্নিময় জীবটাকে কেউ দেখতে পায় না। স্থানীয় লোকেরা ওই অপার্থিব, অতিকায় মূর্তিটার কী নাম দিয়েছে জানেন? উল্কামুখী শঙ্খচূর্ণী।'

ভারত হাসতে হাসতে বললে, 'শঙ্খচূর্ণী? চলতি ভাষায় আমরা যাকে বলি শাঁখচুন্নি;—অর্থাৎ সাধ্বী নারীর প্রেতাত্মা! সংস্কৃতে তার নাম—শঙ্খিনী। তাই থেকে বাংলায় হয়েছে শাঁখিনি। কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে আছে—'চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে। চলে শাঁখিনি পেতিনী মুক্ত কেশে।' ফণীবাবু ঠাকুমা-দিদিমাদের এইসব রূপকথায় আপনিও তাহলে বিশ্বাস করেন?'

॥ চতুর্থ ॥

লৌকিক পদচিহ্ন

ভারত হো হো করে হাসতে হাসতে প্রায় লুটিয়ে পড়ল। তার হাসিতে যোগ দিলুম আমিও এবং আমার সঙ্গে ফণীবাবুও।

ভারত বললে, 'শঙ্খচূর্ণী—শঙ্খিনী! নামের সঙ্গে যখন রয়েছে শঙ্খ, তখন তার কণ্ঠস্বরও হবে শঙ্খের বা শাঁখের আওয়াজের মতো, কী বলেন ফণীবাবু?'

ফণীবাবু অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, 'না ভারতবাবু, অতটা আমি মনে করিনি। তবে একে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু, তার উপরের নানা লোকের নানা কানাকানি। আমার মাথাটা রীতিমতো গুলিয়ে গিয়েছিল, তাই আগে আপনার কথা স্মরণ হয়নি।'

ভারত বললে, 'তবে এখন আপনি কী প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন?'

—'পরামর্শ করতে।'

—'কী পরামর্শ?'

—'আমি হচ্ছি বীরেনবাবুর সম্পত্তির অছি আর তত্ত্বাবধায়ক। বীরেনবাবুর উত্তরাধিকারী হিতেন্দ্রনারায়ণ আজকেই কলকাতায় এসে পৌঁছুবেন। এইসব গোলমালের পর এখন আমার কী কর্তব্য হওয়া উচিত?'

ভারত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'একটু আগেই শুনলুম হিতেন্দ্রবাবু হচ্ছেন এই বংশের শিবরাত্রির সলতে। বীরেনবাবুরা কয় ভাই ছিলেন?'

—'তিন ভাই। তাঁর মেজোভাই হচ্ছেন হিতেন্দ্রের পরলোকগত পিতা। আর তাঁর ছোটোভাইয়ের নাম জিতেন্দ্রনারায়ণ। তিনি নাকি ছিলেন তাঁর কুখ্যাত পিতামহ হীরেন্দ্রনারায়ণেরই প্রতিমূর্তি। কী চেহারায়, কী মনে। প্রথম যৌবনেই—তাঁর বিবাহের আগেই গ্রামসুদ্ধ লোক তাঁকে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারপর রাগের মাথায় এক খুন করে তিনি হয়েছিলেন দেশত্যাগী। বহুকাল তাঁর কোনওই পাত্তা পাওয়া যায়নি। অবশেষে খবর আসে, ইস্ট আফ্রিকার কোথায় গিয়ে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা পড়েছেন।'

—'আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?'

—'উইলের শর্ত অনুসারে এখন হিতেন্দ্রকে থাকতে হবে কুসুমপুরেই গিয়ে। কিন্তু ওই অভিশপ্ত জমিদারবাড়িতে গিয়ে হিতেন্দ্রের কি থাকা উচিত? এ সম্বন্ধে আপনার মত জানতে ইচ্ছা করি।'

ভারত বললে, 'আপনি বোধহয় বিশ্বাস করেন, কুসুমপুরে গেলে হিতেনবাবুরও জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে?'

—'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিন ভারতবাবু! আমি কি অল্পবিস্তর প্রমাণও দাখিল করিনি?'

—'ধরা যাক, কুসুমপুরের রায়চৌধুরি বংশের উপরে আছে একটা কোনও নিদারুণ অভিশাপ। কিন্তু সে অভিশাপ কি কুসুমপুরের জমিদারবাড়ি ছেড়ে কলকাতাতেও এসে কার্যকরী হতে পারে না?'

—'তাহলে আপনার মত হচ্ছে, হিতেন্দ্র অনায়াসেই কুসুমপুরে গিয়ে বাস করতে পারেন।'

ভারত আবার অল্পক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে বললে, 'ফণীবাবু, কলকাতায় এসেই হিতেন্দ্রবাবু কি সোজা কুসুমপুরে চলে যাবেন?'

—'না, দিন তিনেকের জন্যে আমি ন্যাশনাল হোটেলে তাঁর থাকবার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

—'তাহলে তাঁকে নিয়ে আপনি সেইখানে গিয়েই উঠুন। ইতিমধ্যে ভেবেচিন্তে আমি একটা কিছু স্থির করে ফেলব।'

—'স্থির করতে আপনার কতক্ষণ সময় লাগবে?'

—'ধরুন, চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর আপনি অনুগ্রহ করে হিতেন্দ্রবাবুকে নিয়ে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন। আজ এই পর্যন্ত।...হ্যাঁ ভালো কথা, বীরেনবাবুর প্রতিবেশীদের কথা কিছু বলতে পারেন?'

ফণীবাবু গাত্রোত্থান করে বললেন, 'জমিদারবাড়ি কুসুমপুর গ্রাম থেকে একরকম বিচ্ছিন্নই বলা যায়। তার পশ্চিম দিকে নির্জন জলাভূমি, পূর্বদিকে ধু-ধু মাঠ, দক্ষিণ দিকে দুর্গম বনজঙ্গল আর উত্তর দিকে গ্রামে যাবার পথ। সেখান থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে গ্রামের লোকজন বাস করে। ওরই মধ্যে জমিদারবাড়ির কাছাকাছি থাকেন কেবল দুই ব্যক্তি। একজন হচ্ছেন বরেন বসু, তিনি প্রাণীতত্ত্ববিদ। তাঁর শখের মধ্যে দেখতে পাই তো কেবল কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করা। আর একজন হচ্ছেন ভবতোষ গুহ। তিনি এ অঞ্চলে মামলাবাজ বলে কুখ্যাত। প্রবাদে এক শ্রেণির লোকের কথা শোনা যায়, যারা নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে ভালোবাসে, তিনি হচ্ছেন সেই দলেরই একজন। বীরেনবাবুর ওই দুই প্রতিবেশীই নিজেদের শখ নিয়েই মেতে থাকেন, গ্রামের আর কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে তাঁরা নিতান্তই নারাজ।'

—'আর এক কথা। আপনার মুখে শুনলুম, কুসুমপুরের কয়েকজন নির্ভরযোগ্য বাসিন্দাও জলার উপরে একটা অগ্নিময় ভূতুড়ে জীব দেখেছে। এসব তো বীরেনবাবুর মারা যাবার আগেকার কথা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বীরেনবাবুর মারা যাবার পরে সেই অলৌকিক দৃশ্য আর দেখা যায়নি?'

—'না।'

—'নমস্কার, আশাকরি এখানে, কাল সকালেই আপনার সঙ্গে হিতেনবাবুকে পাব।'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই', বলতে বলতে ফণীবাবু আমাদের নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভারত, মামলাটা কীরকম বুঝছ?'

ভারত মুখ টিপে হাসতে হাসতে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'রহস্যময়, সন্দেহ নেই। যে বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গিয়েছে, সেটা নাটকের শেষ দৃশ্য কি না বলা যায় না। হয়তো এর উপরেও আছে চরম কোনও দৃশ্য। শুনেছ তো ভাস্কর, ঘটনাস্থলের বর্ণনা? লোকের বসতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নিভৃত নির্জন। তেপান্তর মাঠ, দুর্গম অরণ্য, বহুদূরব্যাপী চোরাবালি ভরা, ভয়াবহ ঊষর জলাভূমি। জল আছে, মানুষের কাজে লাগে না, জমি আছে কিন্তু কোনও জীব তার উপরে পা ফেলতে ভয় পায়। মুক্ত বাতাস

আছে, কিন্তু তা স্বাস্থ্যকরও নয়, ফুলের সুগন্ধও বহন করে আনে না। অপরাধীদের পক্ষে আদর্শ জায়গা।'

আমি বললুম, 'তার উপরে এখানে রয়েছে নাকি কোনও অলৌকিক রহস্য! পৃথিবীতে অদ্ভুত উদ্ভট আর ভীষণদর্শন জীবও থাকতে পারে, কিন্তু কোনও অগ্নিময় জীবের অস্তিত্ব আছে কি? এ যে একেবারেই অপার্থিব!'

—'সময়ে সময়ে মানুষরাও অমানুষিক হয়ে উঠতে পারে। আপাতত আমার মনে দুটো প্রশ্ন উঠছে; প্রথমত, এখানে কোনও অপরাধের অনুষ্ঠান হয়েছে কি না; দ্বিতীয়ত, অপরাধটা কী আর কেমন করেই বা তা অনুষ্ঠিত হল? তবে ফণীবাবুর সন্দেহ যদি সত্য হয়—অর্থাৎ এর মধ্যে থাকে কোনও অলৌকিক ব্যাপার, তাহলে আমাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

—'কিন্তু তুমি তো অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করো না?'

—'না, বর্তমান ক্ষেত্রেও আমি কোনও কোনও লৌকিক সূত্র দেখতে পাচ্ছি! সেই জীবটার অদ্ভুত পদচিহ্নগুলোর কথাই ধরো! বেশ বোঝা যায়, রাত্রে বীরেনবাবু ওই জলাভূমিকে ভয় করতেন। তবু তিনি একলা খিড়কির ফটক খুলে জলার ভিতর গিয়েছিলেন কেন? যাবার সময়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বাভাবিক ভাবেই মাটির উপরে পা ফেলে—পদচিহ্ন দেখে সেই কথাই বোঝা গেছে। নিশ্চয়ই তিনি নিজের বাগান ছেড়ে বায়ু সেবন করবার জন্যে ওই অন্ধকার জলার ভিতরে পদার্পণ করেননি। তারপর এক জায়গায় তিনি কি খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন? কেন দাঁড়িয়ে ছিলেন? তিনি কি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন? সেইখানে গিয়ে কারুর সঙ্গে কি গোপনে তাঁর দেখা করবার কথা ছিল? ভাস্কর, এই সূত্রটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খুব সম্ভব, এই সূত্রটা পরে আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে। তারপরেই জলার ভিতরে নিশ্চয়ই তিনি কোনও ভয়াল দৃশ্য দেখেছিলেন। নইলে মাটির উপরে তাঁর বেগে ধাবমান পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যেত না। কেন তিনি ভয় পেয়েছিলেন তাঁর ভয়ের কারণ লৌকিক না অলৌকিক? এই সমস্যার সমাধান করতে পারলেই আমাদের মামলাটা একেবারেই সহজ হয়ে যাবে?'

॥ পঞ্চম ॥

পাদুকার অন্তর্ধান ও পুনরাবির্ভাব

পরের দিন সকালবেলায় হিতেনবাবুকে নিয়ে ফণীবাবুর আবির্ভাব হল যথাসময়েই। হিতেনবাবু হচ্ছেন অতিশয় সুশ্রী যুবক—গৌরবর্ণ, সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহ, মুখচোখের ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে একটা পুরুষালি ব্যক্তিত্বের ভাব। দেখলেই তাঁকে উগ্রমেজাজের লোক বলে মনে হয়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। পরনে খাস বিলাতি পোশাক।

ফণীবাবু বললেন, 'ইনিই হচ্ছেন শ্রীহিতেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি।'

নমস্কার বিনিময়ের পর ও কথা :। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ভারত বললে, 'বসুন, হিতেনবাবু!'

হিতেন আসন গ্রহণ করে বললে, 'জানেন ভারতবাবু, ফণীবাবু আমাকে নিয়ে না এলেও, আমি নিজেই আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতুম। কথায় বলে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, আমারও হয়েছে তাই। কাল সবে কলকাতায় পা দিয়েছি, কিন্তু এর মধ্যেই পেয়েছি আশ্চর্য একখানা চিঠি!'

ভারত ভুরু তুলে বললে, 'চিঠি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু চিঠিখানা তুচ্ছ—বোধহয় কেউ ঠাট্টা করে লিখেছে। এই দেখুন।'

খামসুদ্ধ চিঠিখানা নিয়ে ভারত টেবিলের উপরে স্থাপন করলে, আমিও হুমড়ি খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। সাধারণ খাম, কিন্তু উপরের ঠিকানাটা ছাপার হরফে লেখা। খবরের কাগজ থেকে অক্ষরগুলো কেটে নিয়ে পরে পরে সাজিয়ে ঠিকানাটা রচনা করা হয়েছে। চিঠিখানা গত পরশু তারিখে কেউ জেনারেল পোস্ট অফিসে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলেছে।

ভারত বললে, 'হিতেনবাবু, আপনি কাল কলকাতায় এসেছেন, আর চিঠিখানা ডাকে ফেলা হয়েছে কলকাতা থেকেই পরশু। অর্থাৎ আপনি কলকাতায় আসবার ঠিক আগের দিনেই। কিন্তু আপনি যে এখানে এসে ন্যাশনাল হোটেলে উঠবেন, একথা ফণীবাবু ছাড়া আর কে জানত?'

হিতেন বললে, 'আর কেউ নয়। সেইজন্যেই তো আমি বিস্মিত হয়েছি।'

ভারত মৃদুস্বরে বললে, 'দেখছি আপনার গতিবিধি নিয়ে কেউ অতিরিক্ত মাথা ঘামাচ্ছে।' বলতে বলতে খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা খুলে সে পাঠ করলে। পত্রে ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে—'As you value your life, keep away from the moor' (বাঁচতে চান তো, জলার দিকে যাবেন না)। চিঠিখানাও খবরের কাগজের ছাপার অক্ষর কেটে নিয়ে লেখা।

টেবিলের উপরে করাঘাত করে হিতেন বলে উঠল, 'বলতে পারেন ভারতবাবু, আমার ভালোর জন্যে কার এতটা মাথা ব্যথা হয়েছে?'

ভারত হাসতে হাসতে বললে, 'ফণীবাবু, এই চিঠিখানা বোধকরি অলৌকিক নয়।'

ফণীবাবু বললেন, 'তা নয়, কিন্তু চিঠিখানা যে লিখেছে সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে যে, জলাভূমির মধ্যে কোনও অলৌকিক ব্যাপার আছে।'

হিতেন উত্যক্ত কণ্ঠে বললে, 'অলৌকিক ব্যাপার কী আবার? দেখছি, আমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে আপনারা সবাই বেশি জানেন?'

ভারত বললে, 'আমরা সব জানি, আপনিও আজকেই সে সমস্তই জানতে পারবেন। এখন এই চিঠির কথাই হোক। দেখছি চিঠিখানা 'স্টেটসম্যান' কাগজ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে!'

ফণীবাবু বললেন, 'কী করে আপনি জানলেন?'

—'প্রত্যেক কাগজই আলাদা আলাদা হরফে ছাপা হয়। যারা ভালো করে নিজেদের চোখ ব্যবহার করে, ছাপা দেখেই তারা কোন কাগজ বলে দিতে পারে।'

হিতেন বললে, 'আমার জন্যে অত দরদ কার হল? খবরের কাগজ থেকে কাঁচি দিয়ে অক্ষর কেটে—'

—'সাধারণ কাঁচি দিয়ে নয় হিতেনবাবু, অক্ষরগুলো কাটা হয়েছে খুব ছোটো কাঁচি দিয়ে—সম্ভবত নখকাটা কাঁচি দিয়ে।'

হিতেন সবিস্ময়ে বললে, 'তাও আপনি বুঝতে পারছেন?'

—'তা পারছি বই কি। প্রমাণ দেখুন। 'Keep away' এই শব্দদুটো একসঙ্গে কেটে নেওয়া হয়েছে। বড়ো কাঁচি হলে এইটুকু একবার কাঁচি চালিয়েই কেটে নেওয়া যেতে পারত। কিন্তু পত্রপ্রেরককে এখানে থেমে থেমে দু-বার কাঁচি চালাতে হয়েছে। তার মানেই কাঁচিখানা খুব ছোটো।'

হিতেন বললে, 'এই চিঠির উপর নির্ভর করে আপনি আর কিছু বলতে পারেন?'

—'দুটো কথা বলতে পারি অনায়াসেই। পত্রপ্রেরক নিজের হাতের লেখা লুকোতে চায়। তার মানে সে হয় আপনার পরিচিত, নয় পরে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হবার সম্ভাবনা আছে। তারপর লক্ষ করুন, ছাপা কাগজের টুকরোগুলো কেটে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি গাম লাগিয়ে চিঠির কাগজের উপরে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এই তাড়াতাড়ির জন্যেই প্রত্যেক কাগজের টুকরো সারিবদ্ধ ভাবে নয়, অসমানভাবে পরে পরে সাজানো রয়েছে। প্রশ্ন এই, পত্রপ্রেরক নিজের ঘরে বসেই পত্ররচনা করেছে, তবু তার এত তাড়াতাড়ি কীসের? সে কি কারুকে লুকিয়ে এই চিঠিখানা পাঠিয়েছে?'

হিতেন ভুরু সংকুচিত করে বললে, 'কলকাতায় কারুর সঙ্গেই আমার আলাপ নেই। সুতরাং এখানে আমার এমন শুভানুধ্যায়ী কে যে থাকতে পারে, তাও আমি বুঝতে পারছি না। আরও একটা বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমি হোটেলে পদার্পণ করতে না করতেই এখানে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে এতটা নিশ্চিত হল কেমন করে?'

ভারত বললে, 'এখনই এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি দিতে পারব না। কিন্তু আপাতত আমার আরও একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত আপনি ওই হোটেলে বাস করছেন। এর মধ্যে আর কোনও নতুন ঘটনা ঘটেনি তো?'

—'উল্লেখযোগ্য কিছুই মনে করতে পারছি না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয়, এমন একটা বাজে ঘটনা ঘটেছে বটে।'

—'কোন ঘটনা বাজে আর কোন ঘটনা কাজের, সেটা আমিই বিবেচনা করে দেখব। সামান্য, অসামান্য সবকিছুই আমি শুনতে চাই।'

হিতেন খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, 'কিন্তু ব্যাপারটা শুধু সামান্য নয়, একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। আজ ভোরে উঠেই দেখছি, আমার একপাটি জুতো চুরি গিয়েছে।'

—'সে কী?'

—'কিছুই নয়। খুব সম্ভব কীরকম করে হারিয়ে গিয়েছে। একপাটি জুতো চুরি করে কার কী লাভ হবে বলুন? তবে নতুন জুতো, এই যা! সবে কালকেই আমি কিনেছি। এখন ওই একপাটির জন্যে আর একপাটিও খোঁড়া হয়ে রইল।'

ভারত বললে, 'হ্যাঁ, সত্যিই এটা তুচ্ছ ব্যাপার। একপাটি জুতো কারুর কোনওই কাজে লাগবে না। খুব সম্ভব ওটা ঘরেই কোনও জায়গা থেকে আপনি খুঁজে পাবেন।'

হিতেন বললে, 'আপনারা কেন যে আমার জন্যে বিশেষ ভাবে ব্যস্ত হয়েছেন, কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আমার চারিদিকে রয়েছে কী একটা অজানা রহস্য! আসল ব্যাপারটা আমাকে জানাবেন কি?'

ভারত বললে, 'ফণীবাবু, এবার সমস্ত রহস্যের উপর থেকে যবনিকা তোলবার প্রয়োজন হয়েছে। হিতেনবাবুর সব কথাই জানা উচিত। যা বলবার আপনিই বলুন।'

ফণীবাবু তখন গোড়া থেকে শুরু করে একে একে কুসুমপুরের সমস্ত রহস্য ও অভিশপ্ত চৌধুরিবংশের কাহিনি হিতেনের কাছে খুলে বললেন।

হিতেন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'ওই অসম্ভব আগ্নেয়-জীবটার গল্প আমি জ্ঞানোদয়ের পর থেকেই শুনে আসছি। ওটা আমি রূপকথারই সামিল বলে জানি। কিন্তু আমার জ্যাঠামশায়ের আকস্মিক মৃত্যুটা হচ্ছে সত্যসত্যই গুরুতর ব্যাপার। আপনারা কি মনে করেন ওর মধ্যে কোনও অপরাধীর হাত আছে?'

ভারত বললে, 'হয়তো আছে, হয়তো নেই।'

—'তারপর ওই চিঠিখানার কথা। ও ব্যাপারটাও সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

ফণীবাবু বললেন, 'মনে হয় তোমার বিরুদ্ধেও যেন কোনও ষড়যন্ত্রের আয়োজন হচ্ছে।'

ভারত বললে, 'সেই সঙ্গে এও মনে হয়, ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন এমন লোকও আছে যে হিতেনবাবুর শত্রু নয়। শত্রু হলে সে তাঁকে সাবধান করে দিত না।'

হিতেন বললে, 'কিংবা এও হতে পারে ভয় দেখিয়ে বা যে-কোনও রকমে ওরা আমার কুসুমপুরে যাওয়া বন্ধ করতে চায়।'

ভারত বললে, 'আপনার এ অনুমানও অসঙ্গত নয়। কিন্তু ফণীবাবু, আপনাদের এই মামলাটি আমার কাছে বড়োই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে। আমি এইরকম রহস্যময় মামলা নিয়েই কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু সে কথা থাক। আপাতত আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, হিতেনবাবুর কুসুমপুরে যাওয়া উচিত কি অনুচিত?'

হিতেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কেন আমি যাব না?'

—'যেহেতু আপনি বিপদে পড়তে পারেন।'

—'বিপদ? কী রকম বিপদ? আপনি ওই জ্বলন্ত আজগুবি জীবটাকে, না কোনও মানুষকে লক্ষ্য করে এ কথা বলছেন?'

—'বিপদটা যে কী, সেইটেই আমি দেখতে চাই।'

হিতেনের মুখ ক্রোধারক্ত হয়ে উঠল। সে তীক্ষ্ণস্বরে বললে, 'বিপদ থাকুক আর না থাকুক, আমি নিজের সংকল্প স্থির করে ফেলেছি। আমার পৈতৃক ভিটা থেকে কেউ আমাকে নির্বাসিত করে রাখতে পারবে না। আমি সেখানে যাবই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা করা বৃথা।' বলতে বলতে সে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

ভারত হাসতে হাসতে বললে, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এর উপরে আমার কিছু বলবার

নেই। তবে আপনার কুসুমপুরে যাওয়ার আগে আমার কিছু বক্তব্য আছে।'

হিতেন বললে, 'বেশ তো, আজ দুপুরেই আমার ওখানে চলুন না! একসঙ্গে ডান হাতের ব্যাপার আর পরামর্শ দুই-ই সেরে আসবেন। ভাস্করবাবু, আপনারও নিমন্ত্রণ রইল।'

আমরা দুজনেই রাজি হলুম।

হিতেন বললে, 'এখন চলুন ফণীবাবু। এখান থেকে হোটেল মাইল খানেকের বেশি হবে না। এটুকু পথ আমরা হেঁটেই যাব।'

তাঁরা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সিঁড়ির উপর থেকে দুজনের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারত একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর ব্যস্ত হয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললে, 'আর এক মুহূর্তও দেরি করা নয়! চলে এসো ভাস্কর, শিগগির!'

ভারতের পিছনে পিছনে নীচেয় নেমে রাস্তার উপরে গিয়ে দেখলুম, মোড়ের মাথায় তখনও ফণীবাবু ও হিতেনবাবুকে দেখা যাচ্ছে। বললুম, 'তুমি কী চাও ভারত? আমি কি দৌড়ে গিয়ে ওঁদের দাঁড়াতে বলব?'

ভারত ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নেড়ে বললে, 'নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়! আমরা দুজনেই পদব্রজে অগ্রসর হব। আজকের দিনটাকে আমার খুব ভালো লাগছে।'

ফণীবাবু ও হিতেনবাবুকে সামনে রেখে আমরা তফাত থেকেই এগিয়ে চললুম। খানিক পথ পেরিয়ে ফণীবাবু ও হিতেনবাবু একটা বড়ো দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দেখাদেখি আমিও। হিতেন দোকানের কাচের জানলার ওপাশ থেকে বোধহয় ভিতরে সাজানো বিক্রেয় জিনিসগুলি পরীক্ষা করছিল।

হঠাৎ ভারত সবিস্ময়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করে উঠল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও দেখলুম, একখানা মোটরগাড়ি রাস্তার ওপাশ দিয়ে এগিয়ে সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল; এবং তারপর আবার খুব ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলে।

ভারত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'ভাস্কর! ওই হচ্ছে অপরাধী! ওই যে লোকটা মোটরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে! চটপট পা চালাও। অন্তত ওর মুখখানা একবাব ভালো করে দেখা দরকার!'

কিন্তু ভারতের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই মোটরের সেই আরোহীও মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলে একটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! তারপরেই সে বোধহয় গাড়ির চালককে লক্ষ্য কোনও নির্দেশ দিলে, কারণ পরমুহূর্তেই গাড়িখানা আবার ছুটতে শুরু করলে! চকিতের জন্যে আমরা খালি দেখতে পেলুম সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আর প্রকাণ্ড দাড়িওয়ালা একখানা মুখ।

ভারত এদিকে-ওদিকে উন্মুক্তের মতো দৃষ্টিপাত করলে, আমি বুঝলুম পলায়মান গাড়িখানার পশ্চাতে অনুসরণ করবার জন্যে সে একখানা ট্যাক্সির সন্ধান করছে। কিন্তু কোথাও ট্যাক্সির চিহ্নও দেখতে পাওয়া গেল না। মোটরখানা আরও গতি বাড়িয়ে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভারত নিষ্ফল আক্রোশে তিক্তকণ্ঠে বললে, 'বড়োই কপাল খারাপ! দেখেও দেখা গেল না!'

আমি শুধোলুম, 'কে ওই লোকটা?'

—'কিছুই জানি না।'

—'গুপ্তচর?'

—'ভগবান জানেন। কিন্তু একটা কথা বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে। হিতেনের কলকাতায় আবির্ভাবের সঙ্গেই কে বা কারা তার উপরে দিচ্ছে সজাগ পাহারা। নইলে হিতেন যে ন্যাশনাল হোটেলে উঠেছে, বাইরের লোক সে-খবর পাবে কেমন করে? আমি আগে থেকেই অনুমান করেছিলুম, প্রথম দিনেই যখন এমন ব্যাপার হয়েছে তখন আজকেও তার উপরে থাকবে শনির দৃষ্টি। ভাস্কর, তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? ফণীবাবু আজ যখন কুসুমপুরের ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন, তখন আমি পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলুম?'

—'হ্যাঁ, আমি লক্ষ করেছি।'

—'আমি অনুমান করেছিলুম, ফণীবাবু যখন আমার এখানে এসেছেন, তখন অপরাধীদের কেউ নিশ্চয়ই তাঁর পিছু না নিয়ে ছাড়েনি, আর সে অপেক্ষা করছে হয়তো আমার বাড়ির বাইরেই রাস্তার উপরে। আমার সে অনুমান ভুল হয়নি। জানলায় মুখ বাড়িয়েই আমি দেখেছিলুম রাস্তায় গাড়ির ভিতরে বসে আছে ওই দাড়িওয়ালা লোকটা। কিন্তু আক্ষেপ রয়ে গেল এই, লোকটার সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল না। তার ওই দাড়িকেও আমি বিশ্বাস করি না, নিশ্চয়ই ওটা পরচুলা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাক গতস্য শোচনা নাস্তি।'

ভারত মিনিটখানেক সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবলে, তারপর পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে তিনবার ফুঁ দিয়ে বাজালে।

অনতিবিলম্বে আত্মপ্রকাশ করলে শ্রীমান ফটিকচাঁদ। বয়সে সে কিশোর, যাঁরা 'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর' পাঠ করেছেন, ছোকরা নিশ্চয়ই তাঁদের অপরিচিত নয়। রাস্তার ভবঘুরে ছোকরাদের নিয়ে ভারত যে একটি নিজস্ব বেসরকারি গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেছিল, পাঠকরা একথাও নিশ্চয় ভুলে যাননি। ফটিকচাঁদ ছিল এই ছোকরা দলের সর্দার। তার চোখ-মুখ কথা কয়, আর সে বানরের মতো চতুর ও চটপটে।

ফটিক এসেই সেলাম ঠুকে বললে, 'কী হুকুম স্যার?'

ভারত বললে, 'তুমি বোধহয় জানো, বর্ধন স্ট্রিটে দুটো হোটেল আছে, সেখানে বাইরের লোকরা এসে ওঠে আর বাস করে?'

—'জানি বই কি স্যার! ন্যাশনাল হোটেল আর বেঙ্গল হোটেল। দুটো হোটেলই সামনা সামনি।'

—'হ্যাঁ! দ্যাখো ফটিক, এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। ওই দুটো হোটেলে যেসব 'বয়' অর্থাৎ বেয়ারা কাজ করে, তুমি তাদের সঙ্গে আজকেই আলাপ জমাতে পারবে?'

—'নতুন করে কী আলাপ জমাব স্যার, তাদের অনেকের সঙ্গেই তো আমি মাঝে মাঝে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসি!'

—'সাধু ফটিকচাঁদ, সাধু! জানি তুমি সবজান্তা ছেলে! এখন তোমাকে কী করতে হবে শোনো। ওই দুটো হোটেলেরই কোনওটাতে এমন কেউ বাস করে, যে 'স্টেটসম্যান' খবরের কাগজ পড়ে। 'বয়'দের সঙ্গে ব্যবস্থা করে তুমি পরশু তারিখের একখানা কি দু-খানা, কি যখানাই হোক, 'স্টেটসম্যান' আমার জন্যে জোগাড় করে আনতে পারবে? এই খুচরো দশ টাকা নিয়ে যাও, দরকার বুঝলে 'বয়'দের বকশিশও দিতে পারো।'

—'এ আর শক্ত কথা কী স্যার, এখুনি আমি যাচ্ছি।' বলেই হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিয়ে দৌড় মারতে উদ্যত হল ফটিকচাঁদ।

ভারত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে ফটিকচাঁদ, দৌড় মেরো না, আর একটু সবুর করো।'

ফটিক চট করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'হুকুম করুন স্যার।'

—'তোমাকে আর একটা কাজের ভার নিতে হবে। তোমার কোনও চেলা-চামুণ্ডাকে পাঠিয়ে ৪৪৪৪ নম্বরের ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আমার কাছে এনে হাজির করতে পারবে?'

কিছুমাত্র দ্বিধা না করেই ফটিক জবাব দিলে, 'খুব পারব স্যার, এ আর শক্ত কাজ কী?'

ভারত বললে, 'উত্তম। এইবারে তুমি খুব জোরে পা চালিয়ে দিতে পারো।'

ফটিকও ছুট মারতে দেরি করলে না।

ভারত আমার দিকে ফিরে এমন একটা রহস্যময় হাসি হাসলে যে আমার বুঝতে বিলম্ব হল না, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলেও সে এখন আর আমার কৌতূহল চরিতার্থ করবে না। পরশু তারিখের পুরাতন 'স্টেটসম্যান' নিয়ে ভারতের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, মনে মনে বারবার সেই কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করেও কোনওই হদিস পাওয়া গেল না।

যথাসময়ে আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে ন্যাশনাল হোটেলের দিকে যাত্রা করলুম। কিন্তু হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার উপরে উঠেই দেখি, অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে হিতেন দালানের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছে এবং তার হাতে রয়েছে একপাটি কালো চামড়ার জুতো।

ভারত শুধোলে, 'ব্যাপার কী?'

—'ব্যাপার হচ্ছে এই, হয় আমি পাগল, নয় আমি কোনও পাগলের হোটেলে এসে উঠেছি!'

—'আপনার হাতে জুতোর পাটি কেন?'

—'ব্যাপার তো এই জুতোর পাটি নিয়েই!'

—'আপনার হারানো জুতোর পাটি আবার বুঝি ফিরিয়ে পেয়েছেন?'

—'আমার জবাব হচ্ছে হ্যাঁ এবং না! কাল যে নতুন জুতোর পাটিটা হারিয়ে ছিল, সেটা আমি আবার ফিরিয়ে পেয়েছি বটে। তার রং ছিল ব্রাউন। কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন তো, এটা নতুনও নয় আর এর রং ব্রাউনও নয়? এ হচ্ছে আমার পুরোনো জুতোর পাটি।'

—'বুঝলুম।'

—'না, আপনি কিছুই বোঝেননি। আমার নতুন জুতোর পাটি ফিরিয়ে পেয়েছি বটে, কিন্তু এবারে অদৃশ্য হয়েছে আমার পুরোনো জুতোর পাটি! আমার হাতে আছে সেই একজোড়া পুরোনো পাটিরই একটা।'

ভারতের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

হিতেন জোরে চেঁচিয়ে বললে, 'এই হোটেলের এরা আমাকে ভেবেছে কী? আমার সঙ্গে এরা মস্করা করতে চায়? আচ্ছা, এই হোটেলের সঙ্গে ভবিষ্যতে আমি আর কোনও সম্পর্কই রাখব না। আসুন ভারতবাবু, আসুন ভাস্করবাবু, চলুন ভিতরে যাই।'

॥ ষষ্ঠ ॥
জাল ভারতভূষণ

তারপর আহারাদির পর বসল আমাদের পরামর্শ সভা।

ভারত শুধোলে, 'হিতেনবাবু, তারপর কী স্থির করলেন, কলকাতাতেই থাকবেন না কুসুমপুরে যাবেন?'

—'কুসুমপুরে যাব।'

—'কবে?'

—'ঠিক তিন দিন পরে।'

ভারত বললে, 'আমারও মত হচ্ছে, তাই ভালো। দেখুন, এই কলকাতা হচ্ছে জনসমুদ্র বিশেষ। এখানে কত রকমের লোক আছে হিসাবে আসে না। শত্রুরা তার মধ্যে আত্মগোপন করতে পারে অনায়াসেই। কোন দিক দিয়ে, কখন কেমন করে শত্রুর শনির দৃষ্টি যে আপনার উপরে এসে পড়বে, সাধ্যমতো চেষ্টা করেও আমরা তা জানতে পারব না। এই আজকের কথাই ধরুন। জানেন ফণীবাবু, আপনারা যখন আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, শত্রুপক্ষের চর তখন আপনাদের পিছনে পিছনে অনুসরণ করেছিল?'

ফণীবাবু চমকে উঠে বললেন, 'সে কী! কে সে?'

—'দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা জানতে পারিনি! আচ্ছা ফণীবাবু, বলতে পারেন, কুসুমপুরে আপনার পরিচিতদের মধ্যে দাড়িওয়ালা কোনও লোক আছে কি না?'

—'একমাত্র দাড়িওয়ালা লোকের কথা মনে পড়ছে, সে হচ্ছে রসময়, বীরেনবাবুর সরকার।'

—'জমিদারবাড়ি থাকে তারই তত্ত্বাবধানে?'

—'হ্যাঁ। রসময় আর তার স্ত্রী মঙ্গলা দাসীর তাঁবে থেকেই সেখানকার আর সব লোকজনকে কাজ করতে হয়।'

—'আরও একটু ভালো করে রসময়ের পরিচয় দিন।'

—'রসময়কে জমিদারবাড়ির পুরাতন কর্মচারী বললেও সব বলা হয় না। ওরা পুরুষানুক্রমে সেখানে কাজ করে আসছে। রসময়ের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সবাই ছিল কুসুমপুরের জমিদারদের গৃহস্থালির কর্মকর্তা। ওইখানেই রসময়েরও জন্ম। বীরেনবাবু ও হিতেনের বাবা জিতেনবাবুও শিশুকালে তার সঙ্গে খেলাধুলো করেছেন। সুতরাং জমিদারের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়ানো আছে ওদেরও ভালোমন্দ।'

—'তাহলে রসময়কে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী বলেই ধরে নিতে পারি?'

—'নিশ্চয়। এমনকি বীরেনবাবু নিজের উইলে ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর রসময়কে যেন দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়।'

ভারত কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'রসময়ও এ কথা জানে তো?'

—'তা জানে বই কি!'

—'এটা একটা ভাববার কথা। বীরেনবাবুর মৃত্যু হলে রসময়ের লাভ বই ক্ষতি নেই। আচ্ছা, আর এক কথা, ভগবান করুন হিতেনবাবু দীর্ঘজীবী হোন, তবু একটা কথা আমার জানা দরকার আজ যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে ওঁদের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?'

—'এক ভাগিনেয়।'

—'তাঁর নাম?'

—'সদানন্দবাবু। বয়সে হিতেনের চেয়ে ঢের বড়ো। কিন্তু সংসারে তাঁর কোনওই নিষ্ঠা নেই। সন্ন্যাসী হয়ে যাননি বটে, তবে ধর্মকর্ম নিয়েই দিনরাত কাটিয়ে দেন। বীরেনবাবু তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাঁকে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করবার কথা তুলেছিলেন, কিন্তু তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি চিরকুমার—কামিনী বা কাঞ্চন কিছুর দিকেই তাঁর অনুরাগ নেই।'

ভারত নীরবে বসে বসে কয়েকটা টানের পর টান মেরে হাতের সিগারেটটা নিঃশেষ করে বললে, 'হিতেনবাবু, এইবারে বলুন, অদূর ভবিষ্যতের জন্যে আপনি কী কর্তব্য স্থির করেছেন?'

হিতেন বললে, 'আমার হতভাগ্য জ্যাঠামহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, সবদিক দিয়ে কুসুমপুরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন। তাঁর সেই মহৎ ইচ্ছার কতক কতক পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনও যা অপূর্ণ আছে, তাই-ই পরিপূর্ণ করবার জন্য আমিও আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে চাই। অতঃপর কুসুমপুরই হবে আমার কর্মস্থল।'

—'আপনার সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক, এই কামনা করি। কিন্তু কুসুমপুরে গিয়ে আপনার একলা থাকা চলবে না।'

হিতেন বললে, 'একলা থাকব কেন? ফণীবাবু তো থাকবেন আমার একজন অভিভাবকের মতো!'

—'কিন্তু শুনেছি, ফণীবাবু থাকেন আপনার বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে। তার উপরে

তিনি হচ্ছেন ডাক্তার। নানা গ্রামে রোগীদের নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ইচ্ছা করলেও সবসময় তিনি আপনার উপরে দৃষ্টি রাখতে পারবেন না।'

হিতেন একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আপনি যদি এখন অনুগ্রহ করে কিছুকালের জন্যে আমার আতিথ্য স্বীকার করেন, তাহলে কেমন হয়?'

—'ভালোই হয়, কিন্তু আপাতত তা সম্ভব নয়। কতকগুলো মামলা নিয়ে আমাকে এখন কিছুদিন কলকাতাতেই বাস করতে হবে।'

—'তাহলে আর উপায় কী বলুন? একলাই আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।'

—'না হিতেনবাবু, এক উপায় আছে। আমার বন্ধু ভাস্কর যদি রাজি হয়, তা হলে তাকেই আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।'

হিতেন আমার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি কী বলেন, ভাস্করবাবু? দয়া করে আমার নিমন্ত্রণ রাখবেন?'

এ রকম প্রস্তাব হচ্ছে আমার পক্ষে অভাবিত। প্রথমটা আমার মনে জাগল বিস্ময়। তারপরেই স্মরণ হল কুসুমপুর থেকে পাওয়া যাচ্ছে যেন অ্যাডভেঞ্চারের উগ্র গন্ধ। একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে আমি ভালোবাসি বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সুতরাং কুসুমপুরে যাওয়ার প্রস্তাবটা আমার পক্ষে হল এক অতিশয় লোভনীয় প্রস্তাব। বলা বাহুল্য, হিতেনের প্রস্তাবে আমি সম্মতিজ্ঞাপন করলুম।

ভারত উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'ভাস্কর এখন কিছুকালের জন্যে জমিদারবাড়ির অন্ন ধ্বংস করুক, তারপর কলকাতার কাজগুলো সেরে নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে আমিও বেশি বিলম্ব করব না। আচ্ছা হিতেনবাবু, আমরা এখন আসি। কবে আপনি কুসুমপুরে যাত্রা করবেন?'

—'বললুম তো ঠিক তিন দিন পরে। ভাস্করবাবু, এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে পারবেন তো?'

আমাকে নিয়ে ভারত যখন বাড়িতে ফিরে এল, বেলা তখন তিনটে বাজে।

ভিতরে ঢুকেই দেখি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফটিকচাঁদ ও তার সঙ্গে খাকি শার্ট ও প্যান্ট পরা আর একটা লোক।

ভারত তাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করবামাত্র ফটিক এগিয়ে এসে বললে, 'স্যার, এ হচ্ছে সেই ৪৪৪৪ নম্বরের ট্যাক্সির ড্রাইভার।'

ভারত লোকটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি এসেছ বলে সুখী হয়েছি।'

লোকটা বললে, 'আমি আসতুম না হুজুর! কিন্তু ফটিক হচ্ছে সব-চিন্ ছেলে, ওর আবদার না রাখলে কী আর বাঁচোয়া আছে? তবে আমায় ডেকেছেন কেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভারত বললে, 'আজ সকাল সাড়ে নয়টার সময় তোমার ট্যাক্সিকে ভাড়া করেছিল?'

—'একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। তাঁকে আমি চিনতুম না হুজুর, কিন্তু তিনি নিজেই যেচে পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।'

ভারত আশ্চর্য হয়ে বললে, 'যেচে পরিচয় দিয়ে গেছে!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। বললেন, তিনি হচ্ছেন একজন ডিটেকটিভ, আর তাঁর নাম ভারতভূষণ চৌধুরি।'

ভারত একটু চমকে উঠে দুই ভুরু সংকুচিত করলে, তারপর কৌতুক-হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললে, 'শুনছ তো ভাস্কর?'

আমিও উচ্চকণ্ঠে না হেসে থাকতে পারলুম না। লোকটা কী ধড়িবাজ! জানে, তাকে আমরা খোঁজবার চেষ্টা করবই, তাই ব্যঙ্গ করে ভারতভূষণকেই শুনিয়ে দিতে চায় ডিটেকটিভ ভারতভূষণের নাম! লোকটা কেবল হিতেনের গতিবিধি লক্ষ করছে না, আমাদেরও হাঁড়ির খবর রাখছে নখদর্পণে! অদ্ভুত তার চাতুর্য! আমরা বড়ো সহজ লোকের পাল্লায় পড়িনি।

ভারত বললে, 'আচ্ছা বাপু, ভারতভূষণের পরিচয় পেলুম। কিন্তু ট্যাক্সি ছেড়ে সে কোথায় নেমে গেল বলতে পারো?'

ড্রাইভার বললে, 'আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তিনি ট্যাক্সি থেকে নেমে বড়োবাজারের একটা গলির ভিতরে ঢুকে গেলেন।'

—'আচ্ছা, আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই। এই পাঁচ টাকার নোটখানা তোমার বকশিশ।'

লোকটা চলে গেলে পর ফটিকের দিকে ফিরে ভারত জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাকে আর একটা কাজে পাঠিয়েছিলুম, মনে আছে তো?'

ফটিক বললে, 'মনে আছে বই কি স্যার। বেঙ্গল হোটেলের কোনও লোকই 'স্টেটসম্যান' পড়ে না। ন্যাশনাল হোটেলে কেবল একটা ঘরেই তিন দিন তিনখানা 'স্টেটসম্যান' কাগজ সরবরাহ করা হয়েছে।'

ভারত উৎফুল্ল স্বরে বললে, 'যা ভেবেছি তাই! কাগজ আনতে পেরেছ?'

—'আজকের কাগজ আনতে পারিনি হুজুর! 'বয়' বললে, ওখানকার ঘর ছেড়ে দিয়ে আজকের কাগজ নিয়ে বাবু চলে গিয়েছেন।'

—'চলে গিয়েছে! কখন?'

—'বেলা একটার সময়।'

—'আবার হাতের কাছে এসেও আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল! এমন সম্ভাবনার কথাও আমার স্মরণ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু উপায় নেই, যাক ও কথা। ফটিকচাঁদ, ওই বাবুর সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

—'ছিল স্যার, একজন মেয়েছেলে।'

—'কেবল পুরুষ নয়, সঙ্গে নারীও আছে। বেশ, এটাও আমার মনে থাকবে। ফটিক, হোটেল থেকে তুমি 'স্টেটসম্যান' কাগজ আনতে পেরেছ?'

—'পেরেছি স্যার, এই নিন কালকের আর পরশুর কাগজ।'

ফটিকের হাত থেকে কাগজ দু-খানা নিয়ে ভারত বললে, 'কালকের কাগজ আমার কাজে লাগবে না, আমি দেখতে চাই কেবল পরশুদিনের কাগজ।' সে একখানা কাগজ খুলে

পরে পরে পাতা উলটে হঠাৎ বলে উঠল, 'দ্যাখো ভাস্কর, আমার অনুমান সত্য কিনা দ্যাখো!'

আমি সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, খবরের কাগজের এক জায়গায় খানিকটা কাঁচি দিয়ে কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে!

ভারত বললে, 'হোটেলে হাতের কাছে বড়ো কাঁচি ছিল না। ছোটো নখকাটা কাঁচি দিয়ে একটু একটু করে কাগজের এই অংশটা কেউ কেটে নিয়েছে। তারপর দরকার মতো অক্ষর কেটে নিয়ে হিতেনবাবুর জন্যে পত্র লিখে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা ভাস্কর, তুমি তো এতদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ? তুমি কি কিছু অনুমান করতে পারছ?'

—'কী অনুমান?'

—'সর্বদা সঙ্গে ছোটো কাঁচি নিয়ে বেড়ানোর স্বভাব হতে পারে কাদের?'

—'কোনও কোনও মহিলার এই স্বভাব আমি লক্ষ করেছি।'

—'যথার্থ অনুমান করেছ। ভাস্কর, কুসুমপুরের মামলার সঙ্গে কোনও স্ত্রীলোকও জড়িত আছে।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'রহস্য যে আরও ঘোরালো হয়ে উঠল হে?'

ভারত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'এই মামলায় এমন কতকগুলো বিশেষত্ব আছে, আমার আর কোনও মামলায় আমি যা লক্ষ করিনি। তুমি হিতেনবাবুর সঙ্গে কুসুমপুরে যাচ্ছ। সর্বদাই মনে রেখো তোমার মাথার উপরে রইল গুরুতর ঝুঁকি। যতক্ষণ জেগে থাকবে, চোখ আর কান রাখবে খোলা। আমার কোনও পত্রের প্রত্যাশা কোরো না, কিন্তু তুমি কুসুমপুরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা নিয়মিতভাবে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ো। আর এক কথা। হিতেনবাবুকে তোমার চোখে আড়ালে যেতে দিয়ো না। আপাতত আমার আর কোনও বক্তব্য নেই।'

৷৷ সপ্তম ৷৷

দুই দাড়ি কি অভিন্ন?

ট্রেন কুসুমপুর স্টেশনে এসে থামল। তখন বৈকাল।

স্টেশনের বাইরেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল একখানা মস্তবড়ো রোলস্ রয়েস্ গাড়ি। চালক তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিলে—তার উর্দিপরা ফিটফাট চেহারা। হিতেন ও ফণীবাবুর সঙ্গে আমিও গাড়ির উপরে গিয়ে উঠলুম। গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরেই কুসুমপুর। গাড়ি যখন লোকালয়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, আমার মনে হল আমরা কলকাতার কোনও শহরতলির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। পথের দুই ধারেই সারি সারি ছোটো ও মাঝারি আকারের পাকা বাড়ি। মাঝে মাঝে খড়ে-ছাওয়া কুটিরেরও অভাব নেই। টাউন হল, স্কুল, লাইব্রেরি ও হাসপাতাল প্রভৃতির বড়ো বড়ো বাড়িও দেখলুম—এগুলি সবই সদ্যস্বর্গত বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরির দানশীলতার

সাক্ষ্য প্রদান করছে। তারপর পাকা বাড়ির সংখ্যা ক্রমেই কমে এল এবং বেড়ে উঠতে লাগল খড়ে-ছাওয়া মেটে কুটিরের সংখ্যা। বুঝলুম আমরা কুসুমপুরের অন্যপ্রান্তে এসে পড়েছি। তারপর ফুটবল খেলার মাঠ এবং তারপর পথের দুই ধারেই মাঝে মাঝে বনজঙ্গল, মাঝে মাঝে ফর্দা জায়গা, এবং মাঝে মাঝে এঁদো পুকুর ও চষা শস্যখেত প্রভৃতি। পাকা রাস্তা ক্রমেই পরিণত হল মেটে রাস্তায়।

ফণীবাবু বললেন, 'ভাস্করবাবু, ডান দিকে চোখ রাখুন, গাড়ি ছুটবে সেই জলাভূমির পাশ দিয়ে।'

ডান দিকে প্রথমে দেখা দিলে নিবিড় অরণ্য। জায়গায় জায়গায় তা আবার এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে, সূর্যকিরণও তার মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পায় না। অরণ্যের পরেই একটা চৌমাথার উপরে এসে পড়লুম।

ফণীবাবু সবিস্ময়ে একটা অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করে চালককে গাড়ি থামাতে বললেন।

সেখানে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘ মূর্তি। তার পরনে মিলিটারি পুলিশের পোশাক এবং হাতে একটা সঙ্গীন চড়ানো বন্দুক।

ফণীবাবু শুধোলেন, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

লোকটা সেলাম ঠুকে বললে, 'একজন কয়েদি পালিয়েছে, তাই পথে পাহারা দিচ্ছি।'

—'কয়েদি পালিয়েছে? কোথা থেকে?'

—'কুসুমপুরের হাজত থেকে।'

—'কী মামলার আসামি?'

—'খুনের মামলা। আসামির নাম তিনকড়ি সামন্ত।'

ফণীবাবু সভয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! তাহলে তো দেখছি এখানকার কারুরই প্রাণ নিরাপদ নয়!'

আমি বললুম, 'এ কথা বলছেন কেন?'

—'তিনকড়ি সামন্ত হচ্ছে খুনে ডাকাত। গেল মাসে এক দিনেই সে তিন-তিনটে খুন করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। সে যদি আবার পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সকলেরই যে-কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। দিনের আলো ঝাপসা হয়ে আসছে। চারিদিকে নির্জন জঙ্গল, তিনকড়ি কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে? গাড়ি চালাও, জলদি গাড়ি চালাও!'

গাড়ি আবার পূর্ণ বেগে ছুটে চলল। মিনিট দশেক পরে জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে আমরা আবার খোলা জায়গায় এসে পড়লুম।

হিতেন বললে, 'ওই দেখুন আমাদের বহুনিন্দিত জলাভূমি! লোকে কল্পনায় একে ভয়াল করে তুলেছে বটে, কিন্তু আমাদের বালকবয়সের কল্পনা এর মধ্যে পেত বহু অজানা রহস্য, বহু কল্পিত রোমান্সের সন্ধান! শৈশবে মনে করতুম ওইখানেই আছে সেই রহস্যময় তেপান্তর, যার উপর দিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় রক্ষপুরে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করবার জন্যে! কিন্তু হায়, দৃষ্টিভঙ্গি এখন বদলে গিয়েছে, আজ

ওই জলাভূমির মধ্যে খুঁজে পাই কেবল দুঃস্বপ্ন, দুর্ভাগ্য আর বিভীষিকা!'

আমার সাগ্রহ দৃষ্টি ও কৌতূহলী মন ছুটল জলাভূমির দূর-দূরান্তরে। নামে এটা জলাভূমি বটে, কিন্তু এর অধিকাংশই জলা বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে অবশ্য পড়ন্ত সূর্যকিরণে এখানে-ওখানে চিক চিক করে উঠছিল যেন বিদ্যুৎপূর্ণ জলের রেখা। কিন্তু বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই রয়েছে ধু ধু মাঠ, ছোটো বড়ো মাঝারি জঙ্গল এবং পত্রবহুল বনস্পতি। কাঁচা শ্যামলতার প্রলেপে সবকিছুই হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ মধুর। খুব দূরে জেগে রয়েছে যেন একটা সবুজে ছাওয়া পাহাড়, তারও মাথায় মুকুটের মতো রয়েছে নাতিবৃহৎ একটি তরুকুঞ্জ।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'এখানে পাহাড়?'

ফণীবাবু হেসে বললেন, 'পাহাড় নয়, ওটাকে একটা বড়ো ঢিপি বলতে পারেন। অনেককাল আগে একসময় ওইখানেই ছিল কোনও প্রতাপশালী স্বাধীন রাজার মস্তবড়ো গড়। ওর মধ্যে ছিল বড়ো প্রাসাদ, ছোটো আর মাঝারি আকারের ঘর-বাড়ি, সেপাইদের থাকবার আস্তানা। সে-রাজবংশও কতকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের কেল্লাও পরিণত হয়েছে ভগ্নস্তূপে। তারই উপরে শত শত যুগ ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে মৃত্তিকারাশি। সেখানে জন্মেছে নানা জাতের গাছপালা, লতাপাতা, কাঁটাবন আর ঝোপঝাপ। আজ ওটা হয়ে পড়েছে অতীত গৌরবের সমাধিস্তূপের মতো।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলো সেই পাহাড়ের মতো উচ্চস্তূপের উপরকার তরুকুঞ্জকে উদ্ভাসিত করে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। তার উপরে ক্রমেই নেমে আসছে মড়াজড়ানো সাদা কাপড়ের মতো একটা কুয়াশার আবরণ। জলার কোথাও নেই কোনওই জীবনের চিহ্ন, জীবজন্তুরা যেন এই অভিশপ্ত ভূমিকে সাবধানে পরিহার করতে চায়। এমনকি শোনা যায় না পক্ষীদের কলরব পর্যন্ত। কেবল দূর দিয়ে জলা পার হয়ে নীলিমার বুকে যেন শুভ্র ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে উড়ে যাচ্ছে নীড়ের সন্ধানে বলাকার দল। এখানে তাদেরও কেমন বেমানান বলে মনে হতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে খানিক তাকাতেই দেখা গেল, গাছপালার শ্যামলতার উপরে জেগে রয়েছে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার উচ্চ গম্বুজ।

হিতেন বললে, 'ওই আমার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের স্মৃতিভরা পৈতৃক বাসভবন! ওইখানেই আমার পূর্বপুরুষরা আজ পাঁচশো বছর ধরে পৃথিবীর আলোয় চোখ খুলেছেন, খেলা করেছেন, সংসার পেতেছেন, তারপর অকালে বা যথাকালে বিদায় নিয়ে গিয়েছেন এই দুনিয়ার লীলাভূমি থেকে। আমিও মাথার উপরে এক অভিশাপ নিয়ে ওই পৈতৃক বসতবাড়ির ভিতরে আবার প্রবেশ করছি, এর পরিণাম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কিছুই এখন কল্পনা করতে পারছি না।'

ফণীবাবু বললেন, 'কিছু ভেবো না হিতেন, পরিণামে তোমার মঙ্গলই হবে। আমার কেবল একটি অনুরোধ এই, সন্ধ্যার পর অন্ধকারে তুমি কিছুতেই ওই জলার ধার মাড়িয়ো না।'

হিতেন বললে, 'আপনি কী ভাবছেন ওই ঠাকুমার রূপকথা শুনে ভয়ে আমি জড়সড়

হয়ে থাকব? বিলাতফেরত হয়েও এইসব মেয়েলি কুসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাব? আমার দ্বারা ওসব হবে না!'

আমি বললুম, 'ভারত যতদিন না এখানে এসে পৌঁছয়, অন্তত ততদিন পর্যন্ত আপনাকে সাবধান হয়ে থাকতে হবে বই কি! ভারত এলে পর কী ব্যবস্থা হয় তা ভেবে দেখা যাবে।'

গাড়ি ফটকের ভিতরে প্রবেশ করল। জমিদারবাড়ির নতুন অধিকারীকে দেখে বন্দুকধারী সান্ত্রী আভূমি আনত হয়ে অভিবাদন করলে।

মাঝখানে লাল কাঁকর বিছানো পথ, তার দুইধারে সুবিস্তীর্ণ জমি, বড়ো বড়ো পুরাতন গাছ, পুষ্করিণী, দিঘি ও নদীর মতো দেখতে ঝিল। ফলের গাছ ও ফুলের গাছ কিছুরই অভাব নেই। বাড়ির সামনেকার জমির উপরে আধুনিক আদর্শে উদ্যান রচনার চেষ্টা হয়েছে। সেখানে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে গ্রিক রূপলক্ষ্মী ভেনাসের নগ্নমূর্তি এবং কোথাও বা দেখা যায় রোমান ভাস্করের গড়া বিখ্যাত অ্যাপলো মূর্তির নকল।

অবশেষে আমাদের রোল্‌স্ রয়েল থামল গিয়ে গাড়িবারান্দার তলায়।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল একজন বয়স্ক লোক, পরনে মেরজাই, কাপড় ও চটিজুতো এবং তার মুখের তলার দিকটা শ্মশ্রুগুম্ফে আচ্ছন্ন।

খুব নীচু হয়ে জোড়হাতে প্রণাম করে সে বললে, 'আসুন ছোটোবাবু, আসুন। এইবারে বড়োবাবু হয়ে নিজের জিনিস নিজের মতো করে গুছিয়ে নিন।'

হিতেন বিমর্ষভাবে বললে, 'রসময়, শোক-দুঃখের ভিতর দিয়ে আজ আমাকে বাস্তুভিটাতে আবার পদার্পণ করতে হল। আমার মনে আনন্দ নেই।'

রসময় বললে, 'জানি ছোটোবাবু, জানি। সুখ-দুঃখের চাকা নিয়তই ঘুরছে, নিয়তির মহিমায় কখনও আমরা হাসি, কখনও আবার কাঁদি। নিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তো লাভ নেই।'

হিতেন আর কিছু না বলে আমাকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করে বাড়ির ভিতরের দিকে অগ্রসর হল। ফণীবাবু সেইখান থেকেই তখনকার মতো বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

সেকালকার ধনীদের মতোই প্রকাণ্ড অট্টালিকা। কোথাও স্থানাভাবের জন্যে সংকীর্ণতা নেই। বড়ো বড়ো তিনটে মহল, তিন মহলেই বড়ো বড়ো তিনটে উঠান, প্রত্যেক উঠানের চারিদিকেই বড়ো বড়ো থামওয়ালা সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত দরদালান, এমনকি প্রত্যেক দরজা-জানলাও এমন বড়ো বড়ো যে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে হাতির মতো জীবও অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারে।

আমার থাকবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল এমন একখানা লম্বাচওড়া ঘর যে, তার মধ্যে পদক্ষেপ করে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে মনে হল। রাত্রে খেতে বসে দেখলুম, আমার জন্যে ভুরিভোজনের আয়োজন হয়েছে। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কিছুরই অভাব নেই।

সেদিন কারুর সঙ্গে আর কোনও কথাবার্তা হল না। শরীর শ্রান্ত হয়েছিল, শয্যায় আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

কত রাত্রে জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ছুটে গেল। ঘুমের ঘোরেই শুনলুম, কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। সেই নিরালা নিস্তব্ধ রাতে স্তব্ধতার বুক ফুঁড়ে ঝরে পড়ছে যেন কোনও অসহায়া নারীর কাতর কান্না!

প্রথমটা ভাবলুম, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের কান্না শুনছি। ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসলুম। না, স্বপ্ন তো নয়! সেই বিরাট প্রাচীন পুরীর কোনও প্রান্ত থেকে সত্য-সত্যই ভেসে আসছে আর্ত নারীর ক্রন্দন-স্বর! কে কাঁদে? কেন কাঁদে? তারপর ভালো করে কিছু বুঝতে না বুঝতেই থেমে গেল সেই কান্নার আওয়াজ।

পরের দিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে হিতেনের সঙ্গে দেখা হল।

হিতেন শুধোলে, 'কাল রাত্রে সুনিদ্রা হয়েছে তো?'

আমি বললুম, 'তা একরকম হয়েছে বলতে পারি। তবে একবার রাত্রে কার কান্না শুনে ঘুম আমার ভেঙে গিয়েছিল। আপনি কিছু শুনেছেন?'

হিতেন বললে, 'দেখছি আমি তাহলে স্বপ্ন দেখিনি। হ্যাঁ, আমিও একটা কান্নার আওয়াজ পেয়েছিলুম বটে। কিন্তু কারণ কিছুই বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, রসময়বাবুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক।'

রসময় এসে সমস্ত শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলে। বললে, 'বাড়ির ভিতরে মেয়েছেলে থাকে কেবল দুজন। আমার স্ত্রী আর সত্যর মা—সে রান্না-বাড়ি ধোয়-পোঁছে, বাসন মাজে আর সেইখানেই রাত্রে শোয়। তার গলার আওয়াজ এতদূর আসবার কথা নয়। আর আমার স্ত্রী যে কাঁদেনি তার সাক্ষী হচ্ছি আমি।'

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রসময়ের মিথ্যাকথা হাতে-নাতেই ধরা পড়ে গেল। চায়ের পালা শেষ করে নিজের ঘরের দিকে আসতে আসতে দেখলুম, দালানের উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীনা স্ত্রীলোক। সে যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি। তার দুই চোখ কেঁদে কেঁদে যে ফুলে রাঙা হয়ে উঠেছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। নিশ্চয়ই সে রসময়ের স্ত্রী মঙ্গলা ছাড়া আর কেউ নয়!

আমাকে দেখেই সে মুখে কাপড় টেনে অন্দরের দিকে চলে গেল।

ব্যাপারটা বুঝলুম না। মঙ্গলার কান্না আমার ঘর থেকে আমি শুনতে পেয়েছি, আর রসময় যে তা শোনেনি, এটা কী বিশ্বাসযোগ্য? তবে কেন সে এতবড়ো মিথ্যা কথাটা বললে? সত্য গোপন করে তার কী লাভ?

কলকাতার রাস্তায় সেদিন সকালে ট্যাক্সিতে চড়ে যে-লোকটা হিতেনকে অনুসরণ করেছিল, তার মুখ আমি দেখিনি বটে, কিন্তু তার মুখে যে ছিল লম্বা দাড়ি, এটা আমার নজরে পড়েছিল। রসময়েরও মুখে আছে দীর্ঘ দাড়ি। ধাঁ করে মনে হল, তবে কি এই দুই ব্যক্তিই অভিন্ন?

॥ অষ্টম ॥

শাঁখিনির বিল

চারিদিকটা ভালো করে দেখবার জন্যে জমিদারবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। হিতেন আমার জন্যে মোটরের ব্যবস্থা করেছিল। আমি বললুম, কোনও নতুন জায়গা ভালো করে দেখতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে গেলুম কুসুমপুরে ফণীবাবুর বাড়িতে। কিন্তু তিনি রোগী দেখতে বাইরে গিয়েছেন শুনে কুসুমপুরের পথে-পথেই খানিকটা পদচারণা করে, আবার জমিদারবাড়ির দিকেই ফিরে এলুম।

যাবার সময়ও দেখেছি, আবার আসবার সময়ও দেখছি, জলাভূমির উপরে এখন আর কোনওই বিভীষিকার ছাপ নেই। নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়ছে তরুণ সূর্যকর, সমস্ত জলাভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন কাঁচা সোনার জলের ঢেউ। রাত্রে এখানে ছিল একটা আড়ষ্ট আতঙ্কের ভাব, এখন কিন্তু গাছে গাছে নৃত্য করছে যেন আনন্দের অরুণ ছন্দ। সবুজ রঙের মিষ্টতায় বনবাদাড়ও হয়ে উঠেছে সুমধুর।

সেইদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো পথ চলছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার নাম ধরে ডাকলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম কার পায়ের শব্দ।

ফণীবাবুর কথা ভেবে ফিরে দাঁড়ালুম, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম একটি নতুন লোক হাসিমুখে হনহন করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মাথায় মাঝারি, গায়ের রং ফরসা, দেহ সুগঠিত, সৌম্য মুখ, পরনে খাকি রঙের শার্ট, প্যান্ট ও জুতো-মোজা, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। হাতে রয়েছে একটা দণ্ড, তার ডগার দিকে দেখা যাচ্ছে জাল-দেওয়া ছোট্ট একটা ফাঁদ—এইরকম বিলাতি ফাঁদ দিয়ে পতঙ্গ-প্রজাপতি প্রভৃতি বন্দি করা হয়।

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি, লোকটি আমার কাছে এসে বললে, 'ভাস্করবাবু, অজানা লোককেও ডেকে যেচে আলাপ করলে আমাদের এই পাড়াগেঁয়ে আদবকায়দা ক্ষুণ্ণ হয় না। নমস্কার মশাই, নমস্কার। বোধহয় ফণীবাবুর মুখে আপনিও অধীনের নাম শুনেছেন। আমার নাম বরেন বসু!'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি। আপনিই বোধহয় প্রাণীতত্ত্ববিদ বরেনবাবু?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রাণীতত্ত্ববিদ বললে ব্যাপারটা সহজে বোঝা যায়। কিন্তু ওস্তাদদের পরিভাষায় আমরা নাকি 'নিসর্গবাদী!' নামটা বেশ জমকালো হয় বটে, কিন্তু ভাবটাও হয়ে ওঠে ঘোরালো, সহজে মানে বোঝা দায়।'

—'কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

—'আপনি যখন বেরিয়ে আসছেন, আমিও সেইসময় ফণীবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম। সেইখানে টেবিলের উপরে আপনার কার্ড দেখেই পিছনে পিছনে ছুটে আসছি। আশাকরি, হিতেনবাবু ভালো আছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'শুনে সুখী হলুম। আমরা এখানকার লোক সবাই ভেবেছিলুম, বীরেনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পরে আর কেউ এই জমিদারবাড়িতে বাস করতে আসবেন না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, হিতেনবাবুর কোনও কুসংস্কার নেই।'

—'আমারও তাই বিশ্বাস।'

—'আপনিও সেই উল্কামুখী শঙ্খচূর্ণীর গালগল্পটা শুনেছেন বোধহয়?'

—'শুনেছি বই কি!'

—'কিন্তু সেটা ঠিক গালগল্প কি না ভগবানই জানেন। ওই গল্পটা বীরেনবাবুও বিশ্বাস করতেন, আর শেষ পর্যন্ত সেইটেই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

—'তার মানে?'

—'ফণীবাবুর মুখে শুনেছি বীরেনবাবুর 'হার্ট' ছিল দুর্বল! ঘটনার রাত্রে জলার উপরে নিশ্চয়ই তিনি কোনও ভয়াল মূর্তি দেখেছিলেন। সে দেখা ভুল দেখাও হতে পারে, তবে তারই ফলে যে তাঁর হার্ট ফেল করে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।'

—'বরেনবাবু, এ সম্বন্ধে আপনার নিজের মত কী?'

—'এ সম্বন্ধে আমার নিজের কোনও স্পষ্ট ধারণাই নেই। কিন্তু আপনার বন্ধু ভারতবাবু কী বলেন?'

আমি সচমকে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে বললুম, 'আপনি ভারতকেও চেনেন নাকি?'

—'ঠিক চিনি বলতে পারি না, তবে ফণীবাবুর মুখে শুনেছি, তিনিই নাকি এই মামলার ভার নিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'ভারত এ মামলার ভার নিয়েছে কি না আমি জানি না। সে আমাদের সঙ্গে আসেনি।'

বরেন হতাশভাবে বললে, 'দুর্ভাগ্যের কথা। ভারতবাবু এ মামলাটার ভার নিলে তাড়াতাড়ি একটা সুরাহা হয়ে যেত। থাক সে কথা। এখন একটা অনুরোধ করি। এতদূরই যখন এসেছেন, একবার 'আলেয়া' না দেখে চলে যাবেন?'

বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, 'দিনের বেলায় আলেয়া!'

খিলখিল করে হেসে উঠে বরেন বললে, 'সে আলেয়া নয় মশাই, সে আলেয়া নয়! জলার ধারে আমি যে বাসা বেঁধেছি, তারই নাম রেখেছি 'আলেয়া'। আসুন না একবার, আমার ভগ্নীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

সবকিছু দেখতে এবং সকলের সঙ্গে পরিচয় করতেই তো কুসুমপুরে আমার আগমন। অতএব ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে আমিও চললুম বরেনের পিছনে পিছনে।

পায়ে পায়ে এগুতে এগুতে বরেন বললে, 'চমৎকার জায়গা এই জলাভূমি! চারিদিক ধু ধু খোলা, ক্ষণে ক্ষণে আলোছায়ার পরিবর্তন, উষর, নির্জন, রহস্যময়। এর মধ্যে যে কত গুপ্তকথা লুকিয়ে আছে আপনি কিছুতেই তা বলতে পারবেন না!'

—'আপনি কি এখানকার সব কথা জানেন?'

—'আমি তো এখানে এসেছি মোটে দু-বছর, তবে দায়ে পড়ে কতক কতক আমাকে জানতে হয়েছে।'

—'দায়ে পড়ে?'

—'হ্যাঁ, শখের দায় আর কী? জানেনই তো আমি হচ্ছি শখের প্রাণীতত্ত্ববিদ। ওই জলার ভিতরে থাকে কতরকম প্রজাপতি, ফড়িং আর গুবরে পোকা প্রভৃতি। হাতের এই জাল দিয়ে সেইসব আমি ধরে বেড়াই। ওখানকার ওই জলার প্রত্যেক পথ আর গলি-ঘুঁজি আমাকে নখদর্পণে রাখতে হয়। অপথ-বিপথ-কুপথের ভিতর থেকে বেছে নিতে হয় সুপথ। কিন্তু সুপথের সংখ্যা এখানে বড়োই কম, অধিকাংশই হচ্ছে প্রাণান্তকর বিপজ্জনক। দূরে ওই জায়গাটা দেখছেন তো?' হাত তুলে সে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

দেখলুম সুদূরে রয়েছে সবুজ ঘাসে মোড়া একটা তেপান্তরের মতো মাঠ। বললুম, 'ও জায়গাটা অনায়াসেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে পরিণত হতে পারে।'

হো হো করে হেসে উঠে বরেন বললে, 'তাহলে কোনও ঘোড়ারই আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। ওখানে একটু এদিকে-ওদিকে পা বাড়ালেই, মানুষ কি পশু কেউই বাঁচে না। ও জায়গাটাকে স্থানীয় লোকেরা কী বলে জানেন? 'শাঁখিনির বিল'?'

—'মানে?'

—'মানে ওখানেই নাকি শাঁখিনি জাতীয় প্রেতিনীদের বাস। তারাই নাকি আঁধার রাতে জলার ধারে এসে গলা দিয়ে জাহির করে শাঁখের মতো আওয়াজ। ভাস্করবাবু, যেখানটা আপনি সবুজ মাঠ বলে ভ্রম করছেন, ওখানটায় পানায় ঢাকা জল ছাড়া আর কিছুই নেই। ওর জায়গায় জায়গায় জমি আছে, কিন্তু কোথায় জল আর কোথায় জমি, চোখে দেখে সহজে বোঝা যায় না। যত দুর্ঘটনা হয় সেইজন্যেই। এই গেল হপ্তাতেই আমি নিজে দেখেছি, একটা গোরু চরতে চরতে ওখানে গেল, তারপরেই পাতাল যেন হঠাৎ তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেললে! আরে মশাই, দেখুন—দেখুন! আজও আবার একটা হতভাগা গোরু ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।'

আমার স্তম্ভিত চক্ষের সামনেই গোরুটা যেন মাটি ফুঁড়ে তলিয়ে যেতে লাগল! সে প্রাণপণে ছটফট করতে করতে দুই-তিন বার তীব্র কণ্ঠে আর্তনাদ করলে,—তারপরে আর্তনাদ হল স্তব্ধ, সে-ও হল অদৃশ্য!

আমার বুকে জাগল শিহরন। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'বলছেন, আপনি ওখানে যেতে পারেন?'

বরেন সহজ ভাবেই বললে, 'পারি। কোনও কোনও নিরাপদ পথ আমি চিনি।'

—'আমিও চেনবার চেষ্টা করব।'

চক্ষু বিস্ফারিত করে বরেন বললে, 'ভগবানের দোহাই, কখনও অমন চেষ্টা করবেন না, তাহলে সেটা হবে আত্মহত্যারই সামিল। তারপরে ওই শুনুন!'

আচম্বিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জাগ্রত হল অদ্ভুত শঙ্খধ্বনির মতো আজব একটা কণ্ঠস্বর! সেই বিস্ময়কর, বিচিত্র ধ্বনির উৎপত্তি যে কোথায়, কিছুই বোঝা গেল না, তিন-তিন বার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, প্রভাতের সূর্যকরকেও অপার্থিবতায় বীভৎস করে তুলে

এবং চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে আবার তা নীরব হয়ে গেল। কেন জানি না, আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল!

বরেন বললে, 'শুনলেন?'

—'কী ও?'

—'লোকে বলে শাঁখিনির ডাক!'

—'দিনের বেলাতেও?'

—'মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও শোনা যায়। এখন বুঝতে পারছেন তো ভাস্করবাবু, অকারণেই জনরবের সৃষ্টি হয়নি?'

আমি বললুম, 'যুক্তি দিয়ে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'সুতরাং কোনওদিন জলার ভিতরে যাবার চেষ্টা করবেন না। এই আমাদের বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। ওই আমার 'আলেয়া'।'

ঠিক যেন ছোটোখাটো একখানি বাগানবাড়ি। ভয়াবহ জলাভূমির পাশেই ছবির মতো দেখতে এই সুন্দর বাড়িখানিকে মানানসই বলে একেবারেই মনে হয় না।

হঠাৎ বাতাসে ভাসন্ত নানারঙা হালকা ফুলের পাপড়ির মতো চমৎকার একটি প্রজাপতি পাখনা নাচিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে ফুরফুর করে উড়ে গেল।

বরেন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে এক নতুন জাতের প্রজাপতি! ধরতেই হবে।' হাতের জালতিটা উঁচিয়ে সে সেই উড়ন্ত প্রজাপতির পিছনে পিছনে ছুটল। আক্রান্ত হয়ে প্রজাপতিটা জলার দিকে উড়ে গেল, কিন্তু নাছোড়বান্দা বরেন তবুও থামল না, জলার উপর দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে কতগুলো ঝোপঝাপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিছনে শুনলুম পায়ের শব্দ। ফিরে দেখি অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা প্রায় দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর রং, গড়ন ও চোখ-মুখের বর্ণনা করতে গেলে দরকার হয় চিত্রকরের তুলি কিংবা কবির লেখনী। বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়। পোড়ো জলার পাশে জীবন্ত প্রতিমার মতন এমন চমৎকার মূর্তির আবির্ভাব একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আন্দাজ করে নিলুম তিনিই হচ্ছেন বরেনের ভগ্নী।

মহিলাটি একবার চারিদিকে ত্রস্ত চক্ষু বুলিয়ে নিয়ে আমার কাছে এসে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, 'চলে যান! এখান থেকে চলে যান!'

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো বললুম, 'আপনি কী বলছেন!'

—'কুসুমপুর থেকে সোজা কলকাতায় চলে যান!'

—'কেন যাব?'

—'সব কথা আপনাকে খুলে বলতে পারব না। আপনার মঙ্গলের জন্যেই বলছি, আজকেই কলকাতায় চলে যান।'

—'কিন্তু আমি সবে যে এখানে এসেছি।'

মহিলা অত্যন্ত কাতরভাবে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনি কি বললেও বুঝবেন না? যদি

নিজের ভালো চান, তবে আজকেই কলকাতায় চলে যান! ওই আমার দাদা আসছেন, সাবধান, ওঁর কাছে কোনও কথা তুলবেন না।'

বরেন বলতে বলতে এগিয়ে এল, 'নাঃ প্রজাপতিটাকে ধরতে পারলুম না। এই যে, সীমা! তুমি যে দেখছি এসেই এঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছ!'

মহিলা বললেন, 'হিতেনবাবুকে আমি জলার গল্প বলছিলুম!'

বরেন মুখ টিপে হেসে বললে, 'ইনি কে তুমি জানো?'

মহিলা বললেন, 'ইনিই তো শ্রীহিতেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি।'

আমি সহাস্যে বললুম, 'না দেবী, ক্ষমা করবেন, আমার নাম ভাস্কর সেন, আমি হিতেনবাবুর বন্ধু। এখানে বেড়াতে এসেছি।'

মহিলাটির মুখে ফুটে উঠল নিরাশার চিহ্ন।

বরেন বললে, 'ভাস্করবাবু, সীমাই হচ্ছে আমার ভগ্নী। চলুন, এইবারে আমাদের বাসার দিকে যাওয়া যাক।'

'আলেয়া' আকারে ছোটো হলেও সাজসজ্জায় সুন্দর। অল্প জায়গার মধ্যে সেখানে বিলাসিতার কোনও উপকরণেরই অভাব নেই। বৈঠকখানাটিও আরামপ্রদ।

সেইখানে বসে চা পান করতে করতে আমি বললুম, 'বরেনবাবু, দুনিয়ায় এত ঠাঁই থাকতেও এই বনজঙ্গলের ভিতরের পোড়ো জলার ধারে এসে বাসা বেঁধেছেন কেন?'

বরেন বললে, 'আমি প্রাণীবিদ্যা আর উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসি। কেবল ভালোবাসি না, এই হচ্ছে আমার জীবনের সাধনা। আমার সাধনার পক্ষে কুসুমপুরের এই জলাভূমি হচ্ছে আদর্শ জায়গা। কেবল আমিই নই, সীমাও হচ্ছে আমার সহকারিণী। কিন্তু ভাস্করবাবু, এমন জায়গায় আপনি কেন বেড়াতে এসেছেন? এটা কি বেড়াবার জায়গা?'

আমি বললুম, 'আমি এসেছি বন্ধু অর্থাৎ হিতেনবাবুর নিমন্ত্রণে। কয়েকদিনের জন্যে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেই, আবার ফিরে যাব কলকাতায়।'

—'হ্যাঁ, এ বেশিদিন থাকবার জায়গাও নয়। এখানে কিছুক্ষণের জন্যে গল্প করবার লোকও খুঁজে পাবেন না। এই দেখুন না, সময় কাটাবার জন্যে আমাকে আজ পায়ে হেঁটে ফণীবাবুর বাড়ি পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। এতদিন কাছাকাছি বীরেনবাবুকে পেতুম, মানুষ হিসাবে তিনিও ছিলেন চমৎকার, কিন্তু মৃত্যু এসে তাঁকেও এখান থেকে নিয়ে গেল। নতুন জমিদার হিতেনবাবু যখন বিলাতে, সেই সময়ই আমি এখানে এসে ডেরা বেঁধেছি। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার আলাপ হয়নি।'

—'তাঁর সঙ্গেও আপনি গিয়ে আলাপ করে আসতে পারেন। মানুষ হিসাবে তিনিও মন্দ লোক নন।'

—'তাই যাব, ভাস্করবাবু। একটানা নির্জনতা সহ্য করা কষ্টকর।'

॥ নবম ॥

ভাস্করের পত্র

'ভাই ভারত,

কুসুমপুরে এসে এর আগে যা যা ঘটনা ঘটেছে, কয়েকখানি চিঠিতে সেসব কথা তোমাকে আমি জানিয়েছি। এবার আমি রিপোর্টের আকারে তোমার কাছে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রেরণ করব।

বরেনের সঙ্গে যে হিতেনের আলাপ হয়েছে, সে কথা তুমি জানো। তারপর আজকাল তাদের আলাপই কেবল ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি, বরেনের ভগ্নী সীমাও মাঝে মাঝে জমিদারবাড়িতে বেড়াতে আসে। কেবল তাই নয়, হিতেনও তাদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে প্রায়ই 'আলেয়া'য় গিয়ে হাজির হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক। এ হচ্ছে যেন পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, এখানে মনের কথা বলবার জন্যে বন্ধু না পেলে জীবন হয়ে উঠবে ভয়াবহ।

আর একটা মজার কথা তোমাকে চুপিচুপি বলে রাখি। হিতেন যে সীমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। এও খুবই স্বাভাবিক। সীমা ও হিতেন দুজনেরই ললাটে লেখা রয়েছে এখন যৌবনের রাজটীকা। এবং দুজনই লাভ করেছে সৌন্দর্যের পরম আশীর্বাদ। পঞ্চশরের মহিমায় এখানে একটা কিছু ঘটলেও আমি অবাক হব না।

তবে বরেনের কথা আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু আমি লক্ষ করে দেখেছি, সীমার সঙ্গে হিতেনের এই অতিরিক্ত মেলামেশাটা সে যেন তেমন সুনজরে দেখে না। মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যায়; তার মুখে ফুটে ওঠে যেন বিরক্তির ভাব।

ভাই ভারত, তুমিও আমাকে ফেলেছ ভারী বিপদে। তোমার অনুরোধ হিতেনকে যেন একবারও আমি চোখের আড়ালে যেতে না দিই। কিন্তু আমার পক্ষে এ অনুরোধ রক্ষা করা হয়ে উঠেছে দুষ্কর। কোনও তরুণ যখন কোনও তরুণীর প্রেমে পড়ে, তখন তাদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি যে কতখানি অসহনীয়, সেটা বোঝা নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।

এইবারে আর একটি দরকারি কথা শোনো। ভবতোষ গুহের নাম তুমি কলকাতা থেকেই শুনেছ—সেই মামলাবাজ বলে কুখ্যাত ভদ্রলোক, এখনও তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। জমিদারবাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে তিনিও থাকেন জলার আর একধারে।

বয়সে তিনি প্রাচীন এবং তাঁর চরিত্র হচ্ছে অদ্ভুত। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা হচ্ছে আইন আর আইন আর আইন। মাতাল যেমন নিজের অনিষ্ট হচ্ছে জেনেও মদ ছাড়তে পারে না, তিনিও তেমনি সর্বস্বান্ত হবার ভয় না রেখেই মামলার পর মামলা চালিয়ে যেতে ভালোবাসেন।

গাঁয়ের অমুক লোক একখণ্ড জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে, ভবতোষবাবু অমনি দারোয়ান পাঠিয়ে সেই বেড়া ভেঙে দিলেন। বললেন, এ সাধারণের চলাচল করবার জায়গা, এটা কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অতএব শুরু হল মামলা, শেষ পর্যন্ত অনেক টাকা খরচ করেও হেরে গেলেন ভবতোষবাবুই, কিন্তু সেজন্যে তাঁর দুঃখ নেই, তিনি আবার কোনও

অছিলায় নতুন কোনও মামলার আয়োজনে নিযুক্ত হলেন। তিনি লাভ বা লোকসানের জন্যে নয়, মামলার জন্যেই মামলা করে আমোদ পান। কুসুমপুরের বাসিন্দারা তাঁর জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেখানে একবার কোনও মামলা বাধলেই আর দেখতে হবে না, ভবতোষবাবু গায়ে পড়ে যে-কোনও পক্ষে এসে যোগদান করবেন।

অন্য সবদিক দিয়েই মানুষ হিসাবে তাঁকে লোকে মন্দ বলে না। যেখানে মামলা নেই, সেখানে তিনি সহজ, সরল ও মজার মানুষ। আজকাল নাকি তাঁর আবার একটি নতুন ঝোঁক হয়েছে। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। বেশ বড়ো আর দামি একটা দূরবিন আনিয়ে বাড়ির ছাদের উপরে বসিয়েছেন, প্রায়ই তাঁকে দূরবিনে চোখ লাগিয়ে ছাদের উপরে হাজির থাকতে দেখা যায়। কিন্তু আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি বিরূপ হয়ে তিনি আপাতত স্থানীয় জলাভূমির চারিদিক পর্যবেক্ষণ করতেই ব্যস্ত আছেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম, হাজত থেকে হত্যাকারী তিনকড়ি সামন্ত পালিয়ে জলার ভিতরে কোথাও লুকিয়ে আছে কি না, সেইটেই তিনি আবিষ্কার করতে চান।

এইবারে রাত্রের একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলব। রাত তখন গভীর। চারিদিক নিদ্রা-নীরব।

আমার ঘুম খুব সজাগ, তুমি জানো। আচমকা জেগে উঠে শুনলুম দালানের উপরে কার পায়ের শব্দ। কে যেন খুব সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলুম, হাতে একটা জ্বলন্ত বাতি নিয়ে কার মূর্তি একদিকে চলে যাচ্ছে। পা টিপে টিপে আমিও বাইরে গেলুম। তারপর দূর থেকেই তাকে অনুসরণ করলুম।

জমিদারবাড়ির অধিকাংশ ঘরই লোকাভাবে খালি পড়ে থাকে। মূর্তিটা সেইরকম একটা খালি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমি উঁকি মেরে দেখলুম, একটা শার্সি-বন্ধ জানলার ধারে আলোটা তুলে ধরে মূর্তিটা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই সে যখন আলোর কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলে, সেই সময় তাকে আমি চিনতে পারলুম। সে হচ্ছে রসময়!

আলো নিবিয়ে সে ফিরে আসছে আন্দাজ করে, তাড়াতাড়ি আমি আবার নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালুম এবং দরজায় কান পেতে শুনলুম, আবার রসময়ের পায়ের শব্দ।

অল্পক্ষণ পরেই বাড়ির অন্য কোথা থেকে আর একটা শব্দ শোনা গেল। একটা দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারপরেই সব চুপচাপ। বুঝতে পারলুম এখানে আড়ালে আড়ালে আবার কোনও অঘটন ঘটবার উপক্রম হচ্ছে।

পরের দিন সকালে উঠেই হিতেনকে আমি সব ব্যাপার জানালুম। সে হচ্ছে রগচটা লোক, শুনেই অগ্নিশর্মা হয়ে রসময়কে ডাকতে উদ্যত হল।

আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করলুম। বললুম, আগে থাকতেই গোলমাল করলে সব ভেস্তে যাবে। তার চেয়ে আজ রাত্রে দুজনে মিলে পাহারা দিয়ে রসময়কে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হিতেন বললে, 'রসময় আজ আবার জানলার ধারে না যেতেও পারে।'

আমি বললুম, 'সেইটেই তো দ্রষ্টব্য!'

আমার অনুমানই সত্য হল। ঘরের ভিতরে আমি আর হিতেন সজাগ হয়ে বসে রইলুম এবং রাত প্রায় দুটোর সময় দালানের উপর আবার কালকের মতো পায়ের শব্দ পেলুম। তারপর আজও আবার একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় হল। কিন্তু আজ তার বাতি নেববার আগেই আমরা দুজনে সশব্দে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলুম।

হিতেন ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'রসময়বাবু, এসব কী ব্যাপার হচ্ছে?'

রসময়ের দেহ কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেল। এবং তার মুখের উপরে ফুটল বিষম আতঙ্ক ও বিস্ময়ের চিহ্ন।

হিতেন আবার বললে, 'চুপ করে রইলেন কেন?'

রসময় প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কিছুই নয় মশাই, কিছুই নয়!'

—'কিছুই নয়? আমি স্বচক্ষে দেখলুম শার্সির এপাশ থেকে বাতিটা ধরে আপনি নাড়ানাড়ি করছেন, তবু বলতে চান এসব কিছুই নয়? এত রাত্রে জানলার ধারে গিয়ে বাতি নাড়ার অর্থ কী?'

চট করে আমার মাথায় জাগল একটা সন্দেহ! রসময়ের হাত থেকে বাতিদানটা নিয়ে আমিও গিয়ে দাঁড়ালুম জানলার ধারে। তারপর বাতিটা একবার উপরে ও একবার নীচে নামিয়ে শার্সির ভিতর দিয়ে জলাভূমির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলুম। যা ভেবেছি তাই! অনেক দূরে জলার ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা আলো জ্বলে উঠে দুলতে লাগল এদিকে ওদিকে।

দৃশ্যটা হিতেনেরও নজর এড়াল না। সে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'রসময়বাবু, বাতি নেড়ে আপনি কাকে সংকেত করছিলেন?'

এইবারে রসময়ের ভাব বদলে গেল। উদ্ধত স্বরে স্পষ্ট ভাষায় সে বললে, 'এটা হচ্ছে আমারই ঘরোয়া ব্যাপার। আপনাকে বলব না!'

বিষম রাগে হিতেনের কপালের শির ফুলে উঠল। সে গম্ভীর স্বরে বললে, 'উত্তম, আপনাকে আর এখানে চাকরি করতে হবে না। কালই আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।'

—'বেশ, তাই যাব।'

—'ছি, ছি, আপনার লজ্জা করে না? আপনারা বংশানুক্রমে এইখানে বাস করে আসছেন, আর আমার বিরুদ্ধেই চক্রান্ত?'

—'না, না, আপনার বিরুদ্ধে নয় বাছা, আপনার বিরুদ্ধে নয়!'

এ হচ্ছে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর! সচমকে ফিরে দেখলুম, ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধা মঙ্গলা।

রসময় তার সামনে গিয়ে বললে, 'মঙ্গলা, আর কোনও কথা নয়। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।'

মঙ্গলা তার কথা কানে না তুলে হিতেনকে সম্বোধন করে বললে, 'আমার স্বামীর কোনও দোষ নেই বাবা, সব দোষ আমারই। উনি যা করেছেন, আমার মুখ চেয়েই করেছেন।'

হিতেন বললে, 'তাহলে এ ব্যাপারের অর্থটা কী?'

—'আমার অভাগা ভাই, জলাভূমির ভিতরে উপোস করছে। আমরা তো তাকে অনাহারে মরতে দিতে পারি না। বাতি জ্বেলে তাকে জানানো হয়, তার খাবার প্রস্তুত। সে-ও আলো নেড়ে জানায়, জলার কোনখানে গিয়ে তাকে খাবার নিয়ে আসতে হবে!'

—'কে আপনার ভাই?'

অত্যন্ত নাচারের মতো মঙ্গলা শ্রান্ত স্বরে বললে, 'তার নাম তিনকড়ি সামন্ত। হাজত থেকে পালিয়ে সে ওই জলার ভিতরে লুকিয়ে আছে।'

অত্যন্ত বিস্ময়ে অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে হিতেন বললে, 'এ কথা কি সত্য রসময়বাবু?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আপনার বিরুদ্ধে আমরা কোনও চক্রান্তই করছি না। আশাকরি আপনি আমাদের নিমকহারাম ভাববেন না। এসো মঙ্গলা।' রসময়ের পিছনে পিছনে মঙ্গলা ঘরের বাইরে চলে গেল।

হিতেন অতিশয় ব্যগ্রভাবে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করে কিছুক্ষণ ধরে কী নিরীক্ষণ করলে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন ভাস্করবাবু!'

—'কোথায়?'

—'ওই জলায়।'

—'এই রাতে ওই জলায়! ওখানে কী মূর্তিমান অভিশাপ লুকিয়ে আছে, আপনি কি তার কথা ভুলে গেলেন?'

—'কিছুই ভুলিনি, তবু যেতে হবে! স্মরণ করুন, তিন-তিনটে খুন করেছে এমন হত্যাকারী লুকিয়ে আছে ওইখানে! বাগে পেলেই ও আরও মানুষ খুন করতে পারে। জলার আলোটা এখনও জ্বলছে! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলুন, তিনকড়িকে আজ গ্রেপ্তার করতেই হবে!'

আমাকে আর কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়ে হিতেন দ্রুতপদে অগ্রসর হল। অগত্যা আমাকেও যেতে হল তার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর বাড়ি থেকে বেরুবার আগে সে দুটো রিভলভার নিয়ে এসে আমার হাতে একটা গুঁজে দিলে। তারপর কেবল বললে, 'চলুন।'

সে রাত্রে প্রকৃতির অবস্থা ভালো ছিল না। পূর্ণিমার চার দিন পরে কতকটা ম্রিয়মাণ চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু থেকে থেকে তারও আলো ঢেকে দিচ্ছে পুরু মেঘের আচ্ছাদনী। এর আগেই দুই পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, অনতিবিলম্বেই আরও এক পশলা হবে বলে মনে হচ্ছে। বাজ গুমরে গুমরে উঠছে মাঝে মাঝে, ক্রুদ্ধ সর্পের মতো ফোঁস ফোঁস করে উঠছে দমকা বাতাস। রাতটাই ভীতিকর, তার উপর এই পথ। তার কথা না বলাই ভালো, কারণ ধরতে গেলে পথের অস্তিত্বই আমরা খুঁজে পেলুম না।

তবু আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। দূরে জ্বলছে একটা মিটমিটে দীপশিখা, তার পাণ্ডুর

আলোর দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা এবড়ো খেবড়ো জমি দিয়ে ঝোপঝাপ ভেঙে পায়ে পায়ে এগুতে লাগলুম, খানা ডোবার আশপাশ দিয়ে। আমাদের হাতে এক-একটা টর্চ ছিল তাই রক্ষা, নইলে কী হত বলা যায় না।

এতক্ষণ সেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। আচম্বিতে সেই স্তব্ধতা খণ্ডবিখণ্ড করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল সে এক কর্ণভেদী বিকট চিৎকার, না তাকে বলব প্রচণ্ড কোনও শঙ্খের অদ্ভুত নির্ঘোষ? সে যেন এক বিশ্বগ্রাসিনী ভয়ংকরী ধ্বনিময়ী ক্ষুধা, এর আগে কোনও পার্থিব জীবের কণ্ঠে সেরকম চিৎকার আমরা শ্রবণ করিনি। যেন নিশীথিনীর অন্তরাত্মাকে বিষাক্ত করে দিয়ে সেই ধ্বনি জেগে উঠল একবার, দুইবার, তিনবার!

আমাদের পাগুলো যেন প্রোথিত হয়ে গেল মাটির ভিতরে এবং কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বুকের ভিতরটা পর্যন্ত।

প্রায় আড়ষ্ট হাতে টর্চের আলোটা ফেলে দেখলুম, হিতেনের মুখ হয়ে গেছে একেবারে রক্তহীন! অস্ফুটকণ্ঠে সভয়ে বললুম, 'শুনছেন?'

হিতেন বিহুল স্বরে বললে, 'ও কীসের আওয়াজ ভাস্করবাবু?'

—'জানি না, জানতেও চাই না। এর পরেও কি তিনকড়িকে খুঁজতে চান?'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জড়তা ও বিহুলতার ভাব কাটিয়ে উঠে হিতেন দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'নিশ্চয়ই! একটা চিৎকার শুনে ভয় পাবার জন্যে পৃথিবীতে আমি জন্মগ্রহণ করিনি! ওটা ভূত হোক, আর জন্তুই হোক—তাতে কিছু এসে যায় না—ওই সামনে আলো দেখা যাচ্ছে, এগিয়ে চলুন!'

আবার এগিয়ে চললুম! চাঁদ মেঘের আড়ালে তার আলো লুকিয়েছে। কিন্তু ওই দীপশিখাটা আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে তখন পথ নির্দেশক ধ্রুবতারার মতোই। দেখতে দেখতে আমরা আলোটার খুব কাছে এসে পড়লুম।

হিতেন আমার কানে কানে বললে, 'এইবারে সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে চলুন।'

তারপরে হঠাৎ কী হল জানি না, দপ করে সেই আলোটা নিবে গেল। কিন্তু নিবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই আমাদের নজরে পড়ল একখানা বীভৎস মুখ, তার মাথায় উচ্ছৃঙ্খল চুল, চিবুকে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও চক্ষে মারাত্মক হিংসার দীপ্তি! একটা চাপা গর্জন, দ্রুত পদশব্দ এবং তারপর আবার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা!

হিতেন হতাশ ভাবে বললে, 'তিনকড়ি নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পেয়েছে, আবার সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল!'

কিন্তু আমি ভালো করে তার কথা শুনছিলুম না, কারণ আমার চোখের সামনে জেগে উঠেছিল আর একটা অত্যন্ত অভাবিত দৃশ্য।

শেষ রাতের চাঁদের ছবি তখন নেমে গিয়েছে পশ্চিম আকাশের প্রান্তে। চাঁদ এবং আমাদের মাঝখানে ছিল খুব জঙ্গলে ভরা একটা উঁচু ঢিপি। তারই টঙে কালি দিয়ে গড়া নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সুদীর্ঘ মানুষের দেহ! তার মুখ চোখ কিছুই

দেখবার উপায় ছিল না, কেবল এইটুকুই বুঝতে পারলুম যে, সেই রহস্যময় মূর্তিটা মুখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে নীচের জঙ্গলের দিকেই।

তারপরেই একখানা দ্রুতগামী বড়ো মেঘ এসে দ্রষ্টব্য সমস্ত দৃশ্যই ঢেকে দিলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ঘেরাটোপে।

কে এই লোক? এ যে তিনকড়ি নয়, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। তবে এই তিমিরাত্মক দুর্যোগদুঃখার্ত রাত্রে, এই সাংঘাতিক জলাভূমির মাঝখানে ওখানে একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছে ওই রহস্যময় লোকটা?

এইবারে হিতেনের কণ্ঠে পেলুম ভয়ের সাড়া। আমার কাঁধের উপরে একখানা কম্পিত হাত রেখে বললে, 'এখানকার সমস্ত ব্যাপার ক্রমেই বিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চলুন ভাস্করবাবু, আমরা ফিরে যাই।'

প্রিয় ভারত, পরদিন সকালবেলাতেই ঘটল আর একটা সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

সকালবেলায় চায়ের টেবিলে হিতেনের দেখা পেলুম না। খোঁজ নিয়ে শুনলুম, সে নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে জলার দিকে গিয়েছে।

শুনেই আমার টনক নড়ল। তুমি বলেছ, তাকে যেন আমি একদণ্ডও চোখের আড়ালে যেতে না দিই। সেই কথা মনে হতেই আমিও তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা শেষ করে জলার দিকে ছুটলুম। মনে মনে হিতেনের উপরে রাগও হতে লাগল। জলার মতো ভয়ানক জায়গায় সে একলা গিয়েছে কেন?

যত জোরে পারি পা চালিয়ে দিলুম। রাত্রের বিভীষিকা জলার কোথাও তখন দেখা যাচ্ছিল না।—এ যেন কালকের সেই জলাই নয়! বাতাসে বনফুলের গন্ধ, প্রজাপতির পাখনায় ইন্দ্রধনুর ছন্দ এবং মকরন্দলোভী মধুকরদের গুঞ্জনানন্দ। বৃষ্টিস্নাত হয়ে সেখানকার বনজঙ্গলের শ্যামলতা হয়ে উঠেছিল অধিকতর নয়নাভিরাম।

খানিকক্ষণ পথ চলবার পরও এদিক ওদিক তাকিয়ে হিতেনের অস্তিত্ব পেলুম না। তারপরই সামনে পড়ল কালকের সেই উঁচু ঢিপিটা। তার উপরেই কাল রাত্রে অপচ্ছায়ার মতো দাঁড়িয়েছিল সেই রহস্যময় মূর্তিটা। আমিও ধীরে ধীরে তার উপরে গিয়ে উঠলুম। তার পরেই যা চোখে পড়ল তা ভয়ানক নয়, কিন্তু অভাবিতরূপে অদ্ভুত।

নীচে একটা হেলে পড়া গাছের গুঁড়ির উপরে বসে রয়েছে দুই মূর্তি। সীমা ও হিতেন! বোঝা গেল, তাদের সম্পর্কটা ইতিমধ্যে রীতিমতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ হিতেন ডান হাত দিয়ে সীমার স্কন্ধ বেষ্টন করে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মতোই বাক্যালাপ করছিল।

তারপরেই আচম্বিতে আর এক কাণ্ড। একদিকের জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এল সীমার ভাই বরেন।

সেইখানে সেই অবস্থায় হিতেন ও সীমাকে দেখে সে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট কাঠের পুতুলের মতো। তারপরেই দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দ্রুতপদে ছুটে এল হিতেনদের কাছে। হাত নেড়ে মারমুখো হয়ে কী যে সব বলতে লাগল, এতদূর থেকে আমি তা শুনতে

পেলুম না বটে, তবে কথাগুলো যে হিতেনের পক্ষে সুশ্রাব্য নয়, এটুকু আন্দাজ করে নিতে মোটেই আমার কষ্ট হল না।

হিতেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আত্মপক্ষ সমর্থন বা কোনও প্রতিবাদই করলে না।

তারপর বরেন ক্রুদ্ধভাবে হাত নেড়ে সীমাকে একটা ইঙ্গিত করে হন হন করে চলে গেল এবং সীমাও ঘাড় নীচু করে যেতে লাগল তার পিছনে পিছনে।

আমি মনে মনে হেসে নীচের দিকে নেমে হিতেনের দিকে অগ্রসর হলুম। ব্যাপারটা অভাবিত হলেও অস্বাভাবিক নয়। চিরন্তন পুরুষত্ব দাবি করছে চিরন্তন নারীত্বকে, এই দাবির উপরেই তো বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি।

হিতেন ক্লিষ্ট মুখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখেই হেসে ফেললে। বললে, 'ভেবেছিলুম আজকের এই নাট্যাভিনয়টা গোপনীয় থেকেই যাবে। কিন্তু দেখছি তা হবার নয়, চারিদিকেই দর্শকের ভিড়! আপনিও দর্শক রূপে কোথায় আসন সংগ্রহ করেছিলেন?'

বললুম, 'ওই ঢিপিটার উপরে। কিন্তু নাট্যাভিনয় দেখতে নয়, খুঁজতে এসেছিলুম আপনাকেই।'

—'তাহলে বোধহয় অভিনয়ের ব্যাপারটা আপনার কাছে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না!'

—'অভিনয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অভিনয়েই। আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি।'

হিতেন তিক্ত কণ্ঠে বললে, 'ভাস্করবাবু, পাত্র হিসাবে আমি কি বাঞ্ছনীয় নই?'

—'পাত্র হিসাবে আপনি দুর্লভ।'

—'তাহলে? তাহলে কি আমাকে বুঝতে হবে যে ওই বরেনবাবু পাগল ছাড়া আর কিছুই নন?'

—'এ কথা কেন বলছেন?'

—'আপনার কাছে বলা বাহুল্য, সীমার দিকে আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছি। সীমার হাবভাব ব্যবহারেও বুঝেছি, সে-ও আমাকে অপছন্দ করে না। আজ সকালে কালকের রহস্যটা ভালো করে বোঝবার জন্যে আমি জলার ভিতরে এসেছিলুম। দৈবগতিকে সীমাও বেড়াতে এসেছিল এখানে। এই নিরালায় সীমাকে পেয়ে তার কাছে আমি বিবাহের প্রস্তাব তুলেছিলুম। কিন্তু সে কিছু জবাব দেবার আগেই পাগলা হাতির মতন ঘটনাক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন বরেনবাবু। আমি যে সীমাকে বিবাহ করতে চাই, সে কথা তিনি শুনেও শুনলেন না, উলটে মারমুখো হয়ে আমাকে যা মুখে আসে তাই বলে যেতে লাগলেন। শান্ত মেজাজের জন্যে আমার খ্যাতি নেই, ভাস্করবাবু! তবু যে আমি সব সহ্য করলুম, সে কেবল সীমার মুখ চেয়েই। কিন্তু আমি কি এতই ঘৃণ্য জীব?'

আমি বললুম, 'হিতেনবাবু, কারণ আমি আন্দাজ করছি। আপনাদের বংশের উপরে কী এক অভিশাপ আছে, শুনেছেন তো? বরেন বোধহয় সেইজন্যেই আপনাকে বাঞ্ছনীয় পাত্র বলে মনে করে না।'

হিতেন রাগে গর গর করতে করতে বললে, 'অভিশাপ না কুসংস্কার? এসব কিছুই আমি বিশ্বাস করি না।'

—'আপনি করেন না! কিন্তু কুসুমপুরের লোকরা বিশ্বাস করে।'

—'তাহলে তারা নির্বোধ, তারা অশিক্ষিত।'

—আমি বললুম, 'হতে পারে, কিন্তু তাই নিয়ে আপনার আর মাথা গরম করা উচিত নয়। বেলা হল, বাড়ির দিকে চলুন।'

॥ দশম ॥

জলাভূমির জঙ্গলে

ভারতের সঙ্গে থেকে থেকে আমার বুদ্ধি যে খুলেছে, সে নিজে এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। সে বলে, আমি যা কিছু করতে যাই তার গোড়াতেই গলদ করে ফেলি।

এই কুসুমপুরে এসে এ পর্যন্ত আমি যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা দেখে ভারত নিশ্চয়ই অল্প বিস্মিত হয়নি। সে এখানে সশরীরে উপস্থিত থাকলেও এর চেয়ে যে বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারত, আমি তা মনে করি না।

এদিকে ওদিকে ক্রমাগত সন্ধান নিয়ে আর একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি। সুরমা দেবী নামে এক ভদ্রমহিলা আজ কিছুকাল থেকে কুসুমপুরে বাস করে আসছেন। তিনি দরিদ্র এবং তাঁর স্বামীও নাকি নিরুদ্দেশ। তিনি কুসুমপুরের মেয়েমহলে জামা ও অন্যান্য সেলাইয়ের কাজ বিক্রি করে কোনওরকমে দিন গুজরান করেন। হিতেনবাবুর পিতৃব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় বীরেনবাবুকে তিনি নাকি তাঁর মৃত্যুর দিন সকালেই একখানা পত্র লিখেছিলেন। আর তার ফলেই সেই রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বীরেনবাবু জমিদারবাড়ির বাইরে যান এবং ঘটনাক্রমে মারা পড়েন।

সমস্ত ব্যাপারটাই দস্তুরমতো রহস্যময়। সুরমা দেবীর সঙ্গে বীরেনবাবুর কীসের সম্পর্ক ছিল? আর কোনও সম্পর্ক যদি না থাকে, তবে সুরমা দেবী তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন কেন? এর একটা উত্তর অবশ্য থাকতে পারে। এ অঞ্চলে বদান্যতার জন্যে বীরেনবাবুর নামডাক ছিল যথেষ্ট। অসহায়া সুরমা দেবী হয়তো তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। এটা মোটেই অসঙ্গত অনুমান নয়, কিন্তু রাত্রি নয় ঘটিকার সময় অন্ধকার ও বিপদসংকুল জলার কাছে সুরমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বীরেনবাবু কি যেতে পারেন? তাঁদের দুজনের দেখা হয়েছিল কি? কিংবা মৃত্যুর সময়ে বা পরে সুরমা দেবী ঘটনাস্থলে কি উপস্থিত হয়েছিলেন? পরে পরে এমনই আরও কোনও কোনও প্রশ্ন ওঠে।

আজ বৈকালে জলাভূমির পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলুম। আজ খালি বেড়ানো নয়, আমার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। কুসুমপুরের উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেরই সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, কেবল একজনের সঙ্গে এখনও আলাপ জমাবার সুযোগ হয়নি। অথচ এই লোকটিকেও আমার ভালো করে জেনে রাখা দরকার।

জলাভূমির ধারে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের মধ্যে ইনিও হচ্ছেন একজন। কে বলতে পারে এখানকার রহস্যের সঙ্গে কোনও না কোনও দিক দিয়ে এঁরও যোগাযোগ আছে কি না? ভারতের মুখে শুনেছি, গোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সন্দেহ করা।

আমি বলছি ভবতোষ গুহের কথা। তাঁর সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে লোকের মুখে শোনা কথা। উনি হচ্ছেন বাতিকগ্রস্ত ভদ্রলোক। কখনও যার-তার সঙ্গে মামলা বাধিয়ে দেন, আবার কখনও বা জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হবার জন্যে মস্ত দূরবিন কিনে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। আজকাল আবার তাঁর নাকি নতুন বাতিক হয়েছে, দূরবিনের সাহায্যে জলার জঙ্গলের ভিতর থেকে পলাতক খুনি তিনকড়িকে পুনরাবিষ্কার করবেন!

কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এখনও আমার পরিচয় হয়নি। আজ সেইজন্যেই সোজা ভবতোষবাবুর বাড়ির সামনে হাজির হলুম।

বাড়ির কাছে আসবার আগে খানিক তফাত থেকেই দেখতে পাচ্ছিলুম, দোতলার ছাদের উপরে একটি চেয়ারাসীন মূর্তিকে। মাথায় তাঁর সাদা ধবধবে লম্বা লম্বা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছিল, মুখেও আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু। বৃদ্ধের পরিধানেও সাদা জামা কাপড়। মূর্তির এই শুভ্রতার সামনেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালো দাঁড়ের উপর বসানো একটা কালো রঙের আড়াই হাত লম্বা বড়ো দূরবিন। আরও বুঝতে পারলুম, বৃদ্ধ দূরবিনটার মুখ পথের দিকে ফিরিয়ে তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে আমাকেই লক্ষ করছেন।

সদর দরজার সামনে গিয়ে ভবতোষবাবুর নাম ধরে ডাকতেই আমার সামনে এসে দেখা দিলেন ছাদের উপরকার সেই দূরবিনধারী ভদ্রলোক।

এবং আমি মুখ খুলবার আগেই তিনি হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, 'কেমন, আসতে হল তো? আমি জানি, আমার কাছে আপনাকে আসতে হবেই!'

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

ভবতোষ দুই ভুরু নাচাতে নাচাতে সকৌতুকে বললেন, 'চিনি না আবার, খুব চিনি! আপনি তো শখের গোয়েন্দা ভারতবাবুর বন্ধু ভাস্করবাবু।'

অধিকতর বিস্ময়ে বললুম, 'ভারতকেও আপনি চেনেন?'

—'নিশ্চয়ই চিনি! আমি চিনি না কাকে? কুসুমপুরে যারা আসে—এমনকি যারা আসতে চায়, তাদের সকলেরই কুলজি থাকে আমার নখদর্পণে! ওদিক দিয়ে কেউ আমার উপরে টেক্কা মারতে পারবে না। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। এসেছেন যখন, গরিবখানার ভিতরে এসে বসুন।'

মাঝারি আকারের বৈঠকখানা। আসবাবের মধ্যে খান কয়েক চেয়ার ও একটি গোল টেবিল।

প্রথমে তিনিই কথা পাড়লেন। বললেন, 'নতুন জমিদার হিতেন রায়চৌধুরির খবর কী? নিজের পাওনাগণ্ডা সব বুঝে নিতে পেরেছেন তো? তাঁকে বলবেন, একবার যেন আমার

সঙ্গে এসে দেখা করেন। আমি তাঁকে পথ বাতলে দেব। এই কুসুমপুর হচ্ছে দুরাচারদের বিচরণ ভূমি। এখানে কারুকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'তা আপনিও তো এইখানেই বাস করেন?'

তিনিও তেমনি হাসতে-হাসতেই জবাব দিলেন, 'জিজ্ঞাসা করলেই শুনতে পাবেন, সবাই আমাকেও প্রথম শ্রেণির দুরাচার বলেই জানে। তবে এটাও ঠিক, এখানে এত সব দুরাচারের দলে একমাত্র আমিই হচ্ছি বীরাচারী অর্থাৎ গায়ের জোরে অন্যান্য দুরাচারদের শায়েস্তা করবার চেষ্টা করি।'

সুযোগ বুঝে আমিও কাজের কথা তুলে বললুম, 'আপাতত আপনি কাকে শাসন করতে চান?'

ভবতোষ থতমত খেয়ে বললেন, 'আপনার এ প্রশ্নের অর্থ?'

—'অর্থ বিশেষ দুর্বোধ্য নয়। সম্প্রতি আপনি কি নতুন কোনও দুরাচারকে আবিষ্কার করেছেন?'

—'আবিষ্কার করেছি বললে ঠিক হবে না, তবে প্রায় তার কাছাকাছি গিয়েছি বটে। কিন্তু এসব হচ্ছে অতিশয় গোপনীয় ব্যাপার।'

আমি একেবারে সরাসরি প্রশ্ন করলুম, 'তিনকড়ি সামন্ত ওই জলার ভিতরে কোথায় থাকে সেটা আপনি জানতে পেরেছেন কি?'

ভবতোষ চমকে উঠলেন। তারপর ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বলব না। আমি সে কথা বলব না! সে কথা শুনলেই আপনি হয়তো চারিদিকে ঢাক পিটিয়ে দেবেন!'

—'আমি অবশ্য ঢাক পিটিয়ে দেব না, তবে আপনি কি চান না যে তিনকড়ি সামন্ত ধরা পড়ে? জানেন তো, সে হচ্ছে জনসাধারণের শত্রু? আগেও হত্যা করেছে, আবার হত্যা করতেও পারে!'

ভবতোষ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'জানি না আবার, খুব জানি! আমাকে পেলেও সে হত্যা করতে পারে। একেবারে জলার ধারে থাকি, তার ভয়ে সর্বদাই আমি বন্দুক তৈরি রাখি।'

—'তবে?'

—'তবে কী জানেন, গভর্নমেন্টকে আমি ঘৃণা করি!'

—'কী আশ্চর্য! আপনি গভর্নমেন্টকে ঘৃণা করেন বলে তিনকড়িকে ধরিয়ে দিতে নারাজ?'

—'ঠিক তাই! এই গভর্নমেন্টই হচ্ছে আমার প্রধান শত্রু। মামলা নিয়ে আদালতে গেলে, হামেশাই আমি হেরে যাই! আমি কি কচি খোকা? আমি কি এর কারণ বুঝি না? সব বুঝি মশাই, সব বুঝি! এসব হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। গভর্নমেন্টের শক্তি থাকে তো তিনকড়ি সামন্তকে গ্রেপ্তার করুক। কিন্তু আমি গভর্নমেন্টকে কোনও সাহায্যই করব না।'

মনে মনে হেসে বললুম, 'তাহলে ইচ্ছা করলে আপনি গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে পারেন?'

—'নিশ্চয়ই পারি, একশোবার পারি।'

—'তাহলে আমাকে বলুন দেখি, তিনকড়ি সামন্ত কোথায় লুকিয়ে আছে?'

—'ওই জলার ভিতরে।'

—'এ সমাচার নতুন নয়। কুসুমপুরের আর সকলেও ওই সন্দেহই করে। এই জলা তো একটুখানি জায়গা নয়, ওর জঙ্গলের ভিতরে দলে দলে হাতিও লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ওর মধ্যে ঠিক কোথায় গেলে তিনকড়িকে পাওয়া যাবে, সে কথা কি কেউ জোর করে বলতে পারে?'

ভবতোষ বুক ফুলিয়ে সদম্ভে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি পারি!'

—'তাহলে বলুন না।'

—'আপনি যদি কথাটা অন্য কারুর কাছে প্রকাশ না করেন, তাহলে চুপি চুপি আপনার কাছে বলতে পারি।'

—'বেশ, অঙ্গীকার করছি, এ কথা আর কারুর কাছে প্রকাশ করব না।'

আমার দিকে হেলে পড়ে গলা খুব নামিয়ে ভবতোষ বললেন, 'তিনকড়ি থাকে ওই পোড়ো ডাঙার ভাঙা রাজবাড়ির ভিতরে।'

—'আপনি নিজের চোখে তাকে সেখানে দেখেছেন?'

—'না, এ হচ্ছে আমার অনুমান।'

—'এমন অনুমানের কারণ?'

—'ছাদের উপরে বসে দূরবিনের ভিতর দিয়ে রোজই আমি দেখতে পাই, কাঁধে ঝুলি নিয়ে একটা ছোকরা এই সামনের পথ দিয়ে জলায় গিয়ে পড়ে। তারপর ওই ভাঙা রাজবাড়ির দিকে চলে যায়।'

—'তাহলে এই পথ দিয়ে ওই জায়গাটায় যাওয়া যায়?'

—'ওখানে যাবার আরও কোনও কোনও পথ আছে। কিন্তু সেগুলো নিরাপদ নয়। সুপথ বলতে কেবল এই পথটাকেই বোঝায়। কিন্তু এ পথের কথা খুব কম লোকই জানে।'

আমি কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করলুম। তারপর বললুম, 'কিন্তু যে ছোকরার কথা আপনি বললেন, সে তো কোনও চাষাভুষোর ছেলেও হতে পারে?'

ভবতোষ চেয়ারের উপরে বসে দুলতে দুলতে বললেন, 'মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়! আমার মতো সব চিন্‌ লোক চাষার ছেলে দেখে চিনতে পারবে না, এও কি একটা কথা? তার উপরে ও-জলার সঙ্গে চাষাভুষোর কী সম্পর্ক থাকতে পারে মশাই? ও ছোকরা চাষাদের কেউ নয়, সে হচ্ছে অন্য কারুর দূত!'

—'দূত?'

—'হ্যাঁ, রোজ কেউ তার হাত দিয়ে তিনকড়িকে খাবার পাঠিয়ে দেয়। আরে, আরে, ওই দেখুন! নাম না করতেই দূত এসে হাজির!'

তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে সাগ্রহে জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, প্রায় সিকি মাইল

তফাত দিয়ে একটা ছোকরার মতো মূর্তি জলার ভিতরে নেমে হন হন করে এগিয়ে চলল; এবং দেখতে দেখতে বনবাদাড়ের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছোকরার চেহারা কী রকম, এতদূর থেকে তার কিছুই আমি বুঝতে পারলুম না।

তার পিছনে পিছনে ছোটবার জন্যে আমার পা দুটো তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু পাছে ভবতোষ কিছু সন্দেহ করে বসেন, তাই মনের ইচ্ছা কোনও রকমে দমন করলুম। কিন্তু পথটা ভালো করেই চিনে রাখলুম। আরও খানিকক্ষণ বসে বসে ভবতোষের আবোল-তাবোল বুকনি সহ্য করতে হল। তারপর চা আর জলখাবার না খাইয়ে তিনি আমাকে কিছুতেই মুক্তি দিলেন না।

বলা বাহুল্য, ভবতোষের বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমি ধরলুম সেই ধ্বংসাবশেষে যাবার পথ। সুপথ না হলেও পথটা বেশি দুর্গম নয়। জলার জল সেখানে এসে ওঠে না এবং ঝোপঝাড় বনজঙ্গলের উৎপাতও কম। কিন্তু পথের দুই পাশেই কতকগুলো বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে বাইরেকার নাগরিক সভ্যতার অন্য কোনও দৃশ্য চোখের আড়াল করে রাখে। পাখিদের বিদায়ী সংগীতে চারিদিক তখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং সূর্য নেমে গিয়েছে অস্তাচলে। দূর থেকেও মানুষের কোনও কলরবই আর ভেসে আসে না।

যাচ্ছি তিনকড়ির সন্ধানে। শুনেছি তার নাকি হাসতে হাসতে মানুষ খুন করাই অভ্যাস। এই নির্জন স্থানে এখন যদি হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে সে তার বন্ধু বলে আলিঙ্গন করবে না। তিনকড়ির শত্রুতায় সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। পকেটে রিভলভারের উপরে হাত রেখে দিকে দিকে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম এবং প্রতি পদেই মনে করতে লাগলুম, এই বুঝি তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়!

তারপর বনজঙ্গল আবার অধিকতর নিবিড় হয়ে উঠল এবং পথও হয়ে এল অধিকতর সংকীর্ণ। সেই নিরালা জঙ্গলের ভিতরে তিনহাত তফাতেও কেউ লুকিয়ে থাকলে তাঁর অস্তিত্ব টের পাওয়া অসম্ভব।

আরম্ভ হল পুরাতন দুর্গ ও রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। বৃক্ষ, লতা ও জঙ্গলের সঙ্গে জড়াজড়ি করে বিরাজ করছে সেই বিরাট ধ্বংসাবশেষ, কতদূর পর্যন্ত যে তার বিস্তৃতি সেটা আমি ধারণা করতেও পারলুম না। কোনও কোনও জায়গায় একটা প্রাচীরের খানিকটা, কোথাও বা ভেঙে পড়া স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি, এবং কোথাও বা উঁচুনীচু আগাছাভরা মাটির ঢিপি। এখানে ছাদহীন ঘর, ওখানে দ্বারহীন খিলান। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে অটুট অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে কোনও কোনও শ্রীহীন ঘরবাড়ির অংশ, তাদের ভিতরে হয়তো দেখা যাচ্ছে মস্ত একটা উঠান, কিন্তু সমস্তই এমন ভাবে বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন যে বাইরের কেউ সেখানে পদার্পণ করতে ভরসা পাবে না। থেকে থেকে ধড়াস করে বুক কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে বিকট স্বরে তক্ষকরা, চলনপথের আশপাশ দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে কালো বিদ্যুতের মতো ছুটে যায় একাধিক বিষাক্ত সর্প। মাথার উপরে গাছের পাতায় পাতায় বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে জাগে যেন কোনও অমূর্তের দীর্ঘশ্বাস।

ছায়া তাড়াতাড়ি ঘন হয়ে উঠছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগলুম। তারপরেই এক জায়গায় দেখলুম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে খানকয়েক প্রায় অটুট ঘর। কোনও কোনও ঘরের দরজাও এখনও ভেঙে পড়েনি। এ রকম ঘরে অনায়াসেই কোনও পলাতক আসামি গা ঢাকা দিকে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। রিভলভারটা পকেট থেকে বার করে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে একখানা ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলুম।

চমকে উঠলুম বিপুল বিস্ময়ে! ঘরের একপাশে রয়েছে একখানা ক্যাম্প খাট ও বিছানা এবং আর একদিকে দেখা যাচ্ছে একটা স্টোভ, ইকমিক কুকার, চায়ের পেয়ালা ও অন্যান্য খানকয়েক বাসনকোসন। বটে! আসামি তাহলে এই ঘরে এসেই আড্ডা গেড়েছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপরেই হঠাৎ চোখ পড়ল বিছানার উপরে, সেখানে পাথর চাপা দেওয়া রয়েছে একখানা কাগজ এবং তার উপরে লেখা—'আজ বৈকালে ভবতোষবাবুর সঙ্গে ভাস্করবাবু দেখা করতে গিয়েছেন।'

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে না পেরে মূর্তির মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম! ওই কথাগুলোর অর্থ কী? যে পলাতক আসামিকে খুঁজতে আমি এতদূর এসেছি, সে কি এইখানে বসে-বসেই চর পাঠিয়ে আমার সমস্ত গতিবিধির সন্ধান রাখছে?

ঠিক সেই সময় ঘরের বাইরে শুনলুম পায়ের শব্দ। তারপরেই দরজার কাছেই দেখলুম একটা আগতপ্রায় মূর্তির ছায়া। কিন্তু ছায়াটা হঠাৎ মাটির উপরেই স্থির হয়ে পড়ল এবং তারপরেই পরিচিত কণ্ঠে শুনলুম, 'বন্ধু ভাস্কর, বাইরে এখনই পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে। অন্ধকার ছেড়ে আলোকে এসো।'

এ হচ্ছে ভারতের কণ্ঠস্বর।

॥ একাদশ ॥

আবার জলায় মৃত্যু

আমি দৌড়ে বেড়িয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলুম, দরজার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে মৃদু মৃদু হাসছে বন্ধুবর ভারতকুমার! বললুম, 'ভারত! তুমি এখানে?'

ভারত বললে, 'তুমি বন্ধুহত্যা করতে আসছ না ভাস্কর, রিভলভারটা সাবধানে পকেটে রাখো।'

আমি বললুম, 'তোমাকে দেখে যে কী খুশিই হয়েছি!'

—'খালি খুশি, আশ্চর্য হওনি?'

—'সে কথা আর বলতে?'

—'আমিও কম আশ্চর্য হইনি ভাই। তুমি যে এখানে আসবে অতটা আমি ধারণায় আনতে পারিনি।'

—'কিন্তু আমাকে দেখবার আগেই তুমি তো আমার কথা জানতে পেরে নাম ধরে ডেকেছ!'

—'দরজার বাইরেই মাটির উপরে পড়ে রয়েছে দেখলুম একটা সিগারেটের ধূমায়মান ভস্মাবশেষ। ভালো করে তাকিয়েই দেখলুম সেটা হচ্ছে 'প্লেয়ার্স নেভিকাট' সিগারেট। ওই বিশেষ মার্কা মারা সিগারেটটির পরম ভক্ত হচ্ছ তুমি। কুসুমপুরের মতো জায়গায় ও রকম সিগারেট সুলভ নয়। তাইতেই তোমার অস্তিত্বের কথা অনুমান করেছি। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে আমি এখানে আছি? ও, বুঝেছি, সে রাত্রে জলার উঁচু ঢিপিটার উপরে উঠে বোকার মতো আমি আত্মপ্রকাশ করেছিলুম, সেইজন্যেই তুমি আমার কথা জানতে পেরেছ?'

—'না ভারত, সেদিন আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। আর আজ তোমাকে খোঁজবার জন্যেও আমি এখানে আসিনি।'

—'তবে তুমি কেন এসেছ?'

—'তিনকড়ির খোঁজে! ভবতোষের বিশ্বাস, তিনকড়ি এইখানেই লুকিয়ে আছে। তিনি তার এক চরকে রোজই এদিকে আসতে দেখেন।'

ভারত হাস্য করে বললে, 'সে তিনকড়ির চর নয় ভাস্কর, সে হচ্ছে আমাদের ফটিকচাঁদ। তার সাহায্যেই এখানে এসে হাজির হয় আমার খাবারদাবার আর বাইরের খবরাখবর। হিতেনবাবু, বরেন বসু, সীমা আর তোমার সমস্ত গতিবিধির কথাই জানতে আমার বাকি নেই।'

আমি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললুম, 'তুমি নিজেই যখন সব খবর রাখতে পারো, তখন আমাকে খাটিয়ে মেরে তোমার কী লাভ হল?'

ভারত আমার কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে বললে, 'রাগ কোরো না ভাই, তোমাকে দিয়ে আমি যথেষ্ট কাজ পেয়েছি। সে সময় হিতেনবাবুর সঙ্গে আমার কুসুমপুরে এলে চলত না। আমি আগে কলকাতায় থেকে কুসুমপুরের পাত্রপাত্রীদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলুম। কারুর কারুর জীবনের পূর্ব ইতিহাস জানবারও দরকার হয়েছে, সেজন্যে কলকাতায় আমার না থাকলে চলত না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুলিশের পুরোনো ফাইলও ঘাঁটতে হয়েছে। আটঘাট না বেঁধে আমি কলকাতা ত্যাগ করতে পারিনি। অথচ হিতেনবাবুকে কুসুমপুরে একলা পাঠানোও আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করিনি। তাই তাঁর সঙ্গে পাঠিয়েছিলুম তোমাকেও। এইবারে আসল ব্যাপারটা বুঝলে?'

—'বুঝলুম। কিন্তু কুসুমপুরের সমস্ত পাত্রপাত্রীর পরিচয় তুমি বোধহয় সংগ্রহ করতে পারোনি। ধরো, সুরমা দেবী। ওই মহিলাটির চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গিয়েই যে বীরেনবাবু মৃত্যুমুখে পড়েছিলেন, এই গুপ্তকথাটা আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কি এ কথা জানো?'

উচ্ছলিত কৌতুক হাস্যে আমার গর্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভারত বললে, 'জানি বই কি ভাই, নিশ্চয়ই জানি। আমি সুরমা দেবীর সঙ্গে দেখাও করেছি। তাঁর কাছে গিয়েই আমি কুসুমপুরের বিয়োগান্ত নাটকের মূলসূত্রটি খুঁজে পেয়েছি।'

গোয়েন্দার কাজে ভারত বোধহয় অদ্বিতীয় এবং অপরাজেয়। আমি হার মেনে স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

ভারত বললে, 'সীমা দেবীর যে পরিচয় তুমি জানো, সেইটেই তাঁর আসল পরিচয় নয়।'

—'মানে?'

—'তোমরা জানো, সীমা হচ্ছেন্ বরেনের ভগ্নী। কিন্তু আমি জেনেছি, সীমা হচ্ছেন বরেনের সহধর্মিণী!'

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম। মহাবিস্ময়ে বলে উঠলুম, 'তুমি কী বলছ হে?'

ভারত উচ্চহাস্য করে বললে, 'ঠিকই বলছি।'

—'কিন্তু হিতেন যে সীমার প্রেমে পড়েছেন!'

—'সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। সুন্দরী তরুণীর প্রেমে কে না পড়তে চায়?'

—'আর এ ব্যাপারটা বরেনেরও অজানা নয়!'

—'বরেন তো জেনে শুনেই হিতেনকে প্রেমে পড়বার সুযোগ দিয়েছে।'

—'কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি হিতেন আর সীমার ঘনিষ্ঠতা দেখে বরেন মারমুখো হয়ে তেড়ে এসেছে।'

—'তা তো আসবেই। বরেন নিজের বাড়ির নাম রেখেছে 'আলেয়া'। তার ইচ্ছা, সীমাও আলেয়ার মতোই নিজে ধরা না দিয়ে, হিতেনকে কেবল দূর থেকে আকর্ষণ করুক। সীমাকে পরস্ত্রী জানলে হিতেন নিশ্চয়ই তার দিকে আকৃষ্ট হত না। সেইজন্যেই তাকে অভিনয় করতে হয়েছে বরেনের অবিবাহিত ভগ্নীর ভূমিকায়। কিন্তু বরেন আজও জানতে পারেনি যে এই বিপজ্জনক ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে সীমার কোনওই আগ্রহ নেই। বরং মনে মনে সে এই অন্যায়ের বিরোধী। উপরন্তু হিতেনের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে সীমাও যে তার প্রতি অনুরাগিণী হয়েছে, এটুকু আন্দাজ করলেও হয়তো ভুল হবে না।'

আমি খানিকক্ষণ গুম হয়ে ভাবতে লাগলুম। তারপর বললুম, 'না, না, সবই যে কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! এ রকম ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে বরেনের কী লাভ হবে?'

ভারত বললে, 'কী লাভ হবে সেটা প্রকাশ পাবে যথাসময়েই। আপাতত খালি জেনে রাখো, এই মামলার প্রধান আসামি হচ্ছে বরেন বসুই।'

কী জবাব দেব বুঝতে না পেরে আমি হতবুদ্ধির মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ভারতের মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

ভারত আবার হেসে উঠে বললে, 'এইটুকুতেই এত বেশি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেয়ো না ভাস্কর! কারণ এখনও তোমার বিস্ময়ের পাত্র পূর্ণ হয়নি!'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'এরও উপরে আরও বিস্ময় আছে নাকি?'

—'সুরমা দেবী হচ্ছেন বরেন বসুর স্ত্রী!'

আমি আর কোনও মতপ্রকাশের চেষ্টা না করে একেবারে হাল ছেড়ে দিলুম।

ভারত বলতে লাগল, 'দশ বৎসর আগে বরেন বসুর সঙ্গে সুরমা দেবীর বিবাহ হয়।

বিবাহের পাঁচ বৎসর পরেই সুরমাকে ত্যাগ করে বরেন একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আমি বরেনের যে পূর্ব ইতিহাস সংগ্রহ করেছি, এসব কথা বলছি তার উপরেই নির্ভর করে। নিরুদ্দিষ্ট হবার পরে বরেন ঠিক কোন তারিখে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সীমার স্বামীর পদে অধিষ্ঠিত হয়, সেটুকু এখনও জানতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছি যে, চার বৎসর আগে বরেন লক্ষ্নৌ শহরে একটি বড়ো ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারের পদে কাজ করত। তারপর সেখান থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ভেঙে আবার সে অজ্ঞাতবাসে যায়। তারপর তার আবির্ভাব হয়েছে এই কুসুমপুরে। সে যে কেবল আত্মগোপন করবার জন্যে কুসুমপুরে এসেছে, এটা যেন মনে কোরো না। তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রীতিমতো মারাত্মক।'

আমি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'তুমি কি বলতে চাও, বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর মূলে আছে ওই বরেন বসুই?'

—'আগে আমার কথা আরও কিছু শোনো। বরেনের প্রথমা স্ত্রী সুরমা দেবী স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে দারুণ অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিনপাত করতে থাকেন। তারপর কিছুদিন আগে হঠাৎ কোনও গতিকে পলাতক স্বামীর ঠিকানা পেয়ে তিনিও চলে আসেন কুসুমপুরে। বরেনের সঙ্গে যে তাঁর দেখা হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। তারপর উপেক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে বরেনের কী কথোপকথন হয়, সেটা অবশ্য আমি জানতে পারিনি। কিন্তু সুরমার মুখেই আমি জেনেছি, তাঁকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে বরেন বলে যে, 'তুমি যদি কোনও গোপনীয় কারণের ওজর দেখিয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণকে এক রাত্রে বাইরে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করতে পারো, তাহলে আবার আমি তোমাকে গ্রহণ করব।' সুরমা সরল বিশ্বাসে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। সেই চিঠি পেয়ে বীরেনবাবু যথাসময়ে বাড়ির বাইরে জলার ধারে আসেন, তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।'

আমি বললুম, 'কিন্তু বীরেনবাবুর মৃত্যুর ভিতরে বরেনের কী হাত থাকতে পারে? লোকের ধারণা কোনও অলৌকিক আগ্নেয়মূর্তি দেখেই ভয় পেয়ে বীরেনবাবুর মৃত্যু হয়েছে।'

ভারত বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার মনে কি এমন সন্দেহ হয় না যে, ওই অদ্ভুত মূর্তিটার সঙ্গে বরেনের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?'

—'অলৌকিকের সঙ্গে লৌকিকের সম্পর্ক? এমন সন্দেহ কি যুক্তিহীন নয়?'

—'আপাতত যুক্তিহীন বলেই মনে হবে বটে। কিন্তু জেনো, বীরেনবাবুর পরেই হিতেনবাবুর পালা! সেজন্যেও ইতিমধ্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে।'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'তুমি কী বলছ, ভারত? বিপদের খাঁড়া ঝুলছে কি হিতেনবাবুর মাথার উপরেও?'

—'নিশ্চয়!'

—'তাহলে তো অনেকক্ষণ তাঁকে একলা রেখে আমার এখানে আসা উচিত হয়নি!'

—'না, উচিত হয়নি। দেখতে পাচ্ছ, জঙ্গলের উপরে চাঁদের আলো আর তার নীচে রয়েছে ঘুটঘুটে অন্ধকার! এখনই তোমার হিতেনবাবুর কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।'

ভারতের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই জলাভূমির নিবিড় নীরবতা টুকরো টুকরো করে দিয়ে জেগে উঠল একটা ভয়াবহ তীব্র আর্তনাদ।

আমরা দুইজনে মন্ত্রাভিভূতের মতো স্তম্ভিত হয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম কয়েক মুহূর্ত।

তারপরেই ভারত বেগে ছুটতে ছুটতে বললে, 'ছুটে এসো ভাস্কর, দ্যাখো আবার কী সর্বনাশ হল!'

প্রাণপণ বেগে পদচালনা করে মাঝে মাঝে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে কোনওরকমে আমরা ধ্বংসস্তূপের বাইরে এসে পড়লুম।

আবার সেই ভীষণ যন্ত্রণাপূর্ণ দারুণ চিৎকার! তার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ছুটে গেল জলাভূমির দিগ্বিদিকে, কিন্তু কোথা থেকে কে যে অমন আকুল চিৎকার করলে, আমরা কেউই বুঝতে পারলুম না। দুজনে প্রথমে খানিকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিকে দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলুম।

পূর্ণিমার চাঁদ তখন পূর্ব আকাশে বেশি উপরে উঠতে পারেনি, তাই জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভালো করে আমাদের দৃষ্টি চলছিল না। কোথাও খানিক আলো খানিক কালো মেঘে ঝোপঝাপ ও উঁচুনীচু জমি এবং কোথাও বা চন্দ্রালোকের স্পর্শ পেয়ে শাণিত অস্ত্রের মতো চকচক করে উঠছে দূরবিস্তৃত জলার জল। সেই কাতর চিৎকার এখন নীরব বটে, কিন্তু থেকে থেকে কোথায় জেগে উঠছে কার বিকট ও হিংস্র গর্জন!

ভারত চেঁচিয়ে বললে, 'ওই দিকে, ওই দিকে!'

—'কোথায় ভারত, কোথায়, কোথায়?'

আঙুল দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে ভারত বেগে দৌড়তে শুরু করলে! আমিও ছুটলুম তার পিছনে পিছনে।

এবড়ো খেবড়ো জমি, খানা ডোবা, কাঁটাঝোপ। প্রায় মিনিট দুয়েক ছুটে গিয়ে ভারত হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সভয়ে বলে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

অল্প দূরেই মাটির উপরে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা নিশ্চেষ্ট মূর্তি।

ভারত ত্রস্ত কণ্ঠে আবার বললে, 'তাকিয়ে দ্যাখো, আরও দূরে তাকিয়ে দ্যাখো, ওই যে!'

বিশেষ করে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু মনে হল, জমাট অন্ধকার দিয়ে গড়া কিম্ভূতকিমাকার কী একটা যেন ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি সচমকে বললুম, 'কী ওটা?'

—'সে হচ্ছে পরের কথা। এখন আগে দেখতে হবে, কে ওখানে অমন করে পড়ে রয়েছে?'

আমার মাথা ঘুরে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'তাহলে যা ভয় করেছিলুম, তাই কি সত্য হল? ওটা কি হিতেনবাবুর দেহ?'

—'খুব সম্ভব তাই।' বলেই ভারত উর্ধ্বশ্বাসে সেই আড়ষ্ট দেহটার কাছে গিয়ে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে দেহটাকে উলটে ধরে সানন্দে চিৎকার করে উঠল, 'ভাস্কর, ভাস্কর! ভগবান রক্ষা করেছেন!'

আমি বললুম, 'তবে কি ওটা হিতেনবাবুর দেহ নয়?'

—'না, না, না! এসে দেখে যাও!'

আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। না, এ দেহ হিতেনবাবুর নয়। এর মাথার চুলগুলো অস্নাত ও বিশৃঙ্খল এবং মুখে রয়েছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন এবং এর গায়ের রংও মিশমিশে কালো।

ভারত বললে, 'ভাস্কর, আমার মনে হয় এইই তোমাদের তিনকড়ি সামন্ত!'

আমি তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললুম, 'কিন্তু এর দেহের কোথাও তো রক্ত বা ক্ষতচিহ্ন নেই! অথচ দেখছি লোকটা একেবারেই মারা পড়েছে!'

মৃতদেহটাকে দুই হাতে একটু তুলে দু-চার বার ঝাঁকানি দিয়ে ভারত বললে, 'লাশের মাথাটা লটপট করছে। এর ঘাড় ভেঙে গিয়েছে। সামনে মূর্তিমান মৃত্যুর মতো কোনও বিভীষণকে দেখে ভয়ে পালাতে পালাতে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল, এর ঘাড় ভেঙেছে সেই চোটেই।'

—'মূর্তিমান মৃত্যু? ব্যাপারটা কী ভারত?'

—'একটু আগেই খানিকটা জীবন্ত অন্ধকারকে তুমি কি সরে যেতে দ্যাখোনি? কিন্তু খুব কাছে ভালো করে তাকে দেখলে, তোমারও অবস্থা হত কী রকম, সে কথা জোর করে বলা যায় না।'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'সেটা কী ভারত? কোথায় সে গেল, আর কোথা থেকেই বা এল?'

ভারত বললে, 'তার ঠিকানা যদি জানতুম, তাহলে আজ আর এই দুর্ঘটনা ঘটত না। তবে তিনকড়িকে কতকটা ভাগ্যবান বলতেই হবে, কারণ ফাঁসিকাঠকে সে ফাঁকি দিতে পেরেছে। তবে এখানে আর একটা ভাববার কথাও আছে। শুনেছি সেই অগ্নিময় জীবটাকে দেখা গিয়েছে কেবল অন্ধকার রাত্রেই। কিন্তু আজ এমন পূর্ণিমার ধবধবে চাঁদের আলোয় সে আত্মপ্রকাশ করলে কেন? আমার বিশ্বাস, এর গুপ্তকথা জানে কেবল বরেন বসু। তার বাসাও এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ওই দ্যাখো!' সে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

মুখ তুলে দেখলুম, সেখান থেকে আন্দাজ সিকি মাইল তফাতে দেখা যাচ্ছে কোনও বাড়ির আলোকোজ্জ্বল জানালা।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওটা কার বাড়ি?'

—'ও বাড়ির নাম 'আলেয়া'। ওই দিক থেকে একটা মূর্তিও এদিকে এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব 'আলেয়া'র মালিক।'

সবিস্ময়ে লক্ষ করলুম, চলতে চলতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা মূর্তি আমাদের দিকেই আসছে বটে! মনে হল যেন সে কিছু অন্বেষণ করছে। একটু পরেই ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলে বরেন বসু স্বয়ং।

হঠাৎ আমাদের দেখেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একবার আমার ও একবার ভারতের মুখের পানে দৃষ্টিপাত করতে লাগল সবিস্ময়ে, নির্বাকভাবে।

আমি বললুম, 'বরেনবাবু! এত রাতে এই জলায় আপনি কী করতে? নিশ্চয়ই প্রজাপতি ধরতে আসেননি?'

আমার কণ্ঠস্বরের ব্যঙ্গের ভাবটা বরেন বোধহয় ধরতে পারলে। বললে, 'না, রাত্রে যে প্রজাপতি ওড়ে না, সেটা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু এইমাত্র যে আর্তনাদটা শুনলুম, না এসে থাকতে পারলুম না। আপনিও এখানে প্রজাপতি ধরতে আসেননি বোধ হয়। তবে কেন এসেছেন?'

—'আমরা সকলেই একই কারণে এসেছি বলে মনে হচ্ছে। ওই দেখুন, একটু আগেই যে অন্তিম আর্তনাদ করেছিল তার মৃতদেহটা পড়ে আছে ওইখানে।'

লক্ষ করলুম বরেনের চোখ-মুখ হঠাৎ চমকে উঠল। তারপর সে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়ে মৃতদেহটা দেখতে দেখতে বললে, 'এ কে? আমি ভেবেছিলুম—'

কঠিন স্বরে আমি বললুম, 'আপনি ভেবেছিলেন বরেনবাবু রায়চৌধুরি বংশের আরও কেউ আজ অভিশাপের মহিমায় ইহধাম ত্যাগ করেছে কি না?'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বরেন রুক্ষকণ্ঠে বললে, 'সে কথা আমি ভাবব কেন?'

বুঝলুম হঠাৎ বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। সামলে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললুম, 'বিশেষ ভাবে আপনাকে লক্ষ্য করে আমি কিছু বলিনি। জলায় ভয় পেয়ে রায়চৌধুরিরাই মারা যায় বলে এ কথা ভাবা অস্বাভাবিক নয়।'

আমার এই কারণোত্তর বরেন বিশ্বাস করলে কি না জানি না, কিন্তু মুখে বললে, 'ও, তাই বলুন! কিন্তু ওটা কার লাশ?'

—'পলাতক আসামি তিনকড়ি সামন্তের।'

—'কিন্তু সে মারা পড়ল কেমন করে?'

—'পা হড়কে পড়ে গিয়ে তিনকড়ি বিষম আঘাত পেয়েছে। খুব সম্ভব সে মারা গিয়েছে সেই কারণেই।'

বরেন বললে, 'ভারতবাবু, আপনারও কি সেই বিশ্বাস?'

ভারত বললে, 'আপনি তো খুব সহজেই লোক চিনতে পারেন দেখছি!'

বরেন বললে, 'আন্দাজেই আপনাকে চিনেছি। খুব শীঘ্রই আপনার কুসুমপুরে আসবার কথা ছিল কিনা! কিন্তু আসার সঙ্গে-সঙ্গেই আজ একটা বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখলেন তো?'

—'তা দেখলুম বই কি। তবে লোকটা দৈবগতিকেই মারা পড়েছে বলেই মনে হচ্ছে।'

—'তাহলে আপনি আর নতুন কোনও তথ্য জানতে পারেননি?'

—'না। আমার হাতে জানবার বেশি সময়ও নেই। কারণ আমাকে আবার কালকেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে আমার অনেক কাজ বাকি।'

—'কালকেই ফিরে যাবেন শুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু আপাতত এই দেহটাকে নিয়ে কী করা যায় বলুন দেখি?'

—'আপনি যদি দয়া করে পুলিশে খবর দেবার ভার নেন, তাহলে আমাদের আর হ্যাঙ্গাম পোয়াতে হয় না।'

—'বেশ, বেশ, এ আর বেশি কথা কী!'

—'তাহলে এখন বিদায়। এসো ভাস্কর!'

আমরা দুজনে জলার উপর দিয়ে অগ্রসর হলুম। খানিক তফাতে গিয়ে ভারত বললে, 'লোকটার শয়তানি দেখেছ? আর্তনাদ শুনে তাড়াতাড়ি দেখতে এসেছে, আবার কে মারা পড়ল। কিন্তু হিতেনবাবু বহাল তবিয়তে নিরাপদ ব্যবধানে অবস্থান করছেন জেনে বরেন নিশ্চয়ই খুশি হয়নি।'

আমি বললুম, 'ভারত, ওই সাংঘাতিক লোকটাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত।'

—'ওকে গ্রেপ্তার করবার আইন এখনও তৈরি হয়নি। কোন প্রমাণে ওকে গ্রেপ্তার করা হবে? সন্দেহ তো প্রমাণ নয়? কিন্তু ভাস্কর, তোমার একটা কথায় ওর টনক নড়বে বোধ হয়। গোড়াতেই বোকার মতো আজ তুমি ওর আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলে ফেলেছ।'

আমি অনুতপ্ত কণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ, আজ এখানে রায়চৌধুরিদের অভিশাপের কথাটা তোলা আমার উচিত হয়নি।'

ভারত বললে, 'বরেন আজ বুঝতে পারলে, যে কারণেই হোক আমাদের সন্দেহ ধাবিত হয়েছে ওর দিকেই।'

—'এর ফল কি খারাপ হতে পারে?'

—'অসম্ভব নয়। অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আমি জানি। বরেন এইবারে বোধহয় মরিয়া হয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করবে। বিশেষত ঘটনাস্থলে আমার অভাবিত উপস্থিতি দেখে বরেন নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তাই তো ওকে কতকটা নিশ্চিন্ত করবার জন্যেই আমি বললুম, কালকেই আবার আমার কলকাতা যাওয়ার কথা।'

—'তাহলে কাল তুমি সত্য-সত্যই কলকাতায় যাচ্ছ না?'

—'নিশ্চয়ই নয়। দেখা যাক, আমি এখানে বর্তমান নেই শুনে বরেন তাড়াতাড়ি শেষ দৃশ্যের অভিনয় শুরু করে দেয় কিনা।'

॥ দ্বাদশ ॥

জাল পাতা

ভারতের উপস্থিতিতে হিতেন যে অত্যন্ত আনন্দিত হল, সে কথা আর না বললেও চলে।

কিন্তু জলাভূমির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভারতের সঙ্গে কেমন করে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং জলাভূমির মধ্যে তিনকড়ি সামন্ত কেমন করে মৃত্যুমুখে পড়েছে, এসব কোনও কথাই আমরা হিতেনের কাছে ভাঙলুম না। কেবল জানালুম তিনকড়ির মৃত্যু হয়েছে দৈবদুর্ঘটনায়।

হিতেন বললে, 'ভারতবাবু, আমি আজকাল প্রথম শ্রেণির সুবোধ বালক হয়ে উঠেছি। আপনাদের হিতোপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। কোনওদিন একলা বাড়ির বাইরে যাই না।'

ভারত বললে, 'এই সৎবুদ্ধির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

—'আমার ভালোর জন্যেই যে আপনারা উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। জলার ভিতর থেকে সেই অসম্ভব শাঁখের মতো আওয়াজটা ভাস্করবাবুর সঙ্গে আমিও একদিন শুনেছি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা অলীক কল্পনা নয়, এর যে কোনও একটা সঙ্গত কারণ আছে। ওই কারণটা যদি আপনি আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে আপনাকে আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ বলে অভিনন্দিত করব।'

ভারত মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, 'অন্তত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ হবার লোভে তা আমি পারব বলেই মনে করি। তবে আপনার সাহায্য দরকার!'

—'আমার সাহায্য? কীরকম সাহায্য আপনি চান? আমি সবরকম সাহায্য করতেই প্রস্তুত।'

—'আপনাকে আমার যে-কোনও প্রস্তাবে রাজি হতে হবে, কোনও কারণ জানতে চাইবেন না।'

—'বেশ, আমি বোবার মতোই আপনার আদেশ পালন করব।'

আমরা কথা কইছিলুম জমিদারবাড়ির প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় বসে। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙানো ছিল ঢাউস ঢাউস তৈলচিত্র, তাদের প্রত্যেকখানায় দেখা যাচ্ছে এক একজন সুগম্ভীর মানুষের প্রতিমূর্তি। সেকেলে পদ্ধতিতে আঁকা—তাদের উপরে আছে আলোর চেয়ে বেশিমাত্রায় অন্ধকার।

ভারতের দৃষ্টি হঠাৎ সেইদিকে গিয়ে স্থির হয়ে রইল। মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে সে বললে, 'ওসব প্রতিকৃতি কাদের?'

—'আমার স্বর্গীয় পূর্বপুরুষদের।'

ভারত আর কিছু বললে না, খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে তার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নীরব হয়ে রইল।

হিতেন উঠে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ খবরের কাগজখানা ভূমিতলে নিক্ষেপ করে ভারতও দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর একখানা ছবির সামনে গিয়ে আমায় ডাক দিলে, 'এখানে এসে একবার দেখে যাও।'

যে-ছবিখানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভারত দাঁড়িয়েছিল, সেখানা হচ্ছে কোনও যুবকের প্রতিকৃতি, তার বয়স তিরিশ থেকে পঁইত্রিশের মধ্যে। লম্বা-চওড়া সুগঠিত দেহ, গৌরবর্ণ। মূর্তির মুখশ্রী সুন্দর বটে, কিন্তু চোখের ভাব রীতিমতো কঠোর এবং চাপা ও পাতলা ওষ্ঠাধরের দুই প্রান্ত থেকে ফুটে উঠছে যেন কেমন একটা হিংস্রতার আভাস।

দেখলুম ছবির তলায় লেখা রয়েছে, হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি।

ভারত বললে, 'কুসুমপুরের জমিদার বংশে ইনিই প্রথমে ডেকে আনেন সেই সাংঘাতিক

অভিশাপ! ভাস্কর, ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার কিছু মনে হচ্ছে কী?'

আমি বললুম, 'মনে হচ্ছে চেনা চেনা! ওই মুখ বা ওরই মতো মুখ কোথায় যেন দেখেছি।'

চিত্রলিখিত মুখের চিবুকের দিকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে ভারত ঠোঁট টিপে হেসে বললে, 'এইবারে ভালো করে দ্যাখো তো, চিনতে পারো কি না?'

আমি সচমকে বলে উঠলুম, 'কী আশ্চর্য! এ যে বরেন বসুর মুখ!'

ভারত হাসতে হাসতে বললে, 'ঠিক তাই। জীববিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাবে, বংশানুক্রমিক সাদৃশ্য বলে একটা ব্যাপার আছে। এও হচ্ছে সেইরকম ব্যাপার আর কী!'

আমি প্রায় হতভম্বের মতো বললুম, 'তুমি কি বলতে চাও, কুসুমপুরের রায়চৌধুরি বংশের সঙ্গে বরেনের কোনও সম্পর্ক আছে?'

ভারত আমার কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে বললে, 'ভায়া হে, আমি কি এতদিন কলকাতায় বসে মিছেই গবেষণা করছিলুম? কোনও খবরই নিতে আমি বাকি রাখিনি! বরেন বসুর আসল নাম হচ্ছে, বরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি। সে বীরেনবাবুর ছোটোভাই কুখ্যাত জিতেন্দ্রনারায়ণের পুত্র।'

—'কিন্তু জিতেন্দ্রনারায়ণ তো অবিবাহিত অবস্থাতেই খুন করে দেশ থেকে ফেরার হয়েছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যুও হয় ইস্ট আফ্রিকায়।'

—'হ্যাঁ, ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার পর জিতেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ভারতের অন্য এক জাতের নারীর বিবাহ হয়। বরেন হচ্ছে সেই বিবাহের ফল। বরেনের জননীও এখন জীবিত নেই। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে ভারতে ফিরে এসে নাম ভাঁড়িয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে। এসব কথা এখানকার কেউ জানত না। কিন্তু বরেন ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে ফেরার হবার পর পুলিশই তার এই পূর্ব ইতিহাস সংগ্রহ করেছে।'

—'তাহলে বরেনের মুখোশ খুলে দিলে পর এখনই সে তো পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে পারে?'

—'কিন্তু বরেন পরে এমন গুরুতর অপরাধ করেছে হাতে নাতে যার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখন তাকে ধরিয়ে দিলে তার উপরে মাত্র লঘুদণ্ডের আদেশ হবে। আমি তা চাই না। গুরুতর পাপীর গুরুদণ্ড ভোগ করা উচিত।'

একখানা পত্র হাতে করে হিতেন আবার ঘরের ভিতরে ফিরে এল। বললে, 'ভারতবাবু, ভাস্করবাবু, আমার সঙ্গে আপনাদেরও আজ রাত্রে বরেনবাবু তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমার সঙ্গে আপনারাও গেলে সন্ধ্যার আসরটা আজ রীতিমতো জমজমাট হয়ে ওঠে।'

ভারত বললে, 'কিন্তু আপনি তো শুনেছেন, আজ আমাকে দিন-তিনেকের জন্যে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। বরেনবাবুকে সেই কথা জানিয়ে এখনই লিখে দিন যে, তিন দিন পরে আবার আমি কুসুমপুরে এসে সাদরে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করব। ভালো করে

স্মরণ রাখুন—আজ দুপুরের গাড়িতে আমি কলকাতায় যাব, আর ফিরে আসব ঠিক তিন দিনের মধ্যেই, এই কথাগুলো যেন বিশেষ করে জানাতে ভুলবেন না।'

হিতেনের মুখ দেখে মনে হল, ভারতের কথার আসল উদ্দেশ্য সে-ও ঠিকমতো বুঝতে পারেনি, তবু সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বললে, 'আচ্ছা, তাই করব।'

—'আর শুনুন, ভাস্করও আজ বরেনবাবুর নিমন্ত্রণ রাখতে পারবে না। ওকে আজ এই বাড়িতেই একটা জরুরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

আশ্চর্য হয়ে হিতেন বললে, 'তাহলে আমাকে বরেনবাবুর বাড়িতে যেতে হবে একলাই?'

—'হ্যাঁ, একলাই।'

—'কিন্তু আপনি জানেন তো, এখান থেকে বরেনবাবুর বাড়িতে যেতে গেলে সন্ধ্যার পরে আমাকে জলার খানিকটা মাড়িয়ে যেতে হবে?'

—'তা যেতে হবে বই কি!'

—'অথচ আপনারাই আমাকে বিশেষ ভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন, রাত্রে আমি যেন কিছুতেই জলার ভিতরে প্রবেশ না করি!'

ভারত হাসতে হাসতে বললে, 'সে নিষেধের কথা ভুলে যান। কেবল আজ রাত্রের জন্যেই আপনি জলার ভিতরে মনের সুখে বায়ুসেবন করবার সম্মতি পেলেন।'

॥ ত্রয়োদশ ॥

বিভীষণের অপমৃত্যু

—'ভাই ভারত, তোমার যুক্তির মধ্যে বেশ খানিকটা অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।'

—'যথা?'

—'একটা প্রশ্ন আগেও তুলেছি, এখনও আবার তুলতে চাই। তুমি বলছ, অভিশপ্ত রায়চৌধুরি বংশের এই দুর্ঘটনার সঙ্গে বরেনের সম্পর্ক আছে। কিন্তু জনরব মানলে বলতে হয়, রায়চৌধুরিদের অনেকে কোনও একটা অলৌকিক মূর্তির কবলে মারা পড়েছেন। যে সময় এই জনরবের জন্ম হয়, তখন বরেন ইহলোকেই বিদ্যমান ছিল না। তুমি এ সম্বন্ধে কী বলতে চাও?'

—'আমি কিছুই বলতে চাই না। কেবল তোমাকে কিছু দেখাতে চাই।'

—'বেশ, তা দেখিয়ো। কিন্তু তবু একটা কথা আমি ভুলতে পারছি না। রাত্রে জলার ভিতরে যে ভয়াবহ অগ্নিময় মূর্তিটা দেখা যায়, সকলেরই মতে সেটা হচ্ছে অলৌকিক। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ বরেন, কোন শক্তির মহিমায় একটা অলৌকিক আগ্নেয় মূর্তিকে এমন ভাবে স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করছে? সে কি মন্ত্রসিদ্ধ কাপালিক, না আধুনিক প্রেততত্ত্ববিদ?'

—'এই 'অলৌকিক' শব্দটাকে নিয়ে আপাতত তুমি এত বেশি মস্তিষ্কচালনা কোরো

না। আমি ওই তথাকথিত মূর্তিটাকে হয়তো অলৌকিক বলে মানতে না পারি। আমার মতে সেটা অলৌকিক নয়, অমানুষিক।'

—'অমানুষিক!'

—'হ্যাঁ। কিন্তু চুপ করো ভাস্কর! এখন এমন প্রশ্নোত্তরের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওই শোনো সিঁড়ির উপরে হিতেনের পায়ের শব্দ! ওই মোটরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ! ওই মোটরের স্টার্ট দেওয়ার শব্দ! উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত! হিতেন গেলেন 'আলেয়া'র সন্ধানে!'

আমার ঘরে বসে ভারত ও আমি কথাবার্তা কইছিলুম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। চারিদিক ঘোর ঘোর বটে, কিন্তু দূর বনরেখার উপরে এতক্ষণে হয়তো আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতিপদের চাঁদের কিরীট।

ভারত একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অস্ত্র নাও ভাস্কর, অস্ত্র নাও! না, না, রিভলভারে আজ চলবে না, আমাদের হয়তো দরকার হবে দোনলা রাইফেল। বৈকালেই আমি হিতেনের কাছ থেকে একটা বাজে ওজর দেখিয়ে দুটো বন্দুক সংগ্রহ করেছি। একটা আমার, আর একটা তোমার জন্যে। হিতেন যাবার সময় মোটরে গেল বটে, কিন্তু কথা আছে ফেরবার সময় সে পদব্রজেই আসবে। এই বন্দুক দুটো সেই সময়েই আমাদের কাজে লাগতে পারে। নাও, চলো, আর দেরি নয়!'

আমরা উপর থেকে নেমে দ্রুতপদে বাগান পার হয়ে রাস্তায় এসে পড়লুম।

একে এই গ্রাম্যপথে স্বভাবতই লোকচলাচল কম, তার উপরে দিনের আলো নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে বিরাজ করে সমাধিক্ষেত্রের স্তব্ধতা ও বিজনতা। নিতান্ত দায়ে পড়ে এদিকে আসতে হলে স্থানীয় লোকেরা দল না বেঁধে আসতে চায় না। কারণ আর কিছুই নয়, জলাভূমির সেই অপার্থিব, জ্বালামুখী, নিশাচরী বিভীষিকা। লক্ষ করে দেখেছি, সন্ধ্যার পর গ্রাম্য কুকুরগুলো পর্যন্ত এদিক দিয়ে যাবার সময় যায় পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে।

নীরবে পথ চলতে চলতে ভারত কী ভাবছিল জানি না, কিন্তু আমি মনে মনে ভাবছিলুম, জলায় বাস করে এমন কোন বীভৎস অপচ্ছায়া যার জন্যে মানুষ আর জন্তু সমান ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে?

'আলেয়া'র কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, নীলাকাশের খানিক উপরে উঠেছে তখন প্রায় পরিপূর্ণ প্রতিপদের চাঁদ। জলার জলে ও জঙ্গলে ঝরে পড়ছিল জ্যোৎস্নার ঝরনা, তার দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে যেন কেমন একটা ভীষণ মধুর ভাব। দেখতে ভয়ও হয়, ভালোও লাগে।

ভারত বললে, 'একটা নতুন বিপদের সূচনা দেখছি। জ্যোৎস্নার এই শোভাযাত্রার মধ্যে অন্ধকারও দেখা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ভাস্কর, আকাশের ওই কোণে তাকিয়ে দ্যাখো!'

তাকিয়ে দেখলুম। উত্তর আকাশের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত কালিমা লেপে দিয়েছে মস্তবড়ো হাড়িয়া মেঘ। এরকম উত্তুরে আঁধি কেবল মেঘ আর ঝড়ই আনে না, সেই সঙ্গে দারুণ জলছড়ায় ভাসিয়ে দেয় পৃথিবীকেও।

বললুম, 'সুলক্ষণ নয়।'

ভারত দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'লক্ষণ ভালোই হোক আর মন্দই হোক, আমাদের হাজির থাকতে হবে যথাস্থানেই। নইলে হিতেনের অপমৃত্যুর জন্যে আমাদেরই দায়ী হতে হবে, কারণ আমরাই তাকে এগিয়ে দিয়েছি মরণের পথে! এসো ভাস্কর, এদিকটায় এগিয়ে এসো। আপাতত এইখানেই হবে আমাদের আস্তানা।'

এ একটা জঙ্গুলে জায়গা। উঁচু নল-খাগড়ার বনে অনেকদূর পর্যন্ত আচ্ছন্ন। তার ভিতরে গা ঢাকা দিলে বাহির থেকে কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না।

ভারতের সঙ্গে সঙ্গে সেই নল-খাগড়ার বনে প্রবেশ করে উঁকি মেরেই খানিক তফাত থেকে দেখতে পেলুম, বরেনের বাসা 'আলেয়া'কে। ভারত আস্তানার জন্যে নির্বাচন করেছে চমৎকার জায়গা।

'আলেয়া'র ঘরে ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, কিন্তু কোথাও কোনও মানুষের দেখা বা সাড়া পাওয়া যায় না।

ভারত বললে, 'ভাস্কর, তুমি তো ওই বাড়ির ভিতরে কয়েকবার গিয়েছ। এখন একবার চুপিচুপি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখে এসো দেখি, কিছু নজরে পড়ে কি না! কিন্তু খুব হুঁশিয়ার!'

দস্তুরমতো হুমড়ি খেয়ে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনে আছে একটুখানি বাগান। তারই ধারে মেহেদিপাতার বেড়া। সেই বেড়ার পিছনে হাঁটু গেড়ে বসে উপরে মুখের একটুখানি বার করে দেখলুম, বৈঠকখানার জানলার ধারে একটা টেবিলের দুইপাশে উপবিষ্ট বরেন এবং হিতেন। কথা কইতে কইতে গেলাস থেকে তারা কী পান করছে। বরেনের মুখে হাসি আর ধরছে না, কিন্তু হিতেনের মুখের উপরে রয়েছে কেমন একটা গাম্ভীর্য। বোধহয় আজ রাত্রে একাকী বিপজ্জনক পথের যাত্রী হতে হবে বলে তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। এদের সঙ্গে আমি সীমাকেও দেখবার আশা করেছিলুম। কিন্তু ঘরে-বাইরে কোথাও সীমার দেখা পাওয়া গেল না।

সেইখান থেকে কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারবার পর আস্তে আস্তে আবার ভারতের কাছে ফিরে এলুম।

আমার মুখে সব শুনে ভারতও বললে, 'সীমা অদৃশ্য? আশ্চর্য কথা তো! খালি আশ্চর্য নয়, ভাববার কথাও।'

আমি বললুম, 'ওই দ্যাখো! বরেন ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল!'

—'দেখছি বরেন হন্তদন্তের মতো বাগানের বাইরে রাস্তার উপরে এসে দাঁড়াল। কী দেখছে সে? কাছে কোনও লোকজন আছে কি না তাই? দ্যাখো, দ্যাখো রাস্তার একদিকে এগিয়ে অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল! হিতেনকে একলা রেখে এমন সময় কোথায় গেল সে?'

যেন তার কথারই উত্তর দিলে গড়গড় গড়গড় করে আকাশ ফাটানো বাজের ক্রুদ্ধ গর্জন! সচকিতে মুখ তুলে দেখি, কষ্টিপাথরের মতো কালো বিপুল মেঘে আকাশের আধখানা একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। একদিকে রুপোলি চাঁদনির পালিশে ঝকমক করা

আকাশ এবং আর একদিকে তার সর্বাঙ্গ লিপ্ত হয়ে গেছে নিশ্ছিদ্র কালিমার প্রলেপে। থেকে থেকে দেখা যাচ্ছে বিজলির জ্বলন্ত হিজিবিজি লেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন ধমক দিয়ে উঠছে বাজের পর বাজ। জমিদারবাড়ির ভিতরে আরামে বসে এই ভীতিজনক জলাভূমির উপরে আকাশের ওই ভীষণ মধুর দৃশ্যটা নিশ্চয়ই উপভোগ করতে পারতুম, কিন্তু আজ এখানকার অসাময়িক প্রাকৃতিক বিপ্লব মনকে করে তুললে যারপরনাই উদ্বিগ্ন। অনেকদূর থেকে যেন বন মাতানো ঝড়ের কোলাহলও শুনতে পাওয়া গেল!

ভারত তাড়াতাড়ি বললে, 'বেরিয়ে চলো, বেরিয়ে চলো! বোধহয় মেঘ আর ঝড় দেখেই হিতেন ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে রাস্তার দিকে ছুটে এল!' বলতে বলতে নল খাগড়ার বনের ভিতর থেকে সে লাফ মেরে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এবং তারপর বেগে ধাবিত হল বরেনের বাড়ির দিকে। বলা বাহুল্য, আমিও ছুটলুম তার পিছনে পিছনে।

চাঁদের স্বচ্ছ আলো সরিয়ে দিয়ে আসর অধিকার করেছে তখন নিবিড় অন্ধকার। বরেনের বাড়ির আলো না থাকলে হিতেনকে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম না, কিন্তু এখন স্পষ্টভাবে তার মূর্তিও নজরে পড়ছে না। কেবল এইটুকু বুঝলুম, সে খুব তাড়াতাড়ি নিজের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলে। তারপরেই তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেললে রন্ধ্রহীন অন্ধকার।

তারপরেই উপরি উপরি যে-ঘটনাগুলো ঘটে গেল, তার জন্যে বোধহয় এক মিনিটের বেশি সময় দরকার হয়নি! কিন্তু আমাদের কাছে সেই সময়টা এক ঘণ্টারও বেশি বলে মনে হয়েছিল।

প্রথমেই কাছে এসে পড়ল দুদ্দাড় শব্দে প্রচণ্ড ঝড়। কানে এল দ্রুত পাদুকার শব্দ—হিতেন বাড়িমুখো হয়েছে। তার পরেই কয়েক ফুট তফাতেই হঠাৎ দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠল, অগ্নিরেখায় আঁকা প্রকাণ্ড এক অবর্ণনীয় দন্তকণ্টকিত পৈশাচিক মুখমণ্ডল এবং তারপরেই শুনলুম অমানুষিক কণ্ঠে ভয়ঙ্কর এক হিংস্র গর্জন! পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম হিতেন সভয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। তার পিছনে পিছনেও সেই অগ্নিময় করালবদন নিয়ে ঝটিকার মতো তেড়ে এল অন্ধকারেরও চেয়ে কালো বিরাট একটা দেহ!

ভারত চিৎকার করে উঠল, 'বন্দুক ছোড়ো ভাস্কর, বন্দুক ছোড়ো—এক, দুই, তিন!'

একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই বন্দুক হুঙ্কার দিয়ে উঠল—তারপরেই আকস্মিক বিদ্যুতালোকে ক্ষণিকের মধ্যে এইটুকু খালি দেখতে পেলুম, হিতেন মাটির দিকে ছটকে পড়ে যাচ্ছে এবং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ো পড়ো হয়েছে এক দীপ্তমুখ, অতিকায়, হিংস্র বিভীষণ!

আবার আমাদের ডবল বন্দুকের হুঙ্কার—সঙ্গে সঙ্গে যেন দিগ্বিদিক ফাটিয়ে দিলে একটা হৃৎকম্পকর বন্য ও ভৈরব চিৎকার।

এতক্ষণ যুক্তির বিরুদ্ধেও একটা যে ভয়ের ভাব চিত্তকে অধিকার করেছিল, ওই মূর্তিটার জান্তব চিৎকারে সেটা দূর হয়ে গেল। আঘাত পেয়ে যে আর্তনাদ করে, নিশ্চয়ই সে অপার্থিব নয়। তাড়াতাড়ি বন্দুকের ভিতরে নতুন টোটা ভরে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে

টর্চের আলো ফেলে সবিস্ময়ে দেখলুম, মাটির উপরে মরে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা একটা ভল্লুকের বিপুল বপু!

ভয় ও বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে হিতেন বলে উঠল, 'হা ভগবান, এটা কী ভাস্করবাবু, এটা কী?'

—'আপনি উঠে দাঁড়ান হিতেনবাবু, জানোয়ারটা মরে গিয়েছে।'

সে বিচিত্র জীবটার অগ্নিময় মুখ তখনও আমাদের চমকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। তার মুখের উপরে হাত বুলিয়ে দেখলুম, আমার হাতও হয়ে উঠল দীপ্তিময়!

ভারত বললে, 'ফসফোরাস!'

আমি বললুম, 'বিষম চালাকি!'

ভারত বললে, 'হিতেনবাবু, এখনও আমাদের কিছু কাজ বাকি আছে। কিন্তু আপনি আজ আর আমাদের কোনওই কাজে লাগবেন না। সুতরাং অনায়াসেই বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। আজ থেকে কুসুমপুরের জলায় কেউ আর শাঁখিনির শঙ্খনাদ শুনতে পাবে না। জানেন তো, ভালুকদের গলা থেকে অনেকটা শাঁখের মতো আওয়াজ বেরোয়? এসো ভাস্কর, আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করবার সময় নেই। এইবারে আসল আসামিকে গ্রেপ্তার করতে হবে!'

ভারত দ্রুতপদে ছুটে চলল বরেনের বাড়ির দিকে।

এ ঘর ও ঘর খুঁজে বরেনের পাত্তা পাওয়া গেল না। তারপর আমরা বন্দুক তুলে প্রবেশ করলুম তার শয়নগৃহের ভিতরে। সেখানে আবার নতুন মেলোড্রামার বিস্ময়!

মস্তবড়ো একটা লোহার সিন্দুকের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সীমা দেবী। তাঁর হাত, পা ও সর্বাঙ্গ মোটা দড়ি দিয়ে সেই সিন্দুকের সঙ্গে বাঁধা। তাঁর মুখও বন্ধ করা হয়েছে একখণ্ড কাপড় দিয়ে। সীমার দুই চক্ষু অশ্রুসজল। আমরা দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি তাঁকে বন্ধনমুক্ত করলুম।

ভারত শুধোলে, 'কে আপনার এই দশা করলে?'

সীমা কাঁদতে কাঁদতে মুখ নামিয়ে বললেন, 'আমার স্বামী।'

—'কোথায় সে?'

—'খানিক আগে বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন।'

—'আপনাকে এমন করে বেঁধে রাখবার কারণ?'

—'পাছে আমি তাঁর অন্যায় কাজে বাধা দিই।'

তারপর সীমার মুখ থেকে যা শোনা গেল, খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই :

বরেনের সঙ্গে চার বৎসর আগে সীমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বামীর আসল চরিত্র তার কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না; মুখ বুজেই তাকে সমস্ত সহ্য করতে হয়। তারপর ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে ফেরার হয়ে বরেন এদেশে সেদেশে ঘুরে অবশেষে দুই বৎসর আগে কুসুমপুরে এসে উপস্থিত হয়। এখানে এসে বীরেনবাবুর বিরুদ্ধে সে আবার নতুন চক্রান্ত শুরু করে। ভিতরের কথা সব

জানতে না পারলেও সীমা এটুকু বেশ বুঝতে পারে যে, বীরেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে তার স্বামীও কোনও না কোনওদিক দিয়ে জড়িত ছিল। বীরেনবাবুর পরে আসে হিতেনবাবুর পালা। সেটাও তার কাছে অজানা রইল না। কিন্তু সে গোড়া থেকেই এইসব কুৎসিত ব্যাপারের বিরুদ্ধে ছিল। তার সঙ্গে তার স্বামী যখন কলকাতায় ন্যাশন্যাল হোটেলে গিয়ে ওঠে, তখনই সে হিতেনবাবুকে সাবধান করে পত্র লিখেছিল। সে যে হিতেনের পক্ষপাতী বরেন সেটা ধরতে পারে। পাছে কোনও বাধা দেয় তাই আজ বৈকাল থেকেই তাকে এইখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

ভারত জিজ্ঞাসা করলে, 'সীমা দেবী, এখন কোথায় গেলে বরেনের খোঁজ পাওয়া যায়, আপনি কি তা বলতে পারেন?'

সীমা বললে, 'এখানে তাঁর লুকোবার একমাত্র জায়গা আছে জলার ভিতরেই। কিন্তু আমার স্বামীর পক্ষেও জলা হয়ে উঠেছে আজ একেবারেই অগম্য।'

—'কেন?'

—'জলার যেখানে তিনি ওই ভালুকটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এখন তিনি সেইখানে গিয়েই আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার একটি ছাড়া পথ নেই। সে পথটাও বাহির থেকে চিনতে পারা অসম্ভব। কিন্তু সেই বিশেষ পথটায় ঢোকবার মুখেই তিনি কতকগুলো বিশেষ আগাছা এমনভাবে পুঁতে রেখেছিলেন, যাতে করে তাঁর নিজের পক্ষে আসল পথ চিনতে কোনওই অসুবিধা হত না। আজ এই দুর্যোগের রাত্রে, এই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে কিছুতেই তিনি আসল পথটা চিনে নিতে পারবেন না।'

এই পর্যন্ত শুনেই ভারত আমাকে ইঙ্গিত করে সেখান থেকে দ্রুতবেগে বাইরে বেরিয়ে এল।

সত্য! সৃষ্টিকে দেখাচ্ছে তখন অনাসৃষ্টির মতোই! আকাশে মেঘডম্বর, রাত্রি আতঙ্কধাত্রী, পৃথিবী তিমিরাবগুণ্ঠিতা এবং বৃষ্টি পড়ছে অশ্রান্ত ঝরঝর ধারায়। থেকে থেকে ডেকে ডেকে উঠছে বজ্র আর ঝড় আর বড়ো বড়ো বনস্পতি।

'আলেয়া'র সুমুখ দিয়ে একটা সরু পথ সোজা জলাভূমির ভিতর গিয়ে পড়েছে। সেই পথই অবলম্বন করলে ধাবমান ভারত। আমরা দুজনেই জলাভূমির উপরে গিয়ে নামলুম। দিকে দিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝলুম, সমস্ত জলা আজ জলে থই থই করছে, কোথায় বৃষ্টির জল আর কোথায় জলার জল আলাদা করে কিছুই বোঝা যায় না! আজ যেন সেই বহুদূরবিস্তৃত জলাভূমিটা পরিণত হয়েছে দুস্তর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে!

ভারত যাচ্ছিল আমার আগে আগে। জল ছিল হাঁটুভোর। কিন্তু আচম্বিতে ভারতের দেহটা নীচের দিকে নেমে গেল প্রায় বুক পর্যন্ত! একলাফে কাছে গিয়ে পড়ে দুই হাতে তাকে ধরে প্রাণপণে আমি পিছন দিকে টেনে আনলুম।

ভারত শিউরে উঠে বল্‌ল, 'চোরাবালি!'

আমি বললুম, 'ফিরে চলো ভারত! একটা দুরাত্মাকে ধরবার জন্যে আমরা এখানে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে চাই না।'

ভারত দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু বরেন কি আমাদের এত সহজে ফাঁকি দিয়ে পালাবে?'

—'বরেন চুলোয় যাক। দেখছ না এখানে অপথ বা সুপথ কোনও পথই চেনবার সুযোগ নেই? সব ডুবে গেছে জলের তলায়? তার উপরে এই মারাত্মক চোরাবালির বিপদ!'

ভারত নাচারের মতো বললে, 'অগত্যা ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই বটে!'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টিকেও ছাপিয়ে জাগ্রত হল একটা ভীষণ ও বিকট ও কর্ণভেদী আর্তস্বর! তেমন তীব্র আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। পরিত্রাহি চিৎকার করে খানিক তফাত থেকে কে বলছে, 'রক্ষা করো, রক্ষা করো! চোরাবালিতে ডুবে মরি—বাঁচাও আমাকে—' হঠাৎ স্তব্ধ হল সেই আর্ত কণ্ঠস্বর! ধু ধু জলার জলকল্লোলের উপর শোনা যেতে লাগল বজ্র, ঝঞ্ঝা ও অরণ্যের সম্মিলিত মহা কোলাহল, কিন্তু কোনও মানুষের কণ্ঠই আর তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে না।

ভারত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'ভাস্কর, ব্যাপারটা বুঝলে কি?'

অস্ফুট কণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ, জলার চোরাবালি গ্রাস করলে আজ বরেনকেই।'

॥ চতুর্দশ ॥

ব্যাখ্যান

ভারত বলতে লাগল—

'হিতেনবাবু, বুঝতে পারছি আপনার মনে এখন অনেক প্রশ্নই জাগছে। সকল প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখন দিতে পারব না, এবং কোনও কোনও প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আমার কাছেও নেই। তবে আমি যা বলব, মন দিয়ে শুনলে মোটামুটি সমস্ত ব্যাপারটাই আন্দাজ করতে পারবেন।

বীরেনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুটা যে অস্বাভাবিক, প্রথমে আমি তা ধারণায় আনতে পারিনি। অবশ্য আইন এখনও তাঁর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে স্বীকার করবে না। আর আমার পক্ষেও তাঁর মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে সন্দেহ করবার কোনও উপায়ই ছিল না। এ রকম মৃত্যুকে অপরাধমূলক বলে মনে করা রীতিমতো কঠিন। কারণ প্রত্যেক অপরাধের পিছনেই থাকে একটা উদ্দেশ্য। এখানে প্রথম দৃষ্টিতে অপরাধীর কোনও উদ্দেশ্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারপর শুনলুম প্রাচীন কিংবদন্তির কাহিনি। স্থানীয় লোকের দৃঢ়বিশ্বাস, সেই আজব কাহিনিটারই সঙ্গে আজ বীরেনবাবুর মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

তাই শুনেই জাগ্রত হল আমার কৌতূহল। আধুনিক পৃথিবীতেও যে শঙ্খের মতো কণ্ঠস্বর নিয়ে প্রেতজগতের কোনও আগ্নেয় ছায়ামূর্তি বিচরণ করতে পারে, স্বপ্নেও আমার মনে এমন সম্ভাবনা ঠাঁই পায় না। বীরেনবাবুর মৃতদেহের অনতিদূরে জলার ভিতরে ফণীবাবু দেখেছিলেন, কোনও একটা অদ্ভুত জীবের পদচিহ্ন। আমার মনে সন্দেহের প্রথম

ছায়াপাত হল—মাটির উপরে কোনও অলৌকিক ছায়ামূর্তির পায়ের ছাপ কি পড়তে পারে? না, তা পারে না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এখানে রয়েছে কোনও লৌকিক রহস্যই।

কিন্তু কেন, অত রাত্রে ওই কুখ্যাত জলায় বীরেনবাবুই বা যাবেন কেন? আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সামনে একটা ভয়াবহ জীবের আবির্ভাবই বা হবে কেন? নিশ্চয়ই সেটাকে কেউ তাঁর দিকে লেলিয়ে দিয়েছিল!

আবার প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু কেন?

তারপরই হিতেনবাবু, একখানা বিস্ময়কর চিঠি নিয়ে আপনি ঘটনাক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

পত্রখানা পর্যবেক্ষণ করে তখনই যা যা আবিষ্কার করেছিলুম, আপনার কাছে তা অবিদিত নেই। আমি সন্দেহ করেছিলুম, কোনও নারী আর কারুকে লুকিয়ে নখকাটা কাঁচি দিয়ে খবরের কাগজের অক্ষর কেটে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ওই পত্রখানা রচনা করে আপনার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল, কোনও ব্যক্তিকে ছদ্মবেশে আপনার অনুসরণ করতে দেখে।

সেই সন্দেহ অধিকতর দৃঢ়মূল হল, আর একটা আপাতদৃষ্টিতে খুব তুচ্ছ ঘটনায়। উপরি উপরি আপনার জুতা চুরি। এ কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব।

এইসব ব্যাপার দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলুম, ঘটনাক্ষেত্র কুসুমপুরে হয়েছে কোনও অপরাধীর আবির্ভাব।

আবার প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু কেন এবং অপরাধটাই বা কী? ফণীবাবুর মুখে ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত পাত্রপাত্রীদের কথা আগেই শুনে রেখেছিলুম। আপনি যখন কলকাতা ত্যাগ করেন, তখন তাদের কথা আরও ভালো করে জানবার জন্যে আপনার সঙ্গে প্রেরণ করেছিলুম আমি ভাস্করকেও।

ভাস্করের পত্র পড়ে কোনও কোনও লোকের কথা আমি সত্য-সত্যই আরও ভালো করে জানতে পারলুম। কিন্তু কলকাতায় বসেই সন্ধান নিয়ে একজনের সম্বন্ধে আমি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম, আপনার বা কুসুমপুরের আর কারুর পক্ষেই তা জানতে পারার সম্ভাবনা ছিল না।

বরেন বসুর কথা বলছি। সে ফেরারি আসামি না হলে পুলিশের ফাইল থেকে আমিও তার পূর্ব জীবনের কথা জানতে পারতুম না। সে কুসুমপুরের রায়চৌধুরি বংশের সন্তান। বীরেনবাবুর আর আপনার মৃত্যু হলে আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে সেই-ই।

এইখানেই অনুমান করা যায় অপরাধের উদ্দেশ্য। তারপর সমস্ত রহস্যই ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল। গোপনে জলাভূমির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বাসা বেঁধে আমিও কোনও কোনও প্রয়োজনীয় গুপ্তকথার সঙ্গে পরিচিত হলুম।

খোঁজ করলে দেখা যাবে, সব দেশেই প্রাচীন বিখ্যাত পরিবারের মধ্যে অনেক কাল আগে কোনও অসাধারণ দুর্ঘটনা ঘটলে, সে সম্বন্ধে অনেক রকম উদ্ভট ও অলৌকিক গল্প লোকের মুখে মুখে একাল পর্যন্ত চলে আসে। আপনার প্রপিতামহ হীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকেই এইরকম একটা আজগুবি জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ওই বংশের

জমিদারদের নাকি জলাভূমির উপরে গিয়ে প্রাণ হারাতে হত এক অগ্নিময় অপার্থিব জীবের কবলে পড়ে।

এই জনরব বোধ করি বীরেনবাবুর মনের উপরেও কাজ করত অল্পবিস্তর। বরেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হবার পর, খুব সম্ভব তিনিই এই আজব গল্পটা তার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। অর্থাৎ নিজের মৃত্যুবাণই তুলে দিয়েছিলেন বরেনের হাতে।

জলার ভিতরে অজ্ঞাতবাস করবার সময় বরেনের পোষা ভাল্লুকটার সন্ধান আমি আগেই পেয়েছিলুম। ওই জানোয়ারটার পূর্ব কথা তখন আমি জানতুম না, কিন্তু পরে সীমা দেবীর মুখে শ্রবণ করেছি। ভাল্লুকটা যখন এক মাসের বাচ্চা, বরেন তখন থেকেই তাকে পালন করেছে। তাকে অনেকরকম খেলা শিখিয়েছে এবং তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই : কোনও লোকের ব্যবহার করা জিনিস তাকে শুঁকতে দিলে সে ব্লাড হাউন্ডের মতো সেই গন্ধের অনুসরণ করতে পারত। অবশ্য এটা যে কতখানি সম্ভবপর; সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু যে কারণেই হোক বরেন এটা বিশ্বাস করত। সেইজন্যেই সে কলকাতার হোটেল থেকে আপনার জুতা চুরি করেছিল। প্রথমে সে চুরি করে নতুন জুতো, আপনি ব্যবহার করেননি বলে আপনার দেহের গন্ধ তার মধ্যে থাকবার কথা নয়। তাই সে পরে নতুন জুতোর বদলে চুরি করে বহুব্যবহৃত পুরোনো জুতো। তার ইচ্ছা ছিল, সেই জুতোর গন্ধ শুঁকিয়ে আপনার পিছনে ভাল্লুকটাকে লেলিয়ে দেবে। হয়তো এই ভাবে সে বীরেনবাবুর ব্যবহৃত কোনও জিনিসও চুরি করেছিল।

কিন্তু বলেছি তো, তার এই বিশ্বাস অভ্রান্ত না হতেও পারে। আমার দৃঢ় ধারণা, অপরিচিত যে-কোনও লোকের পক্ষেই ওই ভাল্লুকটা ছিল বিশেষ রূপেই সাংঘাতিক। বরেনকে সে প্রভু বলেই জানত আর মানত, তাই তাকে কিছুই বলত না। কিন্তু অচেনা লোক দেখলেই, তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হত। এইজন্যেই সে একদিন জলার ভিতরে তিনকড়ির পিছনেও তাড়া করে গিয়েছিল। পরে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে পালিয়ে যায়। সেদিনের সব ব্যাপারটা এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ভালুকটা জলার ভিতরে শিকলে বাঁধা থাকত। বোধহয় সেদিন সে কোনওরকমে শিকল খুলে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। পরে গোলমাল শুনে বরেন দৌড়ে এসে তাকে আবার যথাস্থানে নিয়ে যায়। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

বরেন পুরাতন জনশ্রুতিটাকে নিজের কাজে লাগিয়েছিল সুকৌশলে। ভাল্লুকটাকে জলার জঙ্গলের মধ্যে জনসাধারণের অগম্য স্থানে এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছিল যে কেউ তার কথা জানতে পারেনি। তারপর রাত্রির অন্ধকারে ভাল্লুকটাকে মাঝে মাঝে সে কিছুক্ষণের জন্যে এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে বেড়াবার স্বাধীনতা দিত। এবং সেই সময় ফসফোরাসের সাহায্যে তার মুখখানাকে অগ্নিময় করে তুলত। তখন তার চেহারা জনশ্রুতির কষ্টকল্পনার সঙ্গে মিলে যেত অবিকল। অন্ধকারে কেউ তাকে ভালো করে দেখতে পেত না, মনে হত যেন সে একটা কিম্ভূতকিমাকার দীপ্তমুখ, অলৌকিক মূর্তি! এইভাবে পুরাতন সেই জনশ্রুতিটা আবার নতুন করে প্রচলিত হয়।

তারপর আর বেশি কথা না বললেও চলে। বরেন প্রথমে পথ থেকে সরায় বীরেনবাবুকে, সে জানত তাঁর হার্ট ছিল দুর্বল। নিজের প্রথমা স্ত্রী সুরমাকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে তাকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে সে বীরেনবাবুর কাছে পাঠায়। তারপর বীরেনবাবু যখন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হন, সেই সময় ভাল্লুকটাকে লেলিয়ে দেয়। কিংবদন্তিতে কল্পিত সেই আগুনমুখো জন্তুটাকে বাস্তব জগতে দেখেই বীরেনবাবু ছুটে পালাতে পালাতে মহা আতঙ্কে মারা পড়েন।

তারপরে আসে আপনার নিজের পালা। এ বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আমার আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?'

হিতেন সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'ভারতবাবু, আমার বক্তব্য তো আগেই আপনাকে বলে রেখেছি! আপনি হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ!'

ভারত সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'আমেন, আমেন—অর্থাৎ তথাস্তু, তথাস্তু!'*

---

* পাশ্চাত্য আখ্যান অবলম্বনে।